ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

২য় ভাগ—৫ম সংখ্যা। ভাদ্র—১৩০১।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সূচী।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

বিষয়। পৃষ্ঠা।

হুগলী,

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীগবিলাস পাল দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible]

এই সংখ্যার মূল্য /১০ দুই আনা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হয়। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়াছেন। যাহাতে ইহা স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন আছে। এই পত্রিকা যাহাতে সকলের সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন তজ্জন্য ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাসুল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনার জন্য পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

পূর্ণিমা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

২য় ভাগ। } ভাদ্র, সন ১৩০১ সাল। { ৫ম সংখ্যা।

বিষাদ সঙ্গীত।

মনের যাতনা মরম বেদনা বলনা বলনা কাহারে কই।
(তাই) গহন কাননে ভ্রমি এক মনে নিরজন স্থানে বসিয়া রই॥
কোকিলের গান সুললিত তান ব্যাকুল পরাণে লাগে না ভাল।
(সে যে) প্রেমিকের কথা প্রণযের গাথা গায় যথা তথা করে ব্যাকুল॥
চাঁদের আলোকে ঝলকে ঝলকে খসিয়া পড়িছে সুষমারাশি।
(ওই) সোহাগের ভরে প্রণয়ের ডোবে রাখিছে বাঁধিয়া কুমুদেশশী॥
অতুলরূপিনী জিনি কুরঙ্গিনী তটিনী সঙ্গিনী কেমনে করি।
(ও যে) হেসে হেসে যায় পিছু নাহি চায় সাগর সঙ্গমে আহা কি মরি॥
মনের বাসনা হৃদয় যাতনা জলদে বলিতে দিলগো কই।
(পোড়া) চপলা আসিয়া থাকিয়া থাকিয়া মেঘেরে কহিছে পাপিনী ওই॥
তাহারে নেহারি যদি ধিরি ধিরি চিতের আবেগ কহিতে যাই।
(বলে) যাও যাও যাও মুখ না দেখাও আলোকে তোমার নাহিক ঠাঁই॥
পাষাণে নির্ম্মিত মানবের চিত দয়া মায়া তাহে করে না খেলা।
(আমি) চাহি না কহিতে এ দুঃখ বারতা কাঁদিয়া নিবাব প্রাণের জ্বালা॥
মানবের সাথে এ প্রাণ থাকিতে কবনা কবনা কবনা কথা।
(পাছে) সাধ যায় চিতে আবার সঁপিতে যা হ'তে পেয়েছি দারুণ ব্যথা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার শূর।

উড়িষ্যায় মুসলমানের আধিপত্য।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দি ধীরে ধীরে কত রাজ্য, নগর, রাজা, প্রজা, ও ভূমবাহদিগকে কালের করাল কবলে নিপতিত করিয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে কতই সৃজিত ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে। প্রাচীন কালে যে সকল হিন্দুরাজগণ স্বদেশ রক্ষার্থে বিপক্ষের শাণিত অস্ত্রের সম্মুখে আপনার অমূল্য জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া দাড়াইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই, সে সকল বীর মহাত্মাগণ আজ কোথায়? কোথায় তাঁহাদের সে সহানুভূতি, সে দেশহিতৈষিতা, সে বীরত্ব, অনন্তকালের অদৃশ্য গহ্বরে নিহিত। আজ বহুদিন গত হয় নাই, যে উড়িষ্যা এক সময়ে আর্য্য সন্তানগণের পুণ্যময় নিকেতন ছিল, যে পূতসলিলা বৈতরণী নদীতট এক সময়ে পাণ্ডবদিগের বিশ্রাম স্থান ছিল, সে স্থান যবন দিগের অধিকারকালে বিধ্বংসিত ও অধুনা ইংরাজ রাজের অধিকারভুক্ত হইয়া অন্যতর রূপ ধারণ করিয়াছে, এই স্থলে সেই সকলের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত কিয়ৎপরিমাণে সাধারণের গোচরার্থে প্রবন্ধাকারে প্রকটিত হইল।

উড়িষ্যা ভারতবর্ষের মধ্যে একটি অতি প্রাচীন রাজ্য। ইহার নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার মত ভেদ দেখা যায়। উৎকল ইহার আর একটি নাম। অধ্যাপক ল্যাসেনের মতে ইহার অন্যতর নাম ওড্র। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের মতে উট+কোল কিম্বা ওড় জাতীয় কোল হইতে উৎকল হইয়াছে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রীয় মতে অতি প্রাচীন কালে সুদ্যুম্নপুত্র উৎকল, স্বনামে এই রাজ্য স্থাপনা করেন।*

---

*"সুদ্যুম্নস্তু দায়দাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ
উৎকলশ্চ গয়শ্চৈব বিনতাশ্বশ্চ ভারত।
উৎকলশ্চোৎকলা রাজন্ বিনতাশ্বস্য পশ্চিমা
দিকপূর্ব্বা ভরতশ্রেষ্ঠ গয়স্যতু গয়পুরী॥"

(হরিবংশ)

অতি পূরাকালে এই প্রদেশকে কলিঙ্গ বলিয়া অভিহিত করা হইত। উড়িষ্যা কলিঙ্গের অন্তর্গত। বৈতরণী নদী এই স্থানে প্রবাহিত হইয়া থাকে। ভগবান ধর্ম্ম এই-স্থলে দেবগণের আশ্রম গ্রহণ করিয়া যোগানুষ্ঠান করিতেন। যোগীঋষিগণ সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে সতত যোগানুষ্ঠানে রত থাকিতেন। যজ্ঞীয় নানা দ্রব্যাদি সংযুক্ত ও পর্ব্বতমালায় পরিশোভিত থাকায় স্থানটি যোগিগণের অত্যন্ত রমণীয় ছিল। পুরাণাদি দ্বারা এইরূপ জানা যায় যে পাণ্ডবগণ যখন তীর্থযাত্রাকালে নানা দেশ পরিভ্রমণ করেন, সেই সময়ে ইহাঁরা এই স্থানে আসিয়া বৈতরণীর নদীতটে কিয়ৎ দিবস বাস করেন।* পুরাকাল হইতে আর্য্য হিন্দুগণ তীর্থ করিবার মানসে তথায় আগমন করিয়া থাকেন। বাস্তবিকই ভারতবর্ষের মধ্যে উড়িষ্যা হিন্দুদিগের মহা তীর্থস্থান বলিয়া বিখ্যাত। এখনও কতশত নরনারী শত শত বিপদ উপেক্ষা করিয়া ও আপনার অমূল্য জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া এই মহা তীর্থ দর্শন করিতে আসিয়া জীবন সার্থক করিয়া থাকেন। এমন কি অনেক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও এই স্থানে আসিয়া বাস করিত, এখন স্থানে স্থানে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।†

বৌদ্ধদিগের আধিপত্যকালে উড়িষ্যা যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি প্রধান স্থান ছিল বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এমন কি বর্ত্তমান জগন্নাথের মূর্ত্তিকে অনেকে বৌদ্ধ কল্পিত ত্রিমূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করেন। বৌদ্ধদিগের যেরূপ জাতিভেদ নাই, শ্রীক্ষেত্রধামে ব্রাহ্মণ ও চর্ম্মকার একত্র বসিয়া ভোজন করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা করে না, এইরূপ সাম্যভাব বোধ করি ভারতের অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

খৃঃ ৭ম শতাব্দিতে যখন চীন পরিব্রাজক হিউএন্থসঙ্গ উড়িষ্যায় আগমন করেন সে সময়ে এস্থলে কেবল মাত্র পাঁচটী দেব মন্দির ছিল। তাঁহার অবস্থিতি কালে কলিঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিম স্থিত পুষ্পগিরি (বর্ত্তমান রাণী পুর গুহা) নামক পর্ব্বতের একটি অত্যাশ্চার্য্য ঘটনা তিনি বিবৃত করেন যে "পর্ব্ব উপলক্ষে উপবাসের দিন এখানে পর্ব্বত হইতে সহসা একটি উজ্জ্বল

*মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৪ অঃ।

†Statistical Acct. (W. W. Hunter)

আলোক প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে আবার নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।"

পূর্ব্বকালে আইওনিয়নগণও এই স্থানে গতায়াত করিত। ক্রমে যখন যবন পরাক্রম প্রবল হইয়া উঠিল সেই সময় উড়িষ্যার রাজা শোভন দেব জগন্নাথের মূর্ত্তি লইয়া শোনপুরে পলায়ন করেন; যবন সেনাপতি রক্তবাহু অবলীলা ক্রমে রাজ্য অধিকার করিলেন। *

কিছুকাল পরে উক্ত সেনাপতি একদা অনেক সৈন্যসহ স্থানান্তরে গমন কালে সমুদ্রে মগ্ন হন। উড়িষ্যার সিংহাসন শূন্য হইল দেখিয়া চন্দ্রদেব সিংহাসন অধিকার করিয়া রাজ্য শাসনের ভার স্বহস্তে লইলেন। কিন্তু যবন অত্যাচার কিছু পরিমাণে প্রশমিত হইল না, অধিকন্তু ক্রমে ক্রমে প্রবল হইল ও যবনেরা বিদ্রোহী হইয়া দাড়াইল।

এই সময়ে হিন্দুধর্ম্ম পুনরুদ্ধারের জন্য যযাতি কেশরী মগধ হইতে উড়িষ্যায় আগমন করেন; তাঁহার উৎসাহে ও যত্নে উড়িষ্যায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, এবং স্থানে স্থানে তিনি শিব ও বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করেন। ৪৭৪ খৃঃ ইনি উড়িষ্যার রাজা হয়েন এবং জগন্নাথের মূর্ত্তি আনিয়া পুরীতে পুনরায় স্থাপিত করেন।

অনন্তর ১২০৩ খৃঃ যখন আর্য্যাবর্ত্তের মুসলমানদিগের ক্ষমতা ক্রমশঃ উড়িষ্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজি যখন আপনার প্রভুত্ব ক্ষমতা বলে সসৈন্যে বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, সেই সময় হিন্দুদিগের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন নদীয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী বেশে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ কাল অতিবাহিত করেন। যদিও ঐ বিজয়ী মুসলমান সেনাগণ বাঙ্গালার চতুর্দ্দিকে ব্যাপৃত ছিল তথাপি তাহারা উক্ত পলাতক রাজার, উড়িষ্যার বদ্বীপ (Delta) পর্য্যন্ত, অনুসরণ করিতে সাহস করে নাই। অতঃপর ১২২৮ খৃঃ মুসলমান-দিগের তৃতীয় অধিকারী দাউদ গয়াসুদ্দিন উড়িষ্যায় কর আদায়ের জন্য তুমুল বিদ্রোহ ও নানা ষড়যন্ত্র করেন কিন্তু কোন সুফলই উৎপন্ন হইল না। অনন্তর ১২৪৩ খৃঃ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা, প্রতাপশালী তাতার বংশীয়

*Corpus inscription (বৌদ্ধ শিলালিপি)

তুগণ খাঁ উড়িষ্যায় আগমন করেন; তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য পা
বিষয়ে উড়িষ্যাবাসিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং স্বকীয় দৃঢ় সাহস ও ক্ষমতা বলে মুসলমানদিগকে উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গালায় দূরীকৃত করিয়া দেয়। *

এইরূপ কিছুকাল গত হইলে পর, প্রায় ১৫১০ খৃঃ বাঙ্গালার অন্যতর শাসনকর্ত্তা হোসেন সার প্রধান সেনাপতি ইসমাইল গাজী সহসা উড়িষ্যা আক্রমণ করেন কিন্তু সে সময় মুসলমানগণ তাহাদের আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই সুতরাং ১৫৬৮ খৃঃ বাঙ্গালার নবাব সুলেমান তাঁহার প্রধান সেনাপতি কালাপাহাড়ের অধীনস্থ কয়েকজন সুদক্ষ সৈন্য সমভিব্যহারে উড়িষ্যায় যাত্রা করিলেন। উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা মুকুন্দদেব রাজ্য রক্ষার্থে নানা উপায় অবলম্বন করিলেন কিন্তু কিছুতেই সমর্থ হইলেন না; তাঁহার সমস্ত অধ্যবসায় ও চেষ্টা সকলই বিফল হইয়া গেল, অবশেষে তিনি পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন এবং জাজপুরে ম্লেচ্ছের অস্ত্রে নিহত হন। অতঃপর উড়িষ্যা মুসলমানদিগের অধিকৃত হইল।

অনন্তর ১৫৭৪ খৃঃ মোগলদিগের সেনাপতি মুনিন্ খাঁ ও রাজা তোদরমল্লের, বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া, আফগান নবাব দাউদ খাঁর সহিত জালেশ্বরের নিকট মোগলমূরীতে একটি তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে দাউদ পরাস্ত হন। মুনিন্ খাঁ কটকে নির্ব্বিবাদে অগ্রসর হন। অতঃপর এই স্থলে উভয় দলে একটি সন্ধি স্থাপন হয়, তাহাতেই এই মীমাংসা হইল যে উড়িষ্যা ব্যতীত বাঙ্গালা ও বিহার আকবর সাহের অধিকার ভুক্ত থাকিবে, দাউদ কেবল মাত্র উড়িষ্যার নবাব থাকিবেন। কিন্তু মুনিন্ খাঁর হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় দাউদ খাঁ বিদ্রোহী হইয়া সসৈন্যে বাঙ্গালা আক্রমণ করিল। এই সময়ে (১৫৭৬খৃঃ) পাঠান ও মোগলে একটি ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাহাতে পাঠানেরা পরাজিত হয় এবং দাউদ খাঁ নিহত হন। অতপর ১৫৭৮ খৃঃ উড়িষ্যা ও আকবর সম্রাটের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িল।

---

*Hunter's statistical acct. of Urissa.

এই সময় মোগল সম্রাটের প্রধান সচীব, রাজা তোদরমল্লের উপর উড়িষ্যার শাসন ভার দিয়া প্রত্যাগমন করিলে পর পাঠানদিগের কয়েকটি সৈন্য (যাহারা পর্ব্বতে লুক্কায়িত ছিল) সহসা বহির্গত হইয়া নগর আক্রমণ ও মহা বিদ্রোহ সংঘটিত করিল। এবং যে পর্য্যন্ত না আকবর সাহ তাহার দ্বিতীয় হিন্দু সেনাপতি রাজা মান সিংহকে প্রেরণ করিয়াছিলেন সে পর্য্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহের কিছুমাত্র উপশম হয় নাই। ১৫৮০ খৃঃ রাজা মান সিংহ বাঙ্গালা ও বিহারের শাসনকর্ত্তারূপে নিয়োজিত হইয়া উড়িষ্যা উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হন এবং বহু দিবসাবধি যুদ্ধ করিয়া অবশেষে উড়িষ্যা জয় করিলেন। রাজা মানসিংহ বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ রহিলেন।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে পর ১৭১৪।৬ খৃঃ বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ রাজপ্রতিনিধিদিগেব নিকট হইতে কর আদায়ের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু উপায়ান্তর দেখিয়া উড়িষ্যার অন্তর্গত মেদিনীপুব জেলা স্বতন্ত্র কবিয়া লইলেন। ১৭৪২ খৃঃ যখন বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামা প্রবল হইয়া উঠে সেই সময়ে মুর্শিদকুলীর দেওয়ান মীরহবিব তাহাদিগকে প্রচ্ছন্নভাবে উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে অনুযোগ করেন কিন্তু আলিবর্দ্দী খাঁ জানিতে পারিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডয়মান হইলেন কিন্তু ফলে কিছুই করিতে পারিলেন না। এই সময় দুর্ল্লভরাম উড়িষ্যার সুবেদাররূপে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা যখন দেখিলেন আলিবর্দ্দী খাঁ কর প্রদানে অস্বীকৃত এবং তাহা আদায়েরও বিশেষ সম্ভাবনা নাই তখন তাহারা অগত্যা তাঁহার প্রিয়পাত্র দুর্ল্লভ রামকে কয়েদ করিয়া নাগপুরে লইয়া যায়।

অনন্তর আলিবর্দ্দী খাঁ অন্যতর উপায় না দেখিয়া ১৭৫১ খৃঃ তিনি তাহাদিগকে উড়িষ্যা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন এবং বাঙ্গালার চৌথ হিসাবে বাৎসরিক ১২ লক্ষ মুদ্রা দিতে স্বীকার করিয়া দুর্ল্লভ রায়কে মুক্ত করেন।* উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকারভুক্ত হইলে পর শিবভট্ট শাস্ত্রী নামক জনৈক মহারাষ্ট্রী ১৭৫৬ হইতে ১৮০২ খৃঃ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা

*Hunt. Statistical acct.

শাসন করেন; তাঁহার রাজত্ব সময়ে প্রজাবর্গ অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া কেহ কেহ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল।

ক্রমে মহারাষ্ট্রীয় অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, প্রজাবর্গ সকলেই যখন ইংরাজ রাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল, দেখিয়া ইংরাজগণ কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে উড়িষ্যায় বাস্তবিকই অত্যাচার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। † এবং প্রজাবর্গের দুঃখ মোচনের জন্য ইহারা ১৪ অক্টোবর ১৮০৩ খৃঃ সসৈন্যে কটকের দুর্গম দুর্গ আক্রমণ করিলেন এবং যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে তাড়াইয়া দিয়া রাজ্যের ভার আপন হস্তে লইলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রবল পরাক্রম সেই দিবস হইতেই বিলুপ্ত হইল। উড়িষ্যার অস্তোন্মুখ রবি আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রাজ্যে আবার প্রজাগণ সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হইয়া বাস করিতে লাগিল। উড়িষ্যা পূর্ব্বে যেরূপ সুখের স্থান ছিল ইংরাজদিগের সাহায্যে আবার তাহা বিকশিত হইয়া উঠিল।

†Mr. Sterling নামক একজন কমিশনর উড়িষ্যার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া report করেন যে "The administration of the Marhattas in this as in other part of their foreign conquest was fatal to the welfare of the people and the prosperity of the country and exhibits a picture of misrule, anarchy, weakness, rapacity and violence combined which makes one wonder how society can have kept together under so calamitous a tyranny."—(Asiatic Researches Vol. XV.)

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

কেটো না ঐ তরুটীরে।

১

কেটো না ঐ তরুটীরে, শৈশবে উহায়
নিজ হাতে করেছি রোপণ—
নিদারুণ কুঠারের ঘায়,
শাখা ওর করো না ছেদন।

২

বহু দিন হ'তে আছে উঠানের মাঝে,
সহিয়াছে কত শত ঝড় ;
দেখো যেন দেহে নাহি বাজে,
গায়ে যেন লাগে না আঁচড়।

৩

নিদাঘে তপন তাপে পাদপ আমারে
দিত রোজ ছায়া সুশীতল ;
তাই বলি কেটোনা উহারে,
ছুঁওনাক পল্লব কোমল

৪

অকাতরে বারিধারা ধরেছে মাথায়—
সহিয়াছে রবির উত্তাপ ;
কত গুণ কহা নাহি যায়,
উহারে কাটিলে হবে পাপ !

৫

পিতা মাতা তরুটীরে বাসিতেন ভাল,
করিতেন কতই যতন ;
নিজ হাতে লয়ে আলবাল,
করিতেন সলিল সিঞ্চন।

প্রিয়া সহ এক দিন ঐ তরুতলে
করিয়াছি প্রণয়-সম্ভাষ !
কত দিন নয়নের জলে
নিভায়েছি হৃদয় উচ্ছ্বাস !

৭

বিহঙ্গম বসি কত ঐ তরু'পরে
শুনায়েছে মধুর কাকলি ;
বড মম বাজিবে অন্তরে
কেটো না উহারে যাও চলি।

শ্রীরামগোপাল ঘোষ

হিমাচল।

২। গহনা হ্রদ।

গত বারের প্রবন্ধ যখন লিখিয়াছিলাম, তখন হিমালয় সম্বন্ধীয় কতকগুলি সাধারণ কথা লিখিব এইরূপই সংকল্প ছিল। বিগত বৎসর ভাদ্র মাসে গাঙ্গেয় উপত্যকায় যে অতি বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, সে দিন সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, অথচ ঘটনাটি বঙ্গীয় পাঠকের অবশ্য জ্ঞাতব্য। সংবাদ পত্রে ইহার উল্লেখ প্রতিদিনই দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু সাময়িক পত্রিকার পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত নয় ; বিশেষতঃ তাদৃশ সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পাঠ করিয়া কেহ প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারিতেছেন কি না সন্দেহ করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। এই জন্য নিম্নে একটু বিস্তৃত বিবরণ লিখিতেছি।

যে স্থানে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার নাম গহনা। গহনা অতি ক্ষুদ্র পল্লী, অতি স্বল্প সংখ্যক কৃষিজীবীদিগের আবাস স্থান। এই গিরি-কন্দরশায়ী ন-গণ্য গ্রাম সহসা মহা বিপদগ্রস্ত হইয়া অক্ষয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এই মুহূর্ত্তে গহনায় কি হইতেছে জানিবার জন্য গঙ্গাতীরবাসী সকলেই উৎকণ্ঠিত, জানাইবার জন্য ইংরেজরাজ তথা হইতে হরিদ্বার পর্যন্ত

টেলিগ্রাফের তার বসাইয়াছেন, তত্ত্বাবধান করিবার জন্য এঞ্জিনীয়ারগণ নিয়োজিত হইয়াছেন, কেন এরূপ হইল নির্ণয় করিবার জন্য ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া এখন বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছেন, আর কখন কি হয় তাহার আলোকালেখ্য অঙ্কনোদ্দেশে একদল ফোটাগ্রাফার মোতায়েন হইয়াছে; আজ গহনার প্রতি সকলেরই চক্ষুঃ নিয়োজিত, এমন কি সুদূর বিলাতে পর্য্যন্ত নানা কল্পনা জল্পনা চলিতেছে।

গহনা কোথায় এক কথায় বলা সুকঠিন, বোঝা আরও সুকঠিন; সেই জন্য ভৌগলিক তত্ত্বটা একটু বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইল। হরিদ্বার কোথায় অন্ততঃ মেলাভঙ্গ মাহাত্ম্যে সে বিষয়ে অনেকের অল্পবিস্তর ধারণা থাকা সম্ভব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি ভ্রমাত্মক ধারণাও আছে। অনেকের বিশ্বাস—আমারও পূর্ব্বে ছিল—যে হরিদ্বারই গঙ্গার উৎপত্তি স্থান। শ্রীহরির পাদপদ্ম হইতে গঙ্গাস্রোতঃ বিনির্গত, এবং সেই পাদপদ্ম হরিদ্বারে, এই ধারণাই বোধ করি উক্ত বিশ্বাসের মূলভিত্তি। বাস্তবিক কিন্তু ভাগীরথীর প্রকৃত উৎপত্তিস্থান হরিদ্বার হইতে ন্যূনাধিক একশত ক্রোশ উত্তরে চিরতুষারমণ্ডিত অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ বিশেষে। এই শৃঙ্গবরের লৌকিক নাম বান্দরপুচ্ছ। বান্দরপুচ্ছ হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত প্রায় নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বত-মালা মন্দাকিনীকে বক্র পথানুবর্ত্তিনী হইতে বাধ্য করিয়াছে। এই সুদীর্ঘ পথ কিন্তু সুরধুনীকে একাকিনী আসিতে হয় নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিনদী কত কে আসিয়া সুরতরঙ্গিনীর পূতবারিতে নিজ নিজ ক্ষুদ্র প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কৃতার্থ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। অধিকন্তু হরিদ্বার হইতে ত্রিশ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে দেবপ্রয়াগ নামক পবিত্র তীর্থস্থানে বামদিক হইতে প্রসন্নসলিলা অলকনন্দা আসিয়া জাহ্নবীজীবনে জীবন সমর্পণ করিয়াছে। অলকনন্দারও অতুল গৌরব। তীর্থকুল গরিষ্ঠ কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম হইতে দেবাদিদেবের চরণামৃত ইহাতে সংগৃহীত। গুপ্তকাশী, তুঙ্গনাথ, তপোবন প্রভৃতি আরও অনেকানেক তীর্থবারি অলকনন্দায় সংশ্লিষ্ট। ফলতঃ অলকনন্দার পূতবারি যাত্রিগণ কর্ত্তৃক ভারতের সর্ব্বত্র অতি সমাদরে নীত হইয়া থাকে। অপিচ যে যে স্থানে এক একটি পবিত্র নদীর অলকনন্দার সহিত সংযোগ হইয়াছে সেই সেই স্থান এক একটি প্রয়াগ বলিয়া বিখ্যাত। এইরূপ পাঁচটি প্রয়াগে অলকনন্দার তীরভূমি

সুশোভিত ও পবিত্রীকৃত হইয়াছে। এই প্রয়াগ পঞ্চের নাম যথা—
বিষ্ণুপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ ও (পূর্ব্বোল্লিখিত) দেব-
প্রয়াগ, পাঁচটি প্রয়াগ আছে বলিয়া এমন বুঝিতে হইবে না যে পাঁচটির
অধিক নদী অলকনন্দায় আসিয়া মিশে নাই। বস্তুতঃ বামে ও দক্ষিণে
ছোট বড় কতই যে নির্ঝরিণী ঝর ঝর রবে নগেন্দ্র কন্দর প্রতিধ্বনিত
করিয়া, শিলাস্তূপে নৃত্য করিতে করিতে, অলকনন্দাকে সাদর আলিঙ্গন
করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা সহজ নয়। ইহাদের অন্যতমের
নাম "বিরহী" গঙ্গা। এই ক্ষীণা স্রোতস্বতী ত্রিশূল নামক অত্যুচ্চ *
পর্ব্বতশৃঙ্গের পাদদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত,
ও বিরহী নামক ক্ষুদ্র গ্রামের নিম্নে অলকনন্দায় সংমিলিত। ইহার দৈর্ঘ
কিঞ্চিদধিক ২০ মাইল এবং যে ভূখণ্ড হইতে বৃষ্টিধারা আসিয়া ইহাকে
পরিপোষণ করে তাহার বিস্তার অন্যূন ৯ মাইল, অর্থাৎ প্রায় দ্বিশত
বর্গ মাইল ভূমির বৃষ্টিজল বিরহী গঙ্গার নিকট হইতে অলকনন্দা করস্বরূপ
গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিরহীগঙ্গা-দোহিত এই ভূখণ্ডের উত্তর পূর্ব্ব ও
দক্ষিণে পর্ব্বত প্রাকার, পশ্চিমে অলকনন্দা, পূর্ব্ব সীমায় ত্রিশূল শৃঙ্গ এবং
উত্তরে প্রায় তত্তুল্য উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, দক্ষিণ সীমা তত উচ্চ নয়। পূর্ব্ব
ও উত্তরের পর্ব্বত বেষ্টের উপবিভাগ চির-হিমানী মণ্ডিত;—গ্রীষ্ম ঋতুতে
নিম্নাংশের বরফ কিঞ্চিৎ গলিয়া যায়,—শীত সমাগমে আবার সে টুকু
পূর্ব্ববৎ হইয়া দাঁড়ায়। বিরহী গঙ্গার উভয় তটস্থ পর্ব্বতাঙ্গের ঢাল অত্যন্ত
অধিক, কোনও কোনও স্থানে প্রাচীরবৎ লম্বভাবে অবস্থিত। এই সকল
স্থানে স্রোতস্বিনী অতি গভীর অথচ অপ্রশস্ত শিলাময় সংকীর্ণ পথে ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র জলপ্রপাতে নাচিতে নাচিতে প্রবাহিত। এই প্রকার গিরিসঙ্কটকে
ইংরাজী ভাষায় Gorge বলে।

এতক্ষণে গহনা গ্রাম কোথায় কি ভাবে আছে, বলিবার সময়
হইয়াছে। অলকনন্দা ও বিরহী গঙ্গার সঙ্গম স্থান হইতে চারি ক্রোশ
পূর্ব্বে শেষোক্ত নদীর উত্তর তটে এই ক্ষুদ্র গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রাম
পশ্চিমোত্তর প্রদেশীয় রাজপুরুষদিগের শৈত্যাবাস নাইনীতাল হইতে

*সমুদ্র বক্ষঃ হইতে ২১,২৮৬ ফিট

প্রায় ৭০ ক্রোশ উত্তরে ও হরিদ্বার হইতে ৮০ ক্রোশ উত্তরাগ্নি-পূর্ব্বে। প্রসিদ্ধ তীর্থ কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম ইহা হইতে অধিক দূরে নয়। শেষোক্ত তীর্থের যাত্রীগণ নন্দপ্রয়াগে মন্দাকিনী * দর্শনান্তেই চামোলী চটির অল্প পূর্ব্বে বিরহী গঙ্গা দর্শন করিয়া থাকেন।

গহনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একটি সুগভীর ও অতি সংকীর্ণ গিরিসঙ্কট বা Gorge ছিল। ইহারই উত্তরে ময়স্থান নামক এক উচ্চ পর্ব্বতচূড়া † করাল বেশে দণ্ডায়মান। কত সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া ক্ষুদ্রপ্রাণা বিরহী গঙ্গা ময়স্থানের গর্ব্বিত চরণ প্রান্তে কাতরকণ্ঠে বিনীত নিবেদন করিয়াছে 'প্রভো, একটু সরিয়া দাঁড়াও, আমাকে একটু পথ দেও, নতুবা প্রস্তর পেষণে মারা যাই যে।' হায় ময়স্থান সে কথায় তুমি কর্ণপাত কর নাই, স্বীয় মহত্ত্ব গর্ব্বে প্রমত্ত হওয়ায় আর্ত্তরোদনে তোমার পাষাণ হৃদয় গলে নাই। কিন্তু আজ তোমার কি দশা? সেই কৃপা ভিখারিণী বিরহী গঙ্গা অচিরে তোমার শব দেহকে উল্লঙ্ঘন করিবে, অথবা তোমার বিপুল বপুকে সহস্র ক্রোশ নিক্ষেপ করিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিবে। ধনজনৈশ্বর্য্য মদগর্ব্বীদের কি চমৎকার শিক্ষাস্থল!

ভাদ্র মাস অতীত প্রায়। বর্ষা শেষ হইয়া আসিয়াছে। আকাশে কচিৎ দুই একখানি শুভ্র মেঘ দৃষ্ট হয়, নীলাম্বরের স্নিগ্ধরশ্মিতে জগৎ বিভাসিত। এই সময়ে হিমাচল প্রদেশে প্রকৃতি দেবী পরম রমণীয় সুষমা ধারণ করেন। সেই অতুল রূপরাশির বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়া হাস্যাস্পদ হইতে ইচ্ছা করি না। সে কাজ করিব—তাও যে-সে-কবির নয়। তবে শুদ্ধ এইটুকু বলিব, যদি কেহ একই মুহূর্ত্তে সৃষ্টিকর্ত্তার মহত্ত্ব ও বিশ্বরচনার বৈচিত্র উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ কঠোরতা ও কোমলতার একত্র সমাবেশ দেখিতে চান, যদি কাহারও হর্ষ ও বিস্ময়ে যুগপৎ বিমুগ্ধ হইতে সাধ হয়; তিনি যেন একবার শরতের প্রারম্ভে কেদার খণ্ডান্তর্গত হিমাদ্রি প্রদেশ পরিদর্শন করেন।

*অলকনন্দা করদা নদী বিশেষ।

†সাগর বক্ষঃ হইতে ১১১০৯ ফিট্।

আজ ২২শে ভাদ্র, বুধবার, কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী তিথি। গহনার প্রবীণ অধিবাসিগণ একত্রে বসিয়া পুনরায় বর্ষা পড়িবার সম্ভাবনা আছে কি না, এবং কতদিনে লবণ আনিতে সহরে যাওয়া যাইতে পারিবে, সে বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেছে ; কখন কখন কাহার কোন ক্ষেত্রে কত শস্য উৎপন্ন হইবে, কাহার কোন্ ছাগী কয়টি ছাগশিশু প্রসব করিয়াছে, আগামী ফাল্গুনে কোন্ ছেলেটির কোন্ মেয়েটির সঙ্গে বিবাহ হইবে, পাটোয়ারীর রাজস্ব সংগ্রহ করিতে কত দিনে আসিবার সম্ভাবনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথোপকথন চলিতেছে। বর্ষার পর রবিকিরণানুভব করিয়া সকলেই হর্ষান্বিত, সকলেরই বদনমণ্ডলে কেমন এক অস্ফুট সুখের শান্তিময় ছবি। গ্রামবাসিগণ পূর্ব্বাস্যে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে ছোট ছোট শাদা মেঘগুলি ময়স্থানের উচ্চ চূড়াকে বেষ্টন করিয়া অতি অলসভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখনও বা পিঞ্জিত তূলার ন্যায় এক এক খণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ গিরিশৃঙ্গে আসিয়া গাঢ়তর শুভ্রে মিলিতেছে, আবার কদাচিৎ ঐরূপ ছোট ছোট মেঘ অতি ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হইয়া বায়ুসাগরে গা ছাড়িয়া দিয়া দেখিতে দেখিতে আকাশের স্নিগ্ধ নীলিমায় মিশিয়া যাইতেছে। সহসা ও কি ? শত বজ্রনিনাদের ন্যায় কিসের শব্দ ও ? ঐ যা, ময়স্থান চূড়া ত আর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না ! এ দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রামের দিকে, কোন্ দিকে নয় ? প্রধাবিত হইতেছে ! তন্মুহূর্ত্তেই গ্রামবাসিগণ যে যেখানে পারিল ছুটিতে লাগিল, মা শিশুর জন্য অপেক্ষা করিল না, কেহই স্ত্রী পুত্র পরিবারের মুখ চাহিল না, সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে সমন্তাৎ ধাবমান। আকাশমণ্ডল ধূলিধূষরিত হইল, কেহই আর কিছু ভাল দেখিতে পায় না, ধূলিবৃষ্টিতে চক্ষুরুন্মীলন করে কাহার সাধ্য ? বড় বড় শিলাখণ্ড নিম্নে পতিত হইয়া অপর পারে ঊর্দ্ধমুখে ভীমবেগে ছুটিতে লাগিল, এই ভাবে অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত উঠিয়া পুনরায় কুম্ভকার চক্রের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বিরহী বক্ষে আসিয়া যেন ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়া—পতন, উত্থান ও পুনঃপতনে পর্ব্বতস্কন্ধশোভী কত শত বনস্পতি যে উৎপাটিত ও ভূপতিত হইল, কে তাহার সংখ্যা করিবে ? পক্ষিকুল ভয়াকুলচিত্তে বিকট স্বরে ডাকিতে ডাকিতে তীরবেগে ইতস্ততঃ উড়িয়া গেল। বন্য পশুগণ সন্ত্রাসিত ভাবে চতুর্দ্দিক প্রধাবিত, আজ আর খাদ্য খাদক বিচার

নাই; হরিণ শিশু শার্দ্দূলকুক্ষিতে শৃঙ্গাঘাত করিয়া চলিয়া গেল, ব্যাঘ্র তৎপ্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া স্বীয় গন্তব্য পথেই ছুটিতেছে। ওদিকে বিরহী গঙ্গা শুকাইয়া গিয়াছে, মৎস্যগণ নির্জ্জল শিলাতলে কিয়ৎক্ষণ ধড়ফড় করিয়া মরিয়া যাইতেছে।

তিন দিন এই ভাবে মহাপ্রলয়ের অভিনয় চলিতে লাগিল। শরৎ-কালের সুশ্যামল তরুলতা গুল্মাদি ধূলি ধূষরিত হইয়া বিকট শ্রী ধারণ করিল, বহুদূর পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব ধূষর মেঘান্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিলেন, মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ বহুদূর হইতে শ্রুত হইয়াছিল, তিন দিন পরে সকলে দেখিল ময়স্থানের উচ্চ চূড়া পুরাণ প্রসিদ্ধ মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় বিরহী গঙ্গায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে, আর তাহার মৃতদেহ নদীর এক তট হইতে তটান্তর পর্য্যন্ত প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ, পূর্ব্ব কথিত গিরিসঙ্কট হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত এবং নদীর তলদেশ হইতে আট শত হস্ত ঊর্দ্ধ স্খলিত প্রস্তর ও মৃত্তিকা স্তূপরূপে পড়িয়া রহিয়াছে।

এই অভিনব ভীম কলেবর স্তূপের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে চান কি? ভারত সাম্রাজ্যের ২৮ কোটি ৭০ লক্ষ অধিবাসী যদি প্রত্যেকেই বাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্ব্বিশেষে প্রত্যহ স্তূপাঙ্গ হইতে এক মণ মৃত্তিকা বা প্রস্তর তুলিয়া লইয়া যায় তাহা হইলে ৩ মাস সময়ে সমস্ত স্তূপ নিঃশেষিত হইতে পারে। সম্মুখে এই বিকট মূর্ত্তি বিপুল স্তূপ পথ বন্ধ করিয়া পড়িয়া আছে, এখন গরীব বিরহী গঙ্গা যায় কোথায়? ইহাকে তখনই ঠেলিয়া ফেলা ত তাহার সাধ্য নয়। তাই গত বৎসরের সেই দিন হইতে একাল পর্য্যন্ত বিরহী ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া ফুলিতেছে, আর গন্তব্য পথ রুদ্ধ হওয়ায় অলকনন্দার রাজস্ব বকায়া ফেলিয়া নিজের তহবিলটি হ্রদে পরিণত করিতেছে। এই নিবিড় বর্ষায় হ্রদের জল হুঁ হুঁ বাড়িয়া যাইতেছে, আর অলকনন্দা তথা গঙ্গাতীরবাসিগণ প্রাণ লইয়া অতি দূরে পলায়ন করিতেছে। যাহারা স্বেচ্ছায় না যাইতেছে সরকার বাহাদুর তাহাদিগকে জবরদস্তিতে তুলিয়া দিতেছেন। নদীদ্বয়ের উভয় তটে যতদূর পর্য্যন্ত জল উঠিবার সম্ভাবনা তত উচ্চে স্থানে স্থানে প্রস্তর স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, আর ঢোল বাজাইয়া প্রজাগণকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে কেহই যেন কখনও স্তম্ভ

সমূহের নীচে না যায়। এদিকে নূতন বাঁধের পশ্চাতে, ৪ শত হস্তের অধিক গভীর, বাঁধ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ৩ মাইল দীর্ঘ ও স্থলবিশেষে প্রায় দেড় মাইল প্রশস্ত একটি হ্রদ ইতি মধ্যেই প্রস্তুত হইয়াছে। এক্ষণে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে, বাঁধটি পশ্চাৎস্থিত জলের ভারে ভাঙ্গিয়া যাইবে—না, যতদিন পর্য্যন্ত হ্রদের জলে উচ্ছ্বলিত না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত এই ভাবেই থাকিবে ?

শেষোক্ত অনুমানই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইতেছে, কেন না বাঁধ মহাশয় ত বড় সহজ নন যে বিরহী তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবে, কিন্তু ইহাতেও আশঙ্কা না আছে এমন নয়। বাঁধের উপরিভাগ সমতল নয়। দুই প্রান্ত অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও প্রস্তর বহুল, আর মধ্যস্থল কিঞ্চিন্নিম্ন ও মৃণ্ময়। এই নিম্ন অংশ পর্য্যন্ত জল উঠিলেই বাঁধের উপর দিয়া জল চলিতে আরম্ভ হইবে। তখন সেই মৃণ্ময় অংশ এই জল রাশির উদ্যম বেগ কতক্ষণ কি ভাবে সহ্য করিতে পারিবে তাহারই কল্পনা জল্পনা চলিতেছে উপরে যে মৃত্তিকা দেখা যাইতেছে, তাহার নীচেই যদি খুব বড় বড় পাথর থাকে, তাহা হইলে উপরের মাটি টুকু ধুইয়া গেলেই নদীর জল অনেকটা সহজভাবে নামিতে থাকিবে, আর বাঁধের পশ্চাদভাগে একটি সুচিরস্থায়ী সুগভীর হ্রদ থাকিয়া যাইবে। কিন্তু যদি ঐরূপ পাথর না থাকে তাহা হইলে জলের তোড়ে মাটি গলিয়া যাইতে বড় বেশী বিলম্ব হইবে না, অর্থাৎ কি না সমস্ত বকেয়া মালগুজারী একেবারে প্রথমে অলকনন্দায় এবং ক্রমে গঙ্গায় আসিয়া তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করিবে, অল্পক্ষণ মধ্যেই হ্রদের হ্রদত্ব লোপ পাইবে, আর ময়স্থানের ভীমতনু রেণু রেণুরূপে বঙ্গোপসাগরাভিমুখে প্রধাবিত হইবে।

অনুমান করা হইয়াছে যে শ্রাবণ মাসের শেষভাগে বাঁধের উপর দিয়া জল চলিবে। যদি সে সময়ে আমাদের শান্ত শিষ্ট বঙ্গীয় গঙ্গায় কোনও ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তবে জানিবেন গহনার নূতন হ্রদের সূতিকাগারেই গঙ্গালাভ হইয়াছে।

আমার প্রবন্ধটি ক্রমে দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, নতুবা অভিনব হ্রদটি যে কি অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছে তাহা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিতাম, তবু ভাবুক পাঠককে অনুরোধ করি, তিনি যেন কল্পনারথে আরোহণ

করিয়া এই সময় একদিন বাঁধের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাচীদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করেন। দেখিবেন, পুরোভাগে অতি দূরে শুভ্রশিরা ত্রিশূল-গিরি রবিকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, তন্নিম্নে নীলাভ-নিবিড়-বনস্থলী-বিশোভিত ক্রমনিম্ন পর্ব্বতরাজি প্রকৃতি দেবীর মনোজ্ঞ-দর্পণ-সদৃশ সেই নব-সরসীর চতুষ্প্রান্তে অর্দ্ধ নিমজ্জিত ভাবে দণ্ডায়মান, ঈষদ্-হরিদাভ-নীল-স্বচ্ছ-সলিলে তাহাদের বিপর্য্যস্ত প্রতিবিম্ব তরঙ্গ-হিল্লোলে তালে তালে নৃত্য করিতেছে; আর দেখিবেন, যদি প্রত্যুষে উঠিয়া গিয়া থাকেন, ত্রিশূল শিরে বালার্ক সিন্দূর তিলক, সরসী সলিলে বালারুণ লোহিত-রাগ, আর অনুচ্চ ঊর্ম্মিমালাসহ মরীচিমালীর বাল্য-সুলভ জলকেলি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল।

রাসলীলা।

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন, বঙ্গীয় সুশিক্ষিতের মধ্যে এরূপ ব্যক্তির অভাব নাই। কিন্তু ইংরাজি শিক্ষিত অনেক নর নারীর হৃদয়ে আজ কাল এই জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে যে অধর্ম্মের উপাদানে বৈকুণ্ঠ ভবন রচিত হইয়াছে কেন? শেষোক্ত ব্যক্তিরা সচরাচর জিজ্ঞাসা করেন, পরদারাভিমর্ষণ দোষে দূষিত শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? রাসলীলা করিবার নিমিত্ত নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক ব্যভিচার অভিযোগে অভিযুক্ত। কিন্তু শাস্ত্র ভগবানের প্রতিনিধি। সেই শাস্ত্র শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে এই অভিযোগ মুক্ত করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং তাঁহাকে নির্দ্দোষ এবং অপাপ বিদ্ধ ও পরম পরিশুদ্ধ সাব্যস্ত করিতে পারগ।

রাস প্রভৃতি ব্রজলীলা শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পূর্ব্বেই হইয়াছিল। যদি কংসালয়ে যাওয়ার কালে তাঁহার বালকত্ব সপ্রমাণ হয় তাহা হইলে আমাদের বিপক্ষ পক্ষের অনেক পরিমাণে মুখবন্ধ হওয়া সম্ভব। বধিরের সঙ্গীত শ্রবণের ন্যায় বালকের রমণী সম্ভোগ একান্ত অসম্ভব এবং প্রকৃতি ও স্বভাব বিরুদ্ধ।

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চদশ অধ্যায়ের পঞ্চমাংশে কংস কহিতেছেনঃ—

(ছয়ের শ্লোক দেখ)

যাবন্ন বলমারূঢ়ৌ রাম কৃষ্ণ সু-বালকৌ।
তাবদেব ময়াবধ্যাবসাধ্যা রূঢ় যৌবনৌ॥

অর্থাৎ যত দিন রাম কৃষ্ণ অত্যন্ত বালক থাকিবে এবং বলপ্রাপ্ত না হইবে তত দিন তাহাদের বধ করিতে আমি সমর্থ। যৌবন প্রাপ্ত হইলে তাহারা আমার অবধ্য। ইহার পর কংস আবার বলিতেছেনঃ—

শ্বফল্কতনয়ং সোঽহম ক্রূরং যদুপুঙ্গবং।
তয়োরানয়নার্থায় প্রেষয়িষ্যামি গোকুলং॥

অর্থাৎ তাদের দুই জনকে আনিবার জন্য আমি যাদবশ্রেষ্ঠ অক্রূরকে গোকুলে প্রেরণ করিব। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে যৎকালে কংসরাজ রাম কৃষ্ণকে মথুরায় আনিবার জন্য অক্রূরকে ব্রজে পাঠান তখন তাহারা সুবালক অর্থাৎ সম্পূর্ণ বালক ছিলেন। এ বিষয়ের আরও প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

মহাভারতের হরিবংশ পর্ব্বের ৮১শ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, অক্রূর ব্রজে আসিয়া নন্দরাজ ভবনে প্রবেশানন্তর "অব্যক্ত যৌবন সেই মহাত্মা কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া" কহিতে লাগিলেনঃ—"হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনাকে প্রণাম করি। আপনি বালক নহেন, আদ্য পুরুষ।" হরিবংশ পর্ব্বের ৮৬শ অধ্যায়ে কংস সহ সংগ্রামোপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেনঃ— "আমি বালক—আমি বালক হইলেও মৎকর্ত্তৃক যুদ্ধের কোন ব্যতিক্রম হইবে না।"ব্রজলীলা করণ কালে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যে সুবালক ছিলেন, তাহা সংস্থাপন করণার্থ বোধ হয় এই সকল প্রমাণই যথেষ্ট।

রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ যে রমণী সম্ভোগ করেন নাই, তাহার অন্যবিধ প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। কোন কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে প্রকাশ যে ১৬০০০ গোপিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিহার করিতেন। যতই কেন ধারণা ও আসঙ্গশক্তি পরিবর্দ্ধিত করা যাউক কোনও পুরুষের পক্ষে নিত্য ১৬০০০ রমণী সম্ভোগ করা একবারেই অসম্ভব। আর এই ১৬০০০ ব্রজাঙ্গনাদের মধ্যে কাহারও সন্তান হওয়া প্রকাশ পায় না। বীজ ও ক্ষেত্রের অথবা উভয়ের দোষে সন্তান সম্ভূত হয় না। সহস্র

সহস্র ক্ষেত্রের মধ্যে কোন একটিও উর্ব্বর ছিল না ইহা একান্ত অসম্ভব। আর বীজের যে দোষ ছিল না তাহা একরূপ নিশ্চয়; কেননা শ্রীকৃষ্ণ বহু কোটি যদুবংশের জনয়িতা। এ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে, কথাটি শ্রীমদ্ভাগবতের ৩৩শ অধ্যাযে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহা এইঃ—"সত্য সঙ্কল্পে শ্রীকৃষ্ণ আপনাতে শুক্ররুদ্ধ রাখিয়া সেই সমস্ত রসের আশ্রয়ীভূত নিশা সকল উক্ত প্রকারে সম্ভোগ করিয়াছিলেন।" বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ যোগীশ্বর মহাদেবের ন্যায় উর্দ্ধরেতা হইয়া যে গোপীগণ সহ বিহার করিতেন, ভাগবতোক্ত উপরি কথিত বাক্যই তাহার প্রমাণ।

রাসলীলাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে "শ্রীগোবিন্দ সেই সকল স্ত্রীবত্নে বেষ্টিত হইযা রাসলীলা আরম্ভ করিলেন। দুই দুই জনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপিকাদিগের কণ্ঠ ধারণ করিলেন।" অগণ্য রমণী লইয়া পুরুষ এই ভাবে রতিকার্য্য কবেন কি না এবং এইরূপে তাহার তদ্‌কার্য্য করা সম্ভব কি না ইহাও সুবুদ্ধিদের বিচার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরদারাভিমর্ষণ দোষ অর্পিত হইতে পারে কি না এক্ষণে সে বিষয়ের বিচার করা যাউক। ভাগবতের গোপীগণের বস্ত্রহরণ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছেঃ—নন্দব্রজের কুমারীগণ কাত্যায়নীর অর্চ্চনরূপ ব্রত আরম্ভ করিল। গন্ধ মাল্য নৈবেদ্য দ্বারা কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করত মহামায়ার স্থানে এইরূপ প্রার্থনা করিলঃ—"হে মহাযোগিনি! নন্দ গোপের পুত্রকে আমাদিগের স্বামী করিয়া দিউন।" কুমারিকাগণের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া ভগবান জনার্দ্দন তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন "হে অবলাগণ! তোমরা ব্রজে গমন কর, সিদ্ধ হইয়াছ। সতীগণ! আগামিনী যামিনী সকলে তোমরা আমার সহিত বিহার করিতে পারিবে। আমাকেই উদ্দেশ করিয়া তোমরা ভগবতীর অর্চ্চনরূপ ব্রত করিয়াছ।" কৃতার্থা কুমারিকাগণ ভগবানের আদেশ পাইয়া তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে অতি কষ্টে ব্রজে গমন করিয়াছিল। ইহাতে দেখা যায় যে, যে সকল স্ত্রীগণ লইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করেন, তাহারা সকলেই কুমারিকা। শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য তাহারা কাত্যায়নী ব্রত করেন এবং তাহাদের মনোভিলাষও পূর্ণ হইয়াছিল অর্থাৎ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে তাহারা পতিরূপে প্রাপ্ত

হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্যভিচারাভিযোগ কিরূপে অর্পিত হইতে পারে? আর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজকুমারীগণকে "তোমরা সিদ্ধ হইয়াছ" বলিয়াছিলেন। "সিদ্ধ" এই শব্দটি যোগ শাস্ত্রের। ইষ্টদেবকে লাভ করিলেই লোকে সিদ্ধ হইয়া থাকে। গোপীগণ বল্লভরূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া সিদ্ধ, আপ্তকাম হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে রাসলীলা সংশ্লিষ্ট ব্রজবাসীগণ কুলকণ্টক এবং নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ লম্পট ব্যভিচারী নন। কথিত গোপিকাগণ সিদ্ধ প্রকৃতিপুঞ্জ এবং যশোদানন্দন শ্যামসুন্দর যোগীশ্বর, যোগফলদাতা পরব্রহ্ম।

ভাগবতাদি পুরাণে নন্দনন্দন কৃষ্ণ পরব্রহ্মরূপে কীর্ত্তিত। ভগবানের স্বদার এবং পরদার নাই। তাঁহাকে জগৎস্বামীরূপে চিন্তা করিলে স্ত্রী মাত্রে তাঁহার পত্নী হইয়া পড়ে। এই তর্কানুসারে পরদারাভিগমন অভিযোগ তাঁহার প্রতি বর্ত্তে না। ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২৯শ হইতে ৩৩শ অধ্যায় নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে তাঁহাদের আত্মাতে রমণ করিবার জন্য গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের পতিত্বে বরণ করেন।

গোকুল হইতে মথুরায় এবং তথা হইতে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ গমন করেন। মহাভারতীয় সভাপর্ব্বে অর্ঘ্যাহরণ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে, শান্তনুতনয় বীর্য্যবান ভীষ্ম বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করিয়া কৃষ্ণকে ভূমণ্ডল মধ্যে প্রধান অর্চ্চনীয় বিবেচনা করিলেন; কহিলেন "যেমন ভাস্কর সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বান তদ্রূপ ইনি এ সমস্ত রাজগণের মধ্যে তেজ, বল এবং পরাক্রম দ্বারা সমধিক উদ্ভাসমান।" ইহার পর ভীষ্ম কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সহদেব কৃষ্ণকে প্রধান অর্ঘ্য প্রদান করেন। কৃষ্ণ-চরিত ব্যভিচার অথবা চৌর্য্য দোষ সম্পৃক্ত হইলে রাজন্য রাজশোভিত সেই বিরাট সভায় শ্রীকৃষ্ণ এরূপ পূজা ও সমাদর কখনও প্রাপ্ত হইতেন না। বাসুদেবের প্রতি এই পূজা সহ্য করিতে না পারিয়া চেদিরাজ শিশুপাল তাঁহাকে অশেষবিধ ভৎর্সনা করেন, কিন্তু "তুমি ব্যভিচারী এবং চোর" এই গালি শ্রীকৃষ্ণ প্রতি চেদিরাজ বর্ষণ করেন নাই। শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের এই পর্য্যন্ত নিন্দা করিয়াছিলেনঃ—"এই বাসুদেব না ঋত্বিক, না আচার্য্য না রাজা, কিছুই নন। ইনি রাজ লক্ষণের অনধিকারী; পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা জরাসন্ধকে অন্যায়ে নিহত করেন।" ব্যভিচারী

হইয়া থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের ব্যভিচারের কথা তৎকালে অবশ্যই কুরুক্ষেত্রে রাষ্ট্র হইত এবং তাঁহার ব্যভিচারের উল্লেখ করত বাসুদেবকে নিন্দা করিতে শিশুপাল কখনই ক্ষান্ত হইতেন না। ভীষ্মদেব এবং শিশুপালের সেই বিরাট সভায় বাসুদেব প্রতি ব্যবহার দ্বারা তিনি যে ব্যভিচারী ছিলেন না ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে।

এই সঙ্গে এই কথাটিরও উল্লেখ অসঙ্গত হইবে না। কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে লিখিত আছে যে একদা গোপীগণ যমুনাতটে আসিয়া দেখিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ দানী হইয়া যমুনার তটে বিদ্যমান। গোপীগণ তাঁহাকে পার করিয়া দিতে বলায় অন্যান্য কথার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে এই পরামর্শ দেন ঃ—তোমরা যমুনাকে যাইয়া বল, হে যমুনে! শ্রীকৃষ্ণ যদি কখনও পরস্ত্রী গমন না করিয়া থাকেন তবে তুমি আমাদিগকে পথ প্রদান কর, আমরা পার হইয়া যাই। কথিত বৈষ্ণব গ্রন্থে প্রকাশ যে গোপীগণ ঐ কথা যমুনাকে বলায় তিনি পথ ছাড়িয়া দেন এবং গোপবধূগণ পার হইয়া যান। শ্রীকৃষ্ণ যে ব্যভিচারী ছিলেন না এ ঘটনা দ্বারা কতক পরিমাণে সাব্যস্ত হয়।

"গীতাসু...ব্রহ্মস্বরূপিণী" শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা ব্রহ্মস্বরূপ। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত এবং অতি বিশুদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ গীতা জ্ঞান দ্বারা অর্জ্জুনকে সম্যক জ্ঞান বলিয়াছেন। যেমন তেমন ব্যক্তি অথবা ব্যভিচারী হইলে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ কখন এই গীতার বক্তা রূপে মনোনীত হইতেন না। শান্তনুতনয় পরম জ্ঞানী মহাভারতীয় শান্তি পর্ব্বোক্ত যোগ মার্গের কথক ভীষ্মদেবকেও উপেক্ষা করত শ্রীকৃষ্ণকে এই গীতার বক্তা মনোনীত করার অবশ্য বিশেষ কারণ আছে। হয় শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর নতুবা পরম আদর্শ পুরুষ। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ ত্রিকালজ্ঞ ব্যাসদেবেরও পরিচিত ছিল না। সর্ব্ব প্রকার ব্যভিচার পরিশূন্য অপাপবিদ্ধ এবং পরম বিশুদ্ধ চিত্ত না হইলে বাসুদেব কৃষ্ণ গীতার বক্তারূপে কখন পরিগৃহীত হইতেন না।

বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিবংশাপেক্ষা ভাগবত অধিকতর অভিনব পুরাণ। বিষ্ণুপুরাণে রাসলীলা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথাঃ—"গোবিন্দ শরচ্চন্দ্র মনোরম রাত্রিতে গোপীজন কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া রাসারম্ভরসে সমুৎসুক হইলেন।" হরিবংশে এই রাসলীলার বর্ণনা অন্যবিধ। "কৃষ্ণ রাত্রে

চন্দ্রমার নবযৌবন বিকাশ দেখিয়া এবং রম্যা শারদীয়া নিশা দেখিয়া ক্রীড়াভিলাষী হইলেন। কালজ্ঞ কৃষ্ণ আপনার কিশোর বয়সের সম্মানার্থ যুবতী গোপ কন্যাগণের জন্য কাল নির্ণীত করিষা রাত্রে তাঁহাদিগের সহিত আনন্দানুভব করিলেন।" বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত রাস শব্দের পবিবর্ত্তে হরিবংশে হল্লীষ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। হেমচন্দ্রাভিধান এবং তারানাথ বাচস্পত্যের উল্লেখ করিয়া সুপণ্ডিত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়া দিয়াছেন যে 'হল্লীষ' এবং 'রাস' একই কথা—নৃত্য বিশেষ। রাসের অর্থ কি তাহা শ্রীধর স্বামীও বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন স্ত্রী পুরুষে পরস্পরের হাত ধরিয়া গাইতে গাইতে মণ্ডলীরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যে নৃত্য করে তাহার নাম রাস। সুবালকের অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ব্রজলীলা সম্পন্ন হয়, ইহা স্মরণ করিলেই স্বামীকৃত রাসের এই অর্থ সমীচীন বোধ হয়। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে গ্রাম্য বালক বালিকারা অদ্যাবধি এইরূপ ক্রীড়া বা নৃত্য করিয়া সময় সময় আনন্দে কাল কাটাইয়া থাকে।

লীলাএবং খেলা একই কথা। তবে লীলা ভগবান সম্বন্ধে এবং খেলা মানুষ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহা স্বরূপতঃ মিথ্যা জানিয়াও নিজানন্দ প্রেরিত পুরুষের দ্বারা ক্ষণিক সত্যতার অভিনয়ে অনুষ্ঠিত হয় তাহারই নাম খেলা। ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ অঘটন-ঘটন পটীয়সী আপনার মায়া কুহকে জড়িত হইয়া গোপবালা বেষ্টিত আপনাকে সামান্য গোপবালক বোধে তাহাদের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন। ভগবানের শক্তি সম্প্রসারণের নামই তাঁহার লীলা। ইহাই তাঁহার সংসার নাট্যাভিনয়। ইহাই তাঁহার ব্রহ্মানন্দ মহাসাগরের নিত্য উত্তালতরঙ্গমালা।

অনেক আর্য্য শাস্ত্রই দ্ব্যর্থবোধক এবং রূপক রঞ্জিত। পুরঞ্জনোপাখ্যান রূপকের আধার ভাগবত পুরাণে রাসোপাখ্যাসের রূপকাবৃত অতি অপূর্ব্ব বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ভাগবতের ২৯ ও ৩০শ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছেঃ—"যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" ভগবান্ যোগমায়া আশ্রয় পূর্ব্বক স্ত্রীরত্ন সকলে বেষ্টিত হইয়া রাসলীলা আরম্ভ করিলেন। টীকাকারগণ এই যোগমায়াকে ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির (আনন্দ-শক্তির) বিলাস লালসা প্রেরিত ক্রিয়া শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান আনন্দ স্বরূপ

এবং পূর্ণানন্দময়। তিনি অন্যকে সেই আনন্দাংশ বিতরণেচ্ছা প্রেরিত হইয়া স্বীয় মায়িক শক্তি অর্থাৎ যোগমায়ার আশ্রয়ে রাসলীলারম্ভ করেন অর্থাৎ আপনি আনন্দভোগ করিতে এবং অন্যকে অর্থাৎ গোপিকাগণকে আনন্দ বিতরণ করিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপিকা বিরচিত রাসমণ্ডলের মধ্যে অধিষ্ঠিত। সুধু তাই নয়, দুই দুই গোপিকার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদের কণ্ঠ ধারণ করিয়া যেন প্রত্যেকেরি নিকট পৃথক ভাবে অবস্থিত। রাসাধ্যায়ে রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান এইরূপ বর্ণিত। ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এবং বাহিরে থাকিয়া সকলকেই ধারণ করিয়া আছেন। মানুষ মাত্রের এই জ্ঞান যে সে একটি পৃথক আত্মায় রমণ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যে রাখিয়া গোপিকাগণ রাসমণ্ডলে বিঘূর্ণিতা। ভগবানের মায়ায় জীব সকলও সংসারচক্রে সেইরূপ ঘূর্ণায়মান। যেমন রাসচক্রে বিঘূর্ণিত উভয় শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপিকাগণ পরমানন্দ রসপানে বিমোহিত, তদ্রূপ সংসার নাট্য-ক্ষেত্রে অনাসক্ত-চিত্ত ভগবান কথঞ্চিৎ উদ্বেলিত এবং ভবসংসারকে আন্দোলিত করিয়া নিজে আনন্দানুভব করেন এবং জীবগণকে আনন্দ ভুঞ্জাইয়া থাকেন। আর ব্রজের রাসলীলা যেরূপ নিত্য, সংসারও তদ্রূপ আদ্যন্ত বিরহিত। শ্যামসুন্দরের বংশীধ্বনি ব্রজ গোপীদের কর্ণে চিরশব্দিত এবং তাহারা চিরনৃত্যশীলা। ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী শূন্যাকাশে "ঈশ্বরস্য বাচকঃ প্রণবঃ" চিরধ্বনিত এবং প্রাণীবৃন্দ চিরস্পন্দনযুক্ত এবং ক্রীড়াবিশিষ্ট। ভগবানের ব্রজের রাসলীলা স্রোতঃ এবং সংসারপ্রবাহ চিরপ্রবাহিত।

ভাগবতকারের কবিত্বের গভীরতার এবং তাহার চমৎকারিত্বের পরিসীমা নাই। ভগবানকে পাইবার জন্য পার্থিব সমস্ত পরিহার করিতে হয়। তাই কবি কহিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দোদ্দীপক গীত শ্রবণ করিয়া রামলোচনারা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কবি বলিয়াছেনঃ—কোন গোপী দুগ্ধ দোহন করিতেছিলেন; কেহ শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছিলেন; কেহ ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন; কেহ গোধূমকণা পক্ক করিতেছিলেন; ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শ্যামসুন্দরের বেণুরব শুনিবা মাত্র সেই সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগে পিতা, পতি, ভ্রাতা এবং বন্ধুগণের নিবারণ না শুনিয়া গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের সন্নিহিত

হইলেন। অহং বুদ্ধি দোষেই মানুষ ঈশ্বর দর্শনলাভে বঞ্চিত হয়। কবি আবার কহিয়াছেনঃ—ব্রজেন্দ্রকুমার ব্রজসুন্দরীদিগের বহুবিধ সম্মান এবং আদর করিলেন। ইহাতে তাহারা মানিনী হইযা উঠিল এবং আপনাদিগকে যাবতীয় স্ত্রীর শ্রেষ্ঠ মনে করিতে লাগিল। রমণীগণের সৌভাগ্য-গর্ব্ব ও অভিমান দেখিয়া অচ্যুত অন্তর্হিত হইলেন।

পরম প্রেমিক প্রেমগুরু ও প্রেমসেবক চৈতন্যদেব রাসলীলা সম্বন্ধে নীরব থাকেন নাই। প্রিয় শিষ্য বংশীবদনকে অতি যত্ন সহকারে তাহা বুঝাইয়াছিলেন। শচীনন্দনের রাস বিষয়ক ভাব সমূহ প্রেমদাস ভাষায় পয়ারে নিবদ্ধ করিয়াছেন। পবিত্র রাস-রসসিক্ত শ্রীগৌরাঙ্গের কথাগুলি এই স্থানে গৃহীত হইল। বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ বলিয়াছেনঃ—সর্ব্ব-আত্মারাম কৃষ্ণ ত্রিভুবনের এবং অপ্রাকৃত পতি। নিত্য বৃন্দাবন মন্মথ বিলাস শূন্য এবং প্রেমলীলা পরিপূর্ণ। গোপী সকল প্রাকৃতিক সতীত্ব পরিত্যাগে অনন্য ভাবে নিরন্তর কৃষ্ণ ভজনা করেন। তাঁহারা নিজ সুখ বাঞ্ছা করেন না, কেবল কান্তসুখ প্রার্থিত। গোপীগণ কামগন্ধহীনা, কৃষ্ণ সুখ মাত্রে সুখী এবং প্রেমস্বরূপ কৃষ্ণ সেবা মাত্রে প্রবীণা। এই জন্য সামর্থা পাত্রীদের মধ্যে গোপীরা অতীব গণনীয়া।

শ্রীদীননাথ ধর।

প্রণয়।

প্রকৃতি বাজ্যের একটী দৃশ্যে মন এত মুগ্ধ হয় কেন? আকাশে চাঁদ হাসিতেছে, তারাদল তাহাকে পরিবৃত করিয়া মুগ্ধভাবে তাকাইয়া রহিয়াছে। নিম্নে স্রোতস্বিনী সে ছবি বুকে করিয়া আনন্দে ভাসিয়া যাইতেছে! নলিনী দূর দূরান্তরে থাকিয়াও ক্ষোভ অভিমান সব ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া উন্নমনে চাহিয়া রহিয়াছে, মধুকর আসিয়া কত ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তাহার তৎপ্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য নাই। বিজন প্রদেশে ফুলটী ফুটিয়া আছে, মনে হয় তাহার দুঃখের অবধি নাই, কিন্তু সে যে উল্লাসময়ী—ঐ সমীর ধীরে ধীরে আসিয়া তাহাকে লইয়া কত কৌতুকই করিতেছে। কোমল লতিকা কেমন একান্তমনে ঐ তরুবরকে

আশ্রয় করিয়া শোভা পাইতেছে। ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর উভয় তীরে বসিয়া ঐ দুইটী পাখী কেন এত কাতর প্রাণে পরস্পরকে ডাকিতেছে, রজনী অবসান হইতে চলিল তথাপি সে কাতরতার বিরাম নাই।

জগতের অনন্ত ব্যাপারের মধ্যে ঐ কয়েকটী দৃশ্য আমার প্রাণকে এত পরিতৃপ্ত করে কেন? উহা দেখিয়া আমি সময়ে সময়ে আকুল হই, অথচ না দেখিয়া থাকিতে পারি না কেন? কি এক স্রোত এ হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার বিরাম নাই। কি এক বায়ু বহিতেছে, তাহার কখনও নিবৃত্তি হইল না। মহাসাগরের তরঙ্গের ন্যায় উহা কখনও প্রশমিত হইল না। হৃদয়তন্ত্রী সেই যে বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহা সেই একই ভাবে অবিরত বাজিতেছে, কখনও থামিল না!

এ আবেগের কারণ কি? এ চঞ্চলা তরঙ্গিনীর উৎপত্তি স্থান কোথায়? কোন্ নিভৃত প্রদেশ হইতে এ সমীর আসিয়া হৃদয়কে এত আন্দোলিত করিতেছে? আমার শরীরের শোণিতপ্রবাহের ন্যায় এ ভাব প্রতিনিয়ত বহিতেছে, রোধ করিবার শক্তি আমার নাই। জানি যে এ ভাব আসিয়া মনকে আকুল করে, আবার ইহাও জানি যে এ মধুময় ভাব ভুলিয়া নীরস ভাবে জীবন লইয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি পতঙ্গ জানি যে ঐ অনলে পড়িলে দগ্ধ হইয়া যাইব, অথচ উহাতে পড়িবার জন্য প্রাণ যারপর নাই অস্থির হইয়াছে।

যখন বালক ছিলাম, সকল বস্তুতেই কেমন পরিতৃপ্ত থাকিতাম। একটী পুতুল পাইলে আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। পুতুলের নিকট কিছুই প্রত্যাশা করিতাম না, সে একটী কথাও কহিত না, অথচ আমার আনন্দ ধরিত না। একটী ফুল দেখিলে কত উৎফুল্ল হইতাম। আকাশে চাঁদ দেখিয়া তাহার হাসির সহিত হাসি মিশাইয়া আত্মহারা হইতাম। এখন সে সব দেখিয়া মন কাতর হইয়া পড়ে, ভাবি উহারা আমার হৃদয় ছাড়িয়া বাহিরে এতদূর চলিয়া গেল কেন? এখন যাহাতে আকৃষ্ট হই তাহাই হৃদয়ের অন্তস্তলে লুকাইয়া রাখিতে বাসনা হয়। সে সাধ পূর্ণ হয় না তাই কি মন এত কাতর হইয়া পড়িতেছে?

আমি পথিক, ভাবিয়াছিলাম এ বিশাল রাজ্যের অধিবাসী হইয়া কেন এক স্থানে আবদ্ধ থাকিব, কেন সংসারের দুই একটী ক্ষুদ্র জীব লইয়া

চিরদিন অতিবাহিত করিব? আমার গৃহ বা পরিজনের প্রয়োজন কি? এই বিশ্বসংসার আমার গৃহ, এই লোকজগৎ আমার পরিজন। এক দিন এই উদার ভাব লইয়া কত উৎসাহে বাহির হইয়াছিলাম। হায় আজ সে আমার এ দুর্দ্দশা হইবে তাহা কে জানিত? আমার হৃদয় যেন কি চায়, কি একটা প্রধান অভাব রহিয়া গিয়াছে, তাহার পরিপূরণ না হইলে এ হৃদয়ের আবেগ প্রশমিত হইবে না।

কান্তাবিরহে কাতর যক্ষের কথা একদিন প্রলাপবচন বলিয়া মনে হইত। আজ তাহার হৃদয়ের কথা বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হইতেছে। মনে হয় বিধাতা আমাকে কেন যক্ষ করিলেন না? তাহা হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুখী হইতাম—হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিয়া সুস্থির হইতাম। অতীত জীবনের সুখস্বপ্নে ডুবিয়া রহিতাম এবং আশার সুরম্য রথে আরোহণ করিয়া প্রণয়িনীর সন্নিধানে সমাগত হইতাম। এ জীবনে সে সৌভাগ্য ঘটে নাই, তাই কি মন এত উদাস হইয়া পড়িতেছে?

শুনিয়াছিলাম সৌন্দর্য্যে না কি মন বড়ই আকৃষ্ট হয়। প্রকৃত কথা—আমি সুন্দর বস্তু দেখিতে বড় ভালবাসি। জগতের সৌন্দর্য্যভাণ্ডার আমার সম্মুখে আনিয়া দেও, দেখিয়া দেখিয়া আমি আবিষ্ট হইয়া যাই। স্বর্গের নন্দন কানন কেন এ ধরাতলে বিভাসিত হইল না? তথাপি এই জগতে যে সৌন্দর্য্য সমাকীর্ণ রহিয়াছে, তাহা কি আমার পক্ষে যথেষ্ট নহে? কালিদাসের তপোবন—এই পৃথিবীর তপোবন, একবার সেই স্থানে প্রবেশ কর। কি সুন্দর শোভা, ইহা কি নয়নের পক্ষে যথেষ্ট নহে? প্রকৃতি যে এমন ভুবনমোহন বেশে অবতীর্ণা, কৈ তাহা ত দুষ্মন্তের মনকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না? সেই তপোবনের কোমললতিকা যে এত ফুলদামে সুশোভিতা তথাপি ত তাঁহার মনকে অধিকার করিতে পারিল না। তবে পারিল কে? পারিল সেই অনিন্দ্যরূপিণী ভুবনমোহিনী শকুন্তলা। সে রূপমাধুরীদর্শনে দুষ্মন্ত বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, সর্ব্বত্রই শকুন্তলাময় দেখিতে লাগিলেন। চরাচর বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া দুষ্মন্ত তাহাই হৃদয়ের সার সর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিলেন। প্রীতিধারা সর্ব্বত্র উৎসারিত হইয়া পড়িল। কি এক রসাঞ্জনে তাঁহার নয়নযুগল অনুরঞ্জিত হইল, তিনি যাহা দেখিতেছেন তাহাই সুন্দর, যাহা ভাবিতেছেন তাহাই

মধুর, যাহা করিতেছেন তাহাই তৃপ্তিকর। তিনি বুঝিলেন কেন মনে আবেগ হয় এবং কিসেই বা তাহা প্রশমিত হয়।

যদি আর একটী দৃশ্য দেখিতে চাও তবে একবার হিমাচলের প্রত্যন্ত প্রদেশে গমন কর। দেখ সম্মুখে অচ্ছোদ সরোবর রমণীয় শোভায় শোভমান। অদূরে কিন্নরীকণ্ঠবিনিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীতে সে প্রদেশ ভাসমান। তাপসকুমার পুণ্ডরীক পারিজাত কুসুমমঞ্জরী কর্ণে পরিয়া সেই সরোবরে অবগাহন করিতে আসিতেছেন। সৌরভে সে স্থান আমোদিত। এ কি? তাপসমন চঞ্চল হইল কেন? কাহার রূপমাধুরী দর্শনে আজ পুণ্ডরীক প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। মহাশ্বেতা আজ তাঁহার প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে। তিনি প্রমত্ত পতঙ্গের ন্যায় সেই সৌন্দর্য্যালোকের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। করতলস্থিত অক্ষমালা যে কোথায় গেল তাহার স্থিরতা নাই, এমন যে সুধাময় সঙ্গীত বহিয়া যাইতেছে, তাহা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে না, এমন যে অতুলনীয় শোভা বিরাজিত রহিয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য নাই, আজ তাঁহার চিত্ত মহাশ্বেতাময়, তিনি সর্ব্বত্র সেই একইরূপ অবলোকন করিতেছেন। তিনি জানিলেন কেন মন এত চঞ্চল হয় এবং কিসেই বা সে ভাব তিরোহিত হয়?

সৌন্দর্য্যের যেরূপ আকর্ষণ, গুণেরও তদনুরূপ অথবা তদপেক্ষা অধিক আকর্ষণ আছে। যাহার গুণে আকৃষ্ট হই, তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে সৌন্দর্য্য না থাকিলেও কেমন সুন্দর দেখায়। গুণের আভা সে মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিয়া দেয়। এই জন্য গুণবোধ হইলে মনে যে তৃপ্তি জন্মে তাহাই প্রকৃত অনুরাগের পক্ষে যথেষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য শোভাময়ী ডেজ্‌ডোমিনা কাফ্রী ওথেলোকে পতিত্বে বরণ করিয়া তদীয় চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। অপর রমণী ওথেলোকে যেরূপ কুৎসিৎ দেখিতেন ডেজ্‌ডোমিনার পক্ষে সেরূপ কুৎসিৎ দেখা অসম্ভব। তিনি তদীয় গুণে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে ওথেলোর সেই রূপই তাঁহার নয়নের অপার তৃপ্তি সাধন করিত। তিনি বুঝিয়াছিলেন কেন মনে এত আবেগ হয় এবং কিসেই বা সে আবেগ প্রশমিত হয়?

দুষ্মন্ত ও পুণ্ডরীকের মনে যে চঞ্চলতা ও আবেগ উঠিয়াছিল, তাহা

প্রথমতঃ সৌন্দর্য্যদর্শনে উদিত হইয়া পরিশেষে লালসাকর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়াছিল। নয়ন দেখিয়া যাহাতে মুগ্ধ হইল, হৃদয় তাহাকে ধারণ করিতে চাহিল। তোমাকে আমার হইতে হইবে ও আমাকে তোমার করিতে হইবে, তোমার প্রাণের কথা আমাকে কহিতে হইবে ও আমার প্রাণের কথা তোমাকে শুনিতে হইবে, আমরা দুইজনে অভিন্নহৃদয় হইয়া একত্রে থাকিব, বিচ্ছেদ কোন মতে হইতে দিব না, এই ভাব তখন প্রবল হইয়া উঠিল। সমুদয় ইন্দ্রিয় আনন্দে অধীর হইয়া ভাবিল এতদিন যাহা পাই নাই, আজ তাহা পাইয়াছি, এতদিন যে রত্ন চিনি নাই, আজ তাহা চিনিয়াছি। যখন এই ভাব প্রগাঢ় হইয়া উঠিল, তখন দুষ্মন্ত ও পুণ্ডরীক বুঝিলেন যে প্রণয় হৃদয়ের একটী অতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। প্রণয় ভিন্ন প্রকৃত সুখ হইতে পারে না। প্রণয়ীজন পাইলে স্বর্গ ও পৃথিবীতে কোন প্রভেদ থাকে না। এই যে মনে এত আবেগ ছিল, সুখ শান্তি কিছু মাত্র ছিল না, তাহার কারণ এতদিন প্রকৃত প্রণয়ীজন পাই নাই; আজ এই প্রণয়সঞ্চারে হৃদয় উল্লাসতরঙ্গে উদ্বেলিত হইতেছে। তাঁহারা বুঝিলেন মন কি চায় এবং কি পাইলে পরিতৃপ্ত হয়।

এই পরিতৃপ্তি, আনন্দ ও উল্লাসের ভাবই প্রকৃত অনুরাগ। এই অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়া স্থায়ী হইলেই সুমধুর ও পবিত্র প্রণয়ে পরিণত হয়। যে অনুরাগ ক্ষণিক বিদ্যুতের ন্যায় বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা প্রণয় নহে। যদি দুষ্মন্ত অভিজ্ঞানাঙ্গুরীয়ক দর্শনে শকুন্তলার বিষয় পূর্ব্বাপর অভিজ্ঞাত হইয়া আকুলভাবে অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত না হইতেন, অথবা শকুন্তলা দুষ্মন্তের রাজধানী গমনের পর, তাঁহার সহিত নিজের বিবাহের কথা প্রকাশ না করিয়া তপোবনেই বাস করিতেন, তবে তাঁহাদের সে ক্ষণিক অনুরাগের কথা জগতে কদাপি প্রচারিত হইয়া মহাকবির কল্পনার প্রভাবে এতদূর সমুজ্জ্বল হইত না। লালসার নীচভূমি অতিক্রম করিয়া পবিত্র স্থায়ীভাব ধারণ করায় সে প্রণয় এত সুমধুর হইয়াছে। স্বামিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও অপমানিত হইয়াও শকুন্তলা তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই, পিত্রালয়ে ফিরিয়া না যাইয়া স্বামিসম্মিলনের আশা হৃদয়ে পরিপোষণ করত শুদ্ধচারিণী হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই জন্য তাঁহাদের প্রণয় এত পবিত্র হইয়াছে। যদি

পুণ্ডরীকের তিরোভাবের পর মহাশ্বেতা সে শোক বিস্মৃত হইয়া পিতৃগৃহে আসিয়া বসবাস করিতেন, তবে তাঁহার সে লালসামিশ্রিত ঘৃণিত প্রণয়ের কথা শুনিয়া জগৎ এতদূর বিমোহিত হইত না। কিন্তু ঐ দেখ—অচ্ছোদ সরোবরের লতাপত্রমণ্ডিত তটে বসিয়া যোগনিরতা মহাশ্বেতা প্রণয়সঙ্গীতে বনস্থলীকে শোকে ভাসাইয়া যে সুতান ধরিয়াছেন, তাহাতে পরলোকগত পুণ্ডরীক আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় দয়িতার সন্নিধানে উপগত হইয়াছেন। মহাশ্বেতা প্রণয়যোগে সিদ্ধ হইয়া পুনরায় স্বামিসহবাসে সিদ্ধকাম হইয়াছেন। যদি ওথেলোর দুর্ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া ডেজ্‌ডোমিনা কখনও স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেন অথবা কখনও ক্ষণকালের জন্য এরূপ মনে করিতেন যে তাঁহাকে বিবাহ করিয়া তিনি বুদ্ধির পরিচয় দেন নাই, তবে তাঁহার প্রণয় পাশ্চাত্য মহাকবির লেখনীতে সমুজ্জ্বল হইয়া জগতে এতদূর প্রচারিত হইত না।

এই সকল বিবরণ পড়িয়া নিজের মানসিক আবেগের কারণ বুঝিতে পারিয়াছি। মন যে কি চায়, কি পাইলে পরিতৃপ্ত হয় তাহা বুঝিয়াছি। আমি পথিক হইয়া শূন্য হৃদয় লইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছি, অনুরাগের কোন পাত্র জগতে নাই, তাই মনের ব্যাকুলতা অপনীত হইতেছে না। আমি তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছি, শান্তির আশ্রয় পাইতেছি না। সংসার আশ্রম যে প্রণয়ের তপোবন, তাহা আগে জানিতাম না তাই আমার এই দুর্দ্দশা। প্রণয়ে সিদ্ধ হইতে পারিলে যে মনুষ্যত্ব দেবত্বে পরিণত হয়, তাহা জানিতাম না তাই এতদিন অন্ধকারে ঘুরিতেছিলাম। মনে করিতাম পার্থিব প্রণয়ে মানুষকে আসক্তির অন্ধতম কূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, নিস্তারের আর সম্ভাবনা থাকে না। এখন সেই পার্থিব প্রণয়ের জন্য মন ব্যাকুল। স্বর্গ রাজ্য হইতে যে প্রেমমন্দাকিনী বহিতেছে, তাহারই এক শাখানদী প্রণয়রূপে জগতের নরনারীর হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে, সেই প্রণয়নদীতে যখন উজান বহিতে থাকে, তখন তাহাতে ভাসমান হইয়া কত সৌভাগ্যবান ব্যক্তি স্বর্গের অপূর্ব্ব মুক্তিঘাটে যাইয়া উপনীত হয়েন। এ সন্ধান আগে জানিতাম না, প্রণয় মাহাত্ম্য বুঝিতাম না, তাই নিরাশ্রয় পথিক হইয়া সংসারের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

প্রণয়ের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহার অন্তর্নিহিত দুইটী মহাভাবের সমাবেশ আছে। তুমিই আমার, ও আমিই তোমার, এই দুইটী ভাব প্রণয়ের ভিত্তিস্বরূপ। এই ভাব যত গাঢ়তর হইয়া স্থায়ী হয়, ততই প্রণয়ের মহিমা বিকসিত হইতে থাকে। সীতা, সতী, সাবিত্রী, দময়ন্তী ইহাঁদের প্রণয়ে এই দুইটী ভাবের সম্যক্ বিকাশ হইয়াছিল, এই জন্য তাঁহারা জগতে আদর্শসতী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

এই প্রণয়ের সূত্রপাত হইতে বিবাহ প্রণালী জগতে প্রচলিত হইয়াছে। প্রণয় সম্ভবপর, এই জন্য বিবাহ সম্ভবপর। যতদিন প্রণয় সুখের মূল বলিয়া লোকে বুঝিবে, ততদিন বিবাহ প্রথা সমাজে অমৃত ও শান্তিস্রোত প্রবাহিত করিবে। বিবাহ প্রণয়ের বন্ধন। যাহার সে বন্ধনে প্রবৃত্তি বা সাহস হয় না, তাহার প্রকৃত প্রস্তাবে প্রণয় হয় নাই। বিবাহ ভিন্ন স্ত্রী পুরুষের সম্পূর্ণ মিলন সম্ভবপর নহে। যে মিলনে শঙ্কা বা অনিচ্ছা, সে মিলন মিলনই নহে। যে মিলন বা প্রণয় লোকে জানিলে আমার শঙ্কা বা অপমান বোধ হয়, সে স্থানে প্রণয়ের উপর শঙ্কা আধিপত্য বিস্তার করে, সুতরাং প্রকৃত প্রণয় হইতে পারে না। প্রকৃত প্রণয়ে পবিত্রতা, মনের বিকারশূন্যতা। কর্ত্তব্য জ্ঞান উহাকে সুদৃঢ় করিয়া তুলে। আত্মজ্ঞানহারা হইয়া যখন প্রণয়ীজন "তুমি আমার, আমি তোমার" এই ভাবে বিভোর হইয়া উঠে, তখনই প্রণয়ের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইতে থাকে। প্রণয়ীযুগলের মনে এই ভাব স্থায়ীরূপে প্রবল হইয়া উঠিলে, প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়।

মনের ক্ষণিক উচ্ছ্বাস বা বিদ্যুদ্বিকাশ প্রণয় নহে। সৌন্দর্য্যে বা গুণের মোহে বা লালসার উত্তেজনায় অনুরাগ প্রকাশ করা প্রকৃত প্রণয় নহে। সে মোহ বা উত্তেজনার কারণ না থাকিলেও কিম্বা সে কারণকে প্রচ্ছন্ন করিয়া যখন অনুরাগের জ্যোতির বিকাশ হইতে থাকে, তখনই তাহা প্রণয় নামে সমাদৃত হইয়া থাকে। কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্নেহ বা যত্ন প্রকাশ অথবা দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া কৃপার পাত্রী মনে করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন প্রকৃত প্রণয়ের পরিচায়ক নহে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা আশঙ্কাহেতু বাধ্য হইয়া স্নেহাদর প্রকাশকে প্রণয় বলে না। প্রকৃত প্রণয়ে শ্রদ্ধা, প্রীতি,

পবিত্রতা ও একাগ্রতা। প্রণয়ে মানুষ আত্মহারা হইয়া যায়। প্রণয়স্রোতে নামিয়া কেহ বলিতে পারেন না—আমি ভাসিব না, আমি বিবেচনা পূর্ব্বক ইচ্ছাপূর্ব্বক ইপ্সিত স্থানে যাইব, ইচ্ছা হয় ফিরিয়া আসিব। যিনিই নামিবেন, তাঁহাকেই ভাসিতে এবং অবশেষে ডুবিতে হইবে। প্রণয় কবিত্ব, প্রণয় ভক্তি। প্রণয়ে চিত্তবৃত্তির সম্যক বিকাশ হইয়া থাকে, অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হয় এবং চরিত্রের মধুরতা সংবর্দ্ধিত হয়। প্রণয় স্বর্গাধিরোহণের পুষ্পরথ। সেই পুষ্পরথে আরোহণ করিয়া প্রণয়ীযুগল দেবলোকের অধিবাসী হইয়া ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া চিরানন্দে মগ্ন হয়েন। জগতের বিষাদমেঘ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা চন্দ্রলোকে বিচরণ করিতে থাকেন। বিকটনিনাদ অশনিসম্পাত তাঁহাদের কর্ণে সুধাবর্ষণ করে। ভীষণ মরুভূমির প্রতপ্ত বালুকা লইয়া তাঁহারা আনন্দে ক্রীড়া করিতে থাকেন। পরস্পরকে দেখিলেই তাঁহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিত হইয়া যায়। তাঁহারা বিষপান করিলে তাহা অমৃত হইয়া যায়। তাঁহারা কখন চকোর চকোরী হইয়া চাঁদের সুধাপান করেন, চাতক চাতকী হইয়া উল্লাসমনে মেঘের কোলে উড়িয়া যান, কপোত কপোতী হইয়া নয়নে নয়নে চাহিয়া থাকেন। তাঁহারা কখনও স্থলে, কখনও জলে কখনও বা অনন্ত আকাশে বিচরণ করিতে থাকেন। তাঁহাদের গতি অবিরাম, ইচ্ছা অপার, শক্তি অনন্ত। তাঁহাদের. হৃদয় সুখের উৎস, শান্তির প্রবাহ ও পবিত্রতার প্রস্রবণ। তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে নররূপী দেবতা।

প্রণয়সাধনা ভিন্ন মানবের নিস্তার নাই। এ জগতে আসিয়া সকলের ভাগ্যে সে সাধনা ঘটিয়া উঠে না। সে সুযোগ সে অপূর্ব্ব মিলন অতীব বিরল। তথাপি নিরাশ হইবার কারণ নাই। যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে আছে তদনুসারে সাধনা করিলে অনায়াসে সিদ্ধকাম হইতে পারা যায়। প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা আমরা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণে সম্যক্ দেখিতে পাই। জ্ঞানযোগে জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে প্রণয় ও মিলন তাহাই হরগৌরীরূপ, ভক্তিযোগে তাঁহাদের যে সংযোগ তাহাই রাধাকৃষ্ণরূপ, ইহাই প্রণয়ের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। জ্ঞানরূপ শ্রীফল বৃক্ষতলে হরপার্ব্বতী উপবিষ্ট। উভয়ের মধ্যে কত জ্ঞানচর্চ্চাই হইতেছে। উজ্জ্বল জ্ঞানের সহিত প্রীতি মিশিয়া গিয়াছে। মর্ত্তজগতে এ যোগ সম্ভবপর নয় বলিয়া,

স্বর্গের উন্নত ভূমিতে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে। দূরে কৈলাস পর্ব্বতে এ যোগের সমাবেশ হইয়াছে। যাঁহারা এই যোগপথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা নিম্নে হিমাচলগহ্বরে যোগমগ্ন রহিয়াছেন। সকলই নীরব, শান্তিময়। জ্ঞানের অনন্ত আলোকে সে প্রদেশ বিভাসিত।

এ দিকে বৃন্দাবনে প্রেমের অপূর্ব্ব লীলার অভিনয় হইতেছে। যাঁহারা সংসারে থাকিয়া প্রণয় শিখিতে সুযোগ পান নাই, তাঁহারা দলে দলে আসিয়া এই অভিনয় দেখিয়া প্রেমমাহাত্ম্য অনুধাবন করিয়া ধন্য হইতেছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় অপেক্ষা উন্নত প্রণয় কল্পিত হইতে পারে না, সেই প্রণয়-স্রোতে যিনি ভাসিয়াছেন তাঁহার আর ভাবনা কি? সেই অভিনয় ব্যাপার ক্রমে ভারতবাসী ভুলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে গৌরাঙ্গদেব আসিয়া প্রেমের অপূর্ব্ব অভিনয় করিলেন। সে অভিনয় বঙ্গবাসী কখনও ভুলিবে না এবং ভুলিতে পারিবে না। যে অভিনয়ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া জগাই মাধাই উদ্ধার হইয়াছে, সে প্রেমাভিনয় সাধন করিলে জগতের কাহাকেও নিরাশ হইতে হইবে না। আমি অভাগা পথিক, আমার উহা ভিন্ন অ র গতি নাই। এ চঞ্চল হৃদয়ের ব্যাকুলতা বিদূরিত করিবার অন্য উপায় নাই। এ হৃদয়-বৃন্দাবনে যে দিন রাধাকৃষ্ণের আবির্ভাব হইবে, সেই দিন আমি প্রণয়মাহাত্ম্য বুঝিয়া ভবযন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইব। আমার ভাগ্যে কি সে দিন আসিবে?

পথিক।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা। শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ প্রণীত। মূল্য চারি আনা মাত্র। ২১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইলাম। গত মাঘ মাসে প্রয়াগধামে ত্রিবেণীক্ষেত্রে কুম্ভমেলায় যে মহাধিবেশন হইয়াছিল, তাহাই লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং মেলার পবিত্রক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ও হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন তাহাই অতি দক্ষতার সহিত এই পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন।

তিনি শুদ্ধ বাহিরের বর্ণনায় পুস্তকখানি পূর্ণ করেন নাই। সৎশিষ্যের ন্যায় তিনি সমবেত মহাপুরুষদিগের আভ্যন্তরিক পবিত্র দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাই চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সাধু মহাত্মাদের ভক্তি, উদারতা, সরলতা ও নির্ভরের ভাব অতি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন সাধুরা অলসভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়া সংসারের গলগ্রহ হইয়া পড়েন, লোকের দুঃখ বা অভাবে তাঁহাদের প্রাণ কাঁদে না, বিশ্বসংসার ডুবিয়া গেলেও তাঁহারা ক্ষতিবৃদ্ধি মনে না করিয়া উদাসীনভাবে নিজের ভাবেই মগ্ন থাকেন, তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। আবার যাঁহারা মনে করেন সাধুরা জগতের ব্যাপার অতি অল্পই জানেন, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে একতা নাই, তাঁহারা কাহারও সহিত মিশিতে জানেন না, কাহারও প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করিতে জানেন না, শৃঙ্খলাপূর্ব্বক কোন ব্যাপার সাধন করিতে অপারগ, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন। সাধুদের বাহিরের দৃশ্যে কিছুই নয়নতৃপ্তিকর না থাকিতে পারে, বাহিরে তাঁহাদিগকে উন্মাদ গ্রস্ত বা তন্দ্রাবৃত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের অন্তরাজ্যের যে অতুল শোভা তাহা যিনি পুণ্যফলে অনুধাবন করিয়াছেন তিনি চিরদিনের তরে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। মনোরঞ্জন বাবু সেই শোভায় আকৃষ্ট হইয়া ভক্তির উচ্ছ্বাসে এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন তাই ইহা এত সুন্দর হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহা বেশ বলা যাইতে পারে যে এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে "ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা" এই কথার মাহাত্ম্য অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়।

২। দিশে পাগলা। শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। মূল্য ॥৵০ আনা। এই পুস্তকখানিতে হিন্দুধর্ম্মের অনেক সার কথা বিবৃত হইয়াছে। দিশে ও নিশে নামে প্রবৃত্তিসমাজে পাগল বলিয়া পরিচিত দুই ব্যক্তির কথোপকথনচ্ছলে গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মের নানা কথার অবতারণা করিয়া তাহার সদুত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি হিন্দুধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি মাত্রের নিকট বিশেষ সমাদৃত হইবে। ইহাতে অনেক সারগর্ভ উপদেশ আছে।

পূর্ণিমার মূল্য প্রাপ্তি

সন ১৩০০ সাল।

বাবু গঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যশোহর।
,, নবিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কেওটা।
,, পান্নালাল মল্লিক, পিপুলপাতি।
,, শিবকৃষ্ণ রায চৌধুরী, হুগলী।
,, যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাণাঘাট।
,, রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, খুলনা।
,, কেদারনাথ বিশ্বাস, হুগলী।
,, কেদারনাথ ঘোষ, ঐ
,, রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঐ
,, কৈলাসচন্দ্র দাস, কোড়লা।
,, বলরাম দত্ত, হুগলী।
,, গোবিন্দচন্দ্র মালাকর, ঐ
,, বামাচরণ বসু, ঐ

বাবু তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়, খুলনা।
,, আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, খুলনা।
সেখ ফ্রাক হোসেন হুগলী।
বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়, বর্দ্ধমান।
,, অখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।
,, শ্যামাচরণ ঘোষ, মতিহারী।
,, ভবানীচরণ দত্ত, খুলনা।
,, হরিহর লাহিড়ী, হুগলী।
,, পদ্মলোচন মল্লিক, ঘুঁটিয়াবাজার।
,, হরিদাস নন্দী, ঐ
,, যুগলকিশোর ধাড়া, হুগলী।
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঐ
,, মনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মোগুলাই।

ক্রমশঃ।

সন ১৩০১ সাল।

বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়, বর্দ্ধমান।
,, শ্যামাচরণ ঘোষ, মতিহারী।
,, ভবানীচরণ দত্ত, খুলনা।
,, মনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মগুলাই।
,, নকুড়চন্দ্র সরকার, হুগলী।

বাবু তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়, খুলনা।
,, অখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।
,, আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, খুলনা।

ক্রমশঃ।

সীতাচরিত

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল প্রণীত।

মূল্য ৷৷০ আনা

ডাকমাশুল——৵০

১৮৯৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে পাঠ্য পুস্তকের তালিকা বাহির হইয়াছে তাহাতে এই পুস্তক মধ্যবৃত্ত বালিকা বিদ্যালয় সমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সংবাদ পত্র সমূহ কর্ত্তৃক বিশেষ প্রশংসিত।

অতি সরল ও পরিশুদ্ধ ভাষায় এই অপূর্ব্ব জীবন ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে স্থানে স্থানে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। পুস্তক খানি স্কুলের তালিকাভুক্ত হওয়ার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষে এ পুস্তকের ন্যায় পাঠ্য পুস্তক বাঙ্গালায় বিরল।

নব্যভারত।

এরূপ পুস্তক আমাদের দেশে অতীব বিরল।——সোমপ্রকাশ।

এই পুস্তক হুগলীতে গ্রন্থকারের নিকট ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন।

হুগলীর চকে সাবিত্রীযন্ত্র নামে একটী ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী বহু প্রকার নূতন অক্ষর আছে এবং কলিকাতার দরে পুস্তকাদি ছাপান হইতেছে। বিশেষ সুবিধা এই, গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে, প্রুফ সংশোধনের ভার রীতিমত লওয়া হইয়া থাকে। চিঠিপত্র চেক দাখিলা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জবওয়ার্ক সুলভ মূল্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাপান হইয়া থাকে। আমাকে লিখিলে বিশেষ বিবরণ সকলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল

ম্যানেজার।

হুগলী।

২য় ভাগ—৬ষ্ঠ সংখ্যা। আশ্বিন—১৩০১।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সূচী।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখক[illegible]।)

হুগলী,

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আশ্বিন—১৩০১।

এই সংখ্যার মূল্য ৵১০ দেড় আনা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হয়। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়াছেন। যাহাতে ইহা স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন আছে। এই পত্রিকা যাহাতে সকলের সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন তজ্জন্য ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাসুল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনার জন্য পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

বিজ্ঞাপন।

"ওলাউঠা চিকিৎসা" হুগলি "সাবিত্রী যন্ত্রে" দুই পয়সা মূল্যে পাওয়া যায়।

"মনোভাব" পদ্য ও গদ্য। মূল্য দুই আনা, ভ্যালুপেবেলে পাঠান হয় না। হুগলি "সাবিত্রী যন্ত্রে" ও "বিদ্যাসাগর" লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় ভাগ। | আশ্বিন, সন ১৩০১ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সে ত চিনিল না!

আজি এ নিকুঞ্জ বনে　　নিশীথের ঝিল্লীস্বনে
মিলায়ে, বাঁশরি, তোর স্বর বিমোহন--
ভাবে নিমগন হয়ে,　　মধুরে সুতান লয়ে,
এক মন এক ধ্যানে, কাঁপায়ে গগন--
বাজ না, দেখিব—তার ভোরে কি না মন।
হায় বাঁশি! বৃথা বিড়ম্বনা—
সে ত শুনিল না!

আয় রে সুরভি ফুল　　আধ ফুল্ল, সুগন্ধুল—
গোলাপ যূথিকা জাতি অতি মনোলোভা—
আয়,—গাঁথি ফুলহার　　দিব তারে উপহার,—
দেখিব—সে হাসে যদি—অধরের শোভা,—
(আর) সলাজ কপোলে চারু অলক্তক আভা।
হায় ফুল! আশা পূরিল না—
সে তোরে নিল না!

আয় নব-কিশলয়　　কচি, কোমলতাময়,
রচিব বকুল মূলে শয্যা মনোহর,
ফুলদলে শোভমান　　বিরচিব শিরোধান ;—

গোপনে লুকায়ে থেকে পাতার ভিতর
দেখিব—সে বসে যদি—শোভা কি সুন্দর।
হায় শয্যা! বৃথা এ কল্পনা—
সে ত বসিল না।

নীলাকাশে হাসি হাসি আর দেখি, পূর্ণশশি,
শুভ্র জোছনায় ছেয়ে সুষুপ্ত ভুবন,—
দেখি কেবা চারুতর———সে অথবা শশধর।
আশঙ্কা—শশাঙ্ক যদি কলঙ্কী বদন
লাজভয়ে মেঘজালে করে আচ্ছাদন।
(ভয় নাই)——হাস শশি। হ'ল না তুলনা—
সে দেখা দিল না।

কত দিন কত সাজে, দেখিতে গিয়েছি কাছে,—
দেখে দেখে "নয়ন না তিরপিত ভেল"—
বলি বলি কত কথা——রসনার কি জড়তা
বলিতে দিল না,—কথা মরমে রহিল,—
স্মৃতির একটি শুধু রেখা রয়ে গেল
এ জীবনে আশা মিটিল না—
সে ত চিনিল না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল।

সুধাময়া।

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজা মণিমোহন রায়ের সপ্তগ্রামের রাজপ্রাসাদ বহুদিন হইতে পরিত্যক্ত। প্রাচীরের গায়ে ছ্যাৎলা, অট্টালিকার গায়ে ছ্যাৎলা, কার্ণিসে ছ্যাৎলা। প্রাচীরের মাথায় কার্ণিসের উপরে বড় বড় তৃণ, মাঝে মাঝে

ব্যাঙের ছাতা। প্রাঙ্গণে বড় বড় তৃণ ও আগাছা। দেখিলেই মনে হয়, এ প্রাসাদ বহুদিন হইতে জনমানবশূন্য হইয়া পতিত আছে।

সকল কক্ষের গবাক্ষ বন্দ, কেবল একটি কক্ষের গবাক্ষ উন্মুক্ত।

তখনও প্রভাত হয় নাই। উষার সুকুমার আভা ফুটিতেছে, দিবসের আলোক ফোটে নাই। রজনীর ঘোর আছে, অন্ধকার নাই। স্থাবর জঙ্গমের ছায়া দৃশ্যমান,—আকৃতি অদৃশ্য। জগতের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে,—নিদ্রার ঘোর যায় নাই। মনুষ্য জাগে নাই, পক্ষী জাগিয়াছে। পক্ষী নীড় ত্যাগ করে নাই, পত্রান্তরাল হইতে প্রথম-প্রভাতের মাঙ্গলিক গীতধ্বনি করিতেছে। বিহঙ্গকণ্ঠ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর কণ্ঠ শ্রুত হইতেছে না।

যে কক্ষের গবাক্ষ উন্মুক্ত, সেই কক্ষের অভ্যন্তরে পর্য্যঙ্কের উপরে একটি ১৫। ১৬ বৎসরের বালিকা নিদ্রিতা। চূর্ণ কুন্তল অনিন্দ্য ললাটের উপর নিপতিত, আলুলায়িত ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি কতক উপাধানে, কতক বক্ষোপরি বিন্যস্ত। অঙ্গ অনাবৃত। বাহুদ্বয় উরসদ্বয়ের উপর ন্যস্ত। করদ্বয়ের বিকসিত কান্তি, উরসদ্বয়ের উদ্ভাসিত কান্তির সহিত মধুরে আলিঙ্গিত। নিমীলিত নেত্রের রোমাবলী ও ভ্রূ যুগলের নিবিড় কৃষ্ণকান্তি, উজ্জ্বল বর্ণে বিকসিত। ওষ্ঠাধর নববিকসিত অনাঘ্রাত ফুল্ল শ্যামকুসুম। তাহার তখনও প্রণয়ের প্রথম চুম্বন স্পর্শ করে নাই। বালিকার বদনে অশান্ত নিদ্রার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, যেন কোন দুঃস্বপ্নের ছায়া ফুটিয়া পড়িয়াছে। পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে ভূতলে একটি প্রাচীনা অঞ্চল শয্যায় শায়িতা; তিনিও নিদ্রামগ্ন।

কক্ষের গবাক্ষ বহুকাল রুদ্ধ ছিল। সহসা একটি পক্ষী মুক্ত গবাক্ষের উপর আসিয়া বসিল। ক্ষণকাল গৃহের অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিল, গবাক্ষ হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, ধীরে পর্য্যঙ্কের দিকে অগ্রসর হইল, পর্য্যঙ্কের উপর উঠিল, বালিকার পার্শ্বে বসিয়া অনিমিষলোচনে তাঁহাকে লক্ষ করিল, ধীরে ধীরে বালিকার চরণপ্রান্তে গিয়া প্রফুল্ল কমল সদৃশ পদদ্বয়ে চঞ্চু স্পর্শ করিল, আবার সরিয়া বদনের দিকে অগ্রসর হইল, ধীরে করদ্বয়ে চঞ্চু স্পর্শ করিল, ধীরে অগ্রসর হইয়া প্রশান্ত ললাটে চঞ্চু স্পর্শ করিল, আবার অনিমিষ দৃষ্টে বদন নিরীক্ষণ করিল, শেষে কণ্ঠ

বিস্তার করিয়া বালিকার ওষ্ঠে চঞ্চু স্পর্শ করিল। বালিকা শিহরিয়া নেত্র উন্মীলিত করিলেন। পক্ষী উড়িল, পলাইল না, গবাক্ষের উপর গিয়া বসিল, বঙ্কিমগ্রীবায় অনিমিষ লোচনে বালিকার দিকে চাহিয়া রহিল।

বালিকা উঠিয়া বসিলেন। বিস্মিতনয়নে গৃহের চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, বিস্মিত নেত্রে প্রাচীনা রমণীর দিকে দৃষ্টি করিলেন, চিনিতে পারিলেন না। পর্য্যঙ্ক হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে গবাক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন, পক্ষী গবাক্ষ ত্যাগ করিয়া অদূরে প্রাঙ্গণস্থিত বৃক্ষের শাখায় বসিয়া বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সৌন্দর্য্যে কেবল মনুষ্য মুগ্ধ নহে, পশু পক্ষীও মুগ্ধ, পতঙ্গও বহ্নির মোহন মূর্ত্তিতে বিমুগ্ধ। সম্মুখে প্রাচীর বেষ্টিত বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণভূমি উদ্যানে পরিশোভিত। মাঝে মাঝে লতাকুঞ্জ, মাঝে মাঝে শ্বেত মর্ম্মরের মূর্ত্তি। কোথাও বা স্নিগ্ধতোয়া পুষ্করিণী। প্রাচীরের কোলে একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঝিল। প্রাচীরের বহির্দ্দেশে গড়খাই। গড় খাইয়ের পরপার্শ্বে সুবিস্তীর্ণ নিবিড় আম্রকানন। অট্টালিকার দিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন অট্টালিকা সুদূর প্রসারিত। বহুক্ষণ স্থির দৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে যেন স্মৃতির দ্বার খুলিয়া গেল। সকলি যেন পরিচিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ঐ গৃহ, প্রাঙ্গণ, উদ্যান, তরু, লতা, পথ, ঘাট, পুষ্করিণী, ঝিল যেন ইতিপূর্ব্বে কবে দেখিয়াছেন, বেশ মনে হইল যেন দেখিয়াছেন। আবার মনে হইল, না ভ্রম হইতেছে। এ যে কোন রাজার অট্টালিকা, তিনি আজন্ম দরিদ্রা, তিনি এ স্থানে কিরূপে আসিবেন। আবার ভাবিলেন, হয় ত পিতার সঙ্গে কখন আসিয়া থাকিবেন। কবে আসিয়াছিলেন, কি উপলক্ষে আসিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল না, কিন্তু স্মৃতির কবাট খুলিয়া গেল, তাহার অভ্যন্তরে সম্মুখের দৃশ্যগুলি ছায়াকারে ভাসিতে লাগিল। সেই সঙ্গে কেমন একটা নূতন বিষাদে হৃদয় আচ্ছন্ন করিল।

পাঠক বুঝিয়াছেন যে বালিকা আর কেহ নহে—সুধাময়ী। বিগত রজনীতে তাঁহার গৃহদাহ হইয়াছে, সিদ্ধেশ্বরী পাগ্‌লীর সহিত গৃহ ত্যাগ করিয়া অদূর হইতে তাঁহার প্রজ্জ্বলিত গৃহ দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। তাহার পরে তাঁর কি হইল, তাহা কিছুই স্মরণ নাই। দুশ্চিন্তায় তাঁর প্রাণ আকুল, তাহার উপর এই বিস্ময়—এই নূতন বিষাদ উপস্থিত

হইয়া বালিকাকে একান্ত কাতর করিয়া তুলিল। ভাবিলেন কোথায় আসিলেন! সিদ্ধেশ্বরী পাগ্‌লী কোথায় গেলেন। মন বড় অস্থির হইল। কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। নিদ্রিতা প্রাচীনাকে মনে পড়িল। উহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন ভাবিয়া গবাক্ষ ত্যাগ করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন প্রাচীনা গাঢ় নিদ্রামগ্ন। নিদ্রাভঙ্গ করিতে সাহস হইল না। আবার ফিরিলেন। গৃহের ভিত্তিতে দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন একখানি বৃহৎ চিত্রপট বিলম্বিত। তাহার তিনটি মূর্ত্তি চিত্রিত। একটি সুন্দর পুরুষ, একটি নিরুপমা রমণী, ও উভয়ের মধ্যস্থলে একটি ৪ বৎসরের কি ৫ বৎসরের বালিকা। দৃষ্টি মাত্রেই সুধাময়ীর স্মৃতির অন্ধকারে সহসা যেন এক আলোক জ্বলিয়া উঠিল, সুধা দ্রুতপদে চিত্রপটের নিকটবর্ত্তী হইলেন। একাগ্রদৃষ্টে মূর্ত্তিগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মনে পড়ে পড়ে—পড়ে না। বালিকার মূর্ত্তি কি তাঁহাব নিজের মূর্ত্তি নহে? রমণীর মূর্ত্তির সহিত কি তাঁর নিজের সৌসাদৃশ্য নাই? আছে বৈ কি। অঙ্গে অঙ্গে সৌসাদৃশ্য। পুরুষ মূর্ত্তির সহিত ও সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। কে ইহারা! ইহারা কি সুধার কেহ নহে? কেহ নহে যদি, তবে উহাদের দেখিয়া এত মায়া হইতেছে কেন? কেন প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে, কেন চক্ষে জল আসিতেছে? কেন সুধার মাকে এত মনে পড়িতেছে? সুধাব জননীব জন্য প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল, শুনিয়াছেন তাঁর মা নাই, শৈশবেই মাকে হারাইয়াছেন। মায়ের আকার কেমন তাহা সুধার কিছুই মনে নাই, তবু মনে হইতেছে, সম্মুখের রমণীমূর্ত্তি তাঁর মায়ের মত। যত দেখিতে লাগিলেন ততই প্রাণ অস্থির হইল, শেষে সুধাময়ীর ধৈর্য্য লোপ হইল, "মা মা, আমাব মা কোথায়" বলিয়া বালিকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রোদন-শব্দে গৃহস্থিত প্রাচীনার নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রাচীনা ত্রস্তে গাত্রোত্থান করিয়া সুধাময়ীর নিকটে গমন করিলেন।

প্রাচীনার যত্নে ও উৎসাহ বাক্যে সুধাময়ী কতক শান্ত হইলেন। আনত বদনে প্রাচীনাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

আমায় এখানে কে নিয়ে এল?

প্রাচীনা। সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরুণ তোমায় এখানে পাঠিয়ে দিয়েচেন। আমি, আর, কাজ কর্ম্ম করবার জন্যে আর একজন পুরুষ মানুষ সঙ্গে এয়েচি।

সুধা। কবে এয়েচি।

প্রাচীনা। কাল্ রাত্রে।

সুধা। আমার ঘর পুড়েছে কবে ?

প্রাচীনা। কাল সন্ধ্যাবেলা।

সুধা। এ জায়গার নাম কি ? এ বাড়ী কার্ ?

প্রাচীনা। জায়গার নাম সাতগাঁ। বাড়ী রাজা মণিমোহন রায়ের।

সুধাময়ী বিস্ময়ে প্রাচীনার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেনঃ—

সাতগাঁ দক্ষিণপাড়া থেকে ৮।১০ ক্রোশ !

প্রাচীনা। বরং বেশী ত কম্ নয়। সিদ্ধেশ্বরী ঠাক্‌রুণ বাবুদের মাঝিদের ব'লে কয়ে, তাঁদেরি ছিপে করে আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। ১৬টা দাঁড় ছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এসে পড়লো। তুমি অজ্ঞান হয়ে ছিলে, তার পর সিদ্ধেশ্বরী ঠাক্‌রুণ তোমায় ছিপে শুইয়ে তোমার মুখের উপর খানিক ক্ষণ ধ'রে হাত নেড়ে, বল্লেন, যাও, এ রাত্রে সুধার আর ঘুম ভাঙ্‌বেনা।" আসবার সময় আমাদের বেশ করে বলে কয়ে দিয়েছেন। তোমার কোন ভাবনা নেই। আমরা প্রাণ দিয়ে করবো। এখন ওঠ মুখ্ হাত ধোবে চল।

সুধা। সিদ্ধেশ্বরী ঠাক্‌রুণ কোথা ?

প্রাচীনা। তিনি দক্ষিণপাড়াতেই আছেন। আহা তাঁর বড় অসুখ গো। তোমার ঘরে আগুন লাগার সময় থেকেই তাঁর কাঁপুনি আরম্ভ হয়। সে কাঁপুনি ক্রমে খুব বাড়্‌তে থাকে। তবু তোমায় বুক থেকে নাবান নি। তোমায় যখন ছিপে শুইয়ে দিলেন, তখন তাঁর পা টল্‌চে। ছিপ ছেড়ে দিলে, দেখ্‌লুম তিনি স্বরস্বতী নদীর তীরে ব'সে প'ড়লেন।

সুধার চক্ষু ছল ছল' হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন "তাঁকে কে দেখা শুনা কর্‌বে ? তেমন লোক তাঁর কেউ নেই কি ?"

প্রাচীনা। তা আর নেই ! যে দেখবে, যে শুনবে, সেই প্রাণ দিয়ে ক'রবে। তা তিনি কি কাকেও বলবেন, না জানতে দেবেন। কোথায় পড়ে থাকবেন কেউ জানতেও পারবে না।

সুধাময়ী। আনত বদনে ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

আমার বাবার খবর কিছু শুনেচ ?

প্রাচীনা। আসবার সময় সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরুণ ব’লে দেছেন, তিনি মুকৃসিদাবাদে আছেন। দক্ষিণপাড়ায় এলেই এখানে পাঠিয়ে দেবেন।

সুধাময়ী সাশ্রুনেত্রে বলিলেনঃ –

তোমরা আমায় দক্ষিণপাড়ায় নে চল। আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হচ্চে। আমার মা নেই। মা কেমন তা আমি জানি না। আমার বাবাই আমার মা ও বাপ। আজ অকস্মাৎ আমার মায়ের জন্য প্রাণ কেঁদে উঠচে। বাবাকে না দেখলে আমার প্রাণ স্থির হচ্চে না। বাবা ফিরে এসে, ঘরপোড়া দেখে, আমায় দেখতে না পেলে তখনি প্রাণত্যাগ করবেন। তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় শিগ্‌গির দক্ষিণপাড়ায় নে চল।

প্রাচীনা। সেখানে ঘর নেই, দ্বোর নেই থাকবে কোথায় ?

সুধা। গাছতলায় থাকবো।

প্রাচীনা। সিদ্ধেশ্বরী ঠাকরুণ বলেছেন, তোমার সেখানে এখন যাওয়া হবে না। বাবুরা তোমায় সেখানে দেখতে পেলে খুন ক’র্‌বে।

সুধাময়ী আবার বদন অবনত করিলেন। দুই চক্ষে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "আমায় মুরশিদাবাদে বাবার কাছে পাঠিয়ে দেও।"

প্রাচীনা। সেখানে কে যাবে মা ? আমরা পথ ঘাট চিনিনে। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, কখন বাড়ীর বার হইনি। সিদ্ধেশ্বরী ঠাকরুণের কথায় তোমার সঙ্গে এয়েছি। সঙ্গে যে লোক এয়েচে, সে হাবা গোবা। চাষার ছেলে। সেও কখন সহরে যায় নি। তুমি এত উতলা হচ্চ কেন ? ঠাকরুণের অসাদ্দি কাজ নেই। তিনি সব করবেন। এই দেখ না, তোমার বাবা এসে পড়েন বলে। উঠ, মুখ হাত ধোবে চল।

প্রাচীনা এই বলিয়া অঞ্চলে সুধাময়ীর অশ্রু মোচন করিয়া, তাঁহাকে তুলিলেন, এবং তাঁহার হাত ধরিয়া বহির্দ্দেশে লইয়া চলিলেন। পথে সুধাময়ী একবার জিজ্ঞাসা করিলেন "এ বাড়ীতে আর কে আছে ?"

প্রাচীনা। আর কেউ নেই, কেবল আমরা। শুনেচি রাজা মণিমোহন গুষ্টিশুদ্ধ কয়েদ হয়ে মুকৃসিদাবাদে আছেন। আহা! কপাল দেখ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। প্রখর সূর্য্যকিরণে ধরণী কাতর। বৃক্ষ লতা উত্তাপে ম্রিয়মাণ। পক্ষিগণ নীড়ে আশ্রয় লইয়াছে, পশ্বাদি বৃক্ষ ছায়ায় অঙ্গ ঢালিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছে। কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত তৃণচ্ছায়ায় বা লতার অন্তরালে বিশ্রাম করিতেছে। উগ্রমূর্ত্তি রৌদ্র দিগন্ত দাহ করিয়া বেড়াইতেছে। উত্তাপের ছটা যেন জ্বলিয়া উঠিতেছে। পথে জনপ্রাণী দৃষ্ট হইতেছে না। পৃথিবী নিস্তব্ধ। এমন সময় দক্ষিণপাড়ার দির্ঘীকার তীরে জনতা দৃষ্ট হইল। হস্তী, ঘোটক, শিবিকা, চালক, বাহক অনুচর প্রায় ৫০।৬০ জন মনুষ্য দির্ঘীকার তীরে উপস্থিত হইল। কয়েকখানি শিবিকা ছিল। তাহার একখানি হইতে একটি বৃদ্ধ কিছু ব্যগ্রতার সহিত বহির্গত হইলেন। ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াই সুধাময়ীর গৃহেব দিকে দৃষ্টি করিলেন। দৃষ্টি করিবামাত্রেই তাঁহাব মুখমণ্ডল একেবারে শুষ্ক হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ, সঙ্গীগণকে সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে বলিয়া একাকী দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। পাঠক বুঝিয়াছেন, এ বৃদ্ধ, মাধব চট্টোপাধ্যায়। যে রৌদ্রের উত্তাপে কাষ্ঠ পর্য্যন্ত ক্লিষ্ট হইতেছে, প্রস্তর পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে, সলিলও কাতর হইতেছে, বৃদ্ধ মাধবের কেশশূন্য মস্তকে সে উত্তাপ আজ অনুভূত হইতেছে না। বৃদ্ধ যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, গতি ততই দ্রুত হইতে লাগিল।

মাধব নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার দগ্ধাবশিষ্ট গৃহের দিকে স্থির দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। স্থিরমূর্ত্তি—নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখাবৎ। পাঠক, কখন স্থির সমুদ্র দেখিয়াছেন? কখন বৃক্ষ লতাদি শূন্য শৈলশৃঙ্গ দেখিয়াছেন? কখন চিতাপার্শ্বে প্রোথিত বংশখণ্ড দেখিয়াছেন? কখন বজ্রাহত মহীরুহ দেখিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন তবে মাধবের এই অবস্থার আকৃতি অনুধাবন করুন। মাধব দেখিতেছেন আচ্ছাদনশূন্য মৃণ্ময় ভিত্তি—বিগত-জীবন—বিযুক্ত-ওষ্ঠাধর শবদেহের ন্যায় অবস্থিত। গৃহের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার রাশি, ভিত্তির উপরে অঙ্গার রাশি, সম্মুখের রকের উপরে অঙ্গার রাশি, প্রাঙ্গণে অঙ্গার রাশি, চতুষ্পার্শ্বে অঙ্গার রাশি। মাধব যে দিকে দৃষ্টি করিতেছেন কেবলি অঙ্গার। প্রাঙ্গণে সুধাময়ীর স্বহস্ত রোপিত তরুগুলি শাখা প্রশাখা শূন্য হইয়া বিদগ্ধ দেহে দণ্ডায়মান, লতাগুলি বৃক্ষশাখা বিচ্যুত

দগ্ধ ও কুঞ্চিত দেহে ভূতলে পতিত। প্রাঙ্গণের এক স্থানে লৌহপিঞ্জর পতিত, তাহার ভিতরে সুধার সাধের পাখিটি দগ্ধ কলেবরে নিপতিত। অনতিদূরে সুধার বিড়ালটি বিমর্ষভাবে সেই দগ্ধাবশিষ্ট গৃহের দিকে কাতর দৃষ্টে উপবিষ্ট। অদূরে এক বৃক্ষছায়ায় কণ্ঠলগ্ন-রজ্জু গাভিটি দগ্ধগৃহাভিমুখে করুণাপূরিত দৃষ্টে দণ্ডায়মান।

মাধব ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টে লক্ষ্য করিয়া নয়ন তুলিয়া একবার চতুর্দ্দিক দৃষ্টি করিলেন। জনমানব দৃষ্ট হইল না, তখন চিৎকারে ডাকিলেন—"সুধাময়ী।" সে চিৎকার শুনিয়া জনেক প্রতিবাসিনী গৃহবহির্ভূত হইয়া, তাঁহার গৃহের রক্ হইতে মাধবকে দৃষ্টি করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আর বাবা, সুধাময়ী; সুধাময়ী কি আর আছে? ঐ ছাইয়ের সঙ্গে ছাই হ'য়ে গেছে, আহা বুড়োর কি কষ্ট গা! এই বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের শোক! বুড় আর বাঁচবে না আর কি?" এই কথা বলিয়া প্রতিবেশিনী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কথা মাধবের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। মাধব শিহরিয়া উঠিলেন। তখন ধীরে ধীরে দগ্ধগৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন, রকে উঠিলেন, গৃহের দ্বারে ভিত্তি অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া চিৎকার করিলেন—"সুধাময়ী।" গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, চতুর্দ্দিক দৃষ্টি করিয়া ডাকিলেন—"সুধাময়ী।" অঙ্গার রাশির দিকে একবার দৃষ্টি করিয়া ডাকিলেন—"সুধাময়ী।" শেষে দুই হস্তে অঙ্গার রাশি অপসৃত করিতে লাগিলেন।

সুধাময়ীর জন্য মাধব বিপুল ঐশ্বর্য্য লইয়া আসিয়াছেন। রাজা মণিমোহনের যে বৈভব ছিল, নবাব সুজাদ্দৌলা সকলই প্রত্যর্পণ করিয়াছেন; তদ্ব্যতীত নবাব বন্ধুর নিরাশ্রয়া কন্যার জন্য বার্ষিক লক্ষাধিক মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছেন। মাধব, প্রভু বিয়োগ ও নিজের দুর্দ্দশা সকলি ভুলিয়া, সুধাকে এই ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে আসিয়াছেন। পথে কত সাধ মনে উদয় হইয়াছে। সুধার জন্য কোন্ স্থানে কিরূপ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইবেন, কোন গৃহটি সুধার শয্যাগৃহ হইবে। শয্যা কিরূপ হইবে, গৃহসজ্জা কি কি হইবে, সুধার শয়নকক্ষের সম্মুখে কিরূপ উদ্যান হইবে, সুধার বসন ভূষণ কি কি প্রস্তুত করাইবেন, বিবাহের কথা কিরূপে সুধার নিকট

প্রস্তাব করিবেন, ললিতকে বলিলেইসে সম্মত হইবে, ললিত বড় ভাল ছেলে। রত্নেশ্বর আর আপত্তি করিবেন না। সুধা রাজকন্যা এ পরিচয় পাইলে, রত্নেশ্বর সুধাকে পুত্রবধূ করিবার জন্য এখনি প্রস্তুত হইবেন। অথবা সে কথা এখন প্রকাশ করিবেন না, সুধার ঐশ্বর্য্যের কথাও এখন প্রকাশ করিবেন না। প্রথমেই রত্নেশ্বরের নিকট ললিতের সহিত সুধার বিবাহের কথা উত্থাপন করিবেন। রত্নেশ্বরের সহিত দিন কতক কৌতুক করিবেন। ইত্যাদি নানা সুখকর চিন্তা ও কল্পনা করিতে করিতে বৃদ্ধ মাধব দক্ষিণপাড়ায় আসিয়াছেন। আসিয়াই দেখিলেন, তাঁহার গৃহ অগ্নিদাহে বিনষ্ট হইয়াছে, আর তাঁর সকল আনন্দের আধার সুধাময়ীও বুঝি ভস্মে পরিণত হইয়াছে।

মাধবের চৈতন্য লোপ হইল, বৃদ্ধ পাগলের ন্যায় অঙ্গার রাশির মধ্যে সুধার দগ্ধাবশিষ্ট দেহের চিহ্ন অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এক এক খানি করিয়া অঙ্গার তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন যদি তার সঙ্গে সুধার কোন চিহ্ন দেখিতে পান।

মাধবের বিলম্ব দেখিয়া একজন প্রধান অনুচর তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি করিতে হইবে আমাদের অনুমতি করুন, এই দারুণ রৌদ্রে আপনি কেন এত ক্লেশ করিতেছেন।" মাধব মুখ তুলিয়া অনুচরের দিকে দৃষ্টি করিলেন, সে—দৃষ্টি নহে, প্রদীপ্ত বহ্নি,—দেখিয়া অনুচরের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। মাধব গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"এখন এখান হইতে সরিয়া যাও, দীর্ঘিকা তীরে অবস্থান করগে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে যদি সেখানে উপস্থিত হই, তবে সকল কথা হইবে। যদি আমায় সেখানে সন্ধ্যার মধ্যে না দেখ, তবে জন দুই থাকিও, আর সকলে মুরশিদাবাদে ফিরিয়া যাইবে। নবাব সাহেবকে বলিবে"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। নবাব সাহেবকে কি বলিবে, তাহা আর মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না, শেষে অঞ্জলি করিয়া অঙ্গার তুলিয়া অনুচরকে দেখাইলেন। অনুচর বুঝিল, সুধাময়ী গৃহের সহিত দগ্ধ হইয়াছে, বুঝিবামাত্র আর সে মাধবের দিকে চাহিতে পারিল না। দৃষ্টি ফিরাইয়া সেস্থান হইতে দীর্ঘিকাতীরে প্রস্থান করিল।

রৌদ্রের উত্তাপ প্রশমিত হইলে, দুই একটি করিয়া লোক গৃহবহির্ভূত

হইতে লাগিল। দীর্ঘিকা তীরে জনতা দেখিয়া তথায় ক্রমে লোক সমাগম হইতে লাগিল। বেলা অবসান হইবার পূর্ব্বেই গ্রামে রাষ্ট্র হইল, যে মাধব অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন। যাহারা মাধবের শত্রু ছিল, তাহারা মিত্রভাবে মাধবের অভ্যর্থনা করিবার জন্য দীর্ঘিকাতীরে উপস্থিত হইল। দরিদ্র, গৃহস্থ, ধনী, ছোট বড় প্রায় সকল লোকেই আজ মাধবের অভ্যর্থনার জন্য উৎসুক হইয়া দীর্ঘিকা তীরে উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐশ্বর্য্যের কি মহিমা! রত্নেশ্বর এ সংবাদ শুনিলেন, তাঁহার হৃদয় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

তখন বেলা অবসান প্রায়। মাধব তাঁহার দগ্ধগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। চক্ষু আরক্ত, দৃষ্টি আনত, গতি দুর্ব্বল। মন্দ পদক্ষেপে দীর্ঘিকা অভিমুখে চলিলেন। পথে যে তাঁহাকে দেখিল সেই সম্ভাষণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল, মাধব কাহাকেও লক্ষ্য করিলেন না, কাহারও জন্য দাঁড়াইলেন না। তাঁহার ভাব দেখিয়া কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না।

তাঁহার অনুচরবর্গ তখনও চলিয়া যায় নাই। সকলেই বিষণ্ণভাবে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। গ্রামস্থ লোকেদের নিকট সুধাময়ীর গৃহদাহে মৃত্যুর বিবরণ শুনিতেছিল। মাধব উপস্থিত হইলে সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গ্রামের লোকেরা পরিত্যক্ত, অত্যাচার-পীড়িত, মাধবের আজ শোকভারাক্রান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া কিঞ্চিদ্দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। এ সম্মান শোকার্ত্তের নহে, এ সম্মান অব্যক্ত শোকের। শোকে মনুষ্য পাগল হয়, তাহার মনুষ্যত্ব ভুলিয়া যায়, কিন্তু তাহার অবয়বে দেবভাব ফুটিয়া পড়ে। কি ধনী, কি দরিদ্র, শোকার্ত্তকে দেখিলে সকলেরি মনে, কেমন একটা সম্মান, কেমন একটা শ্রদ্ধা বা ভক্তির উদয় হয়।

মাধব অনুচরবর্গকে বলিলেন—"তোমরা সকলেই মুরশিদাবাদে ফিরিয়া যাও, কেবল একজন মাত্র থাক। নবাব সাহেবকে পত্র দিব লইয়া যাইবে। নবাব সাহেব তোমাদের প্রত্যাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে"—মাধব আর বলিতে পারিলেন না। তাঁহার দগ্ধ গৃহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মুখ অবনত করিলেন।

এমন সময়ে ললিতকুমারের ভৃত্য মাধবের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে

প্রণাম করিল এবং বলিল, "বড় বাবু একবার আপনায় সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বড় ব্যস্ত হ'য়েছেন। তিনি নিজেই আস্তেন, তবে নাকি এখনও বড় কাহিল তাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, যদি আপনি অনুগ্রহ করে একবার তাঁর কাছে যান ত বড়ই ভাল হয়।"

মাধব দৃষ্টি তুলিয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ললিতের কি হয়েছে ?"

ভৃত্য। আপনার ঘরে আগুন লাগা শুনে, বড়বাবু আপনার মেয়েটিকে বাঁচাবার জন্যে ছুটে ঘরের ভিতর যাচ্ছিলেন, একটা বাঁশ পড়ে মাথা ভেঙে গেছে। বড় কষ্ট পাচ্চেন। ক'দিন একেবারে অজ্ঞান হ'য়ে ছিলেন। খুব জ্বর, খুব বিকার। আজ দিন ২।৩ একটু ভাল আছেন।

মাধবের অনুচরবর্গ বিদায় লইল। একমাত্র অনুচর লইয়া মাধব ললিতের ভৃত্যের সঙ্গে বজ্রেশ্বরের বাটীতে গমন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দশ দিন হইল ললিতকুমার আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখনও তাঁহার মস্তকের ঘা শুষ্ক হয় নাই। শরীর এখনও শীর্ণ দুর্ব্বল। এ কয়দিন অন্তঃপুরে ছিলেন, আজ মাধবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাটীর সম্মুখস্থিত উদ্যানবাটিকার বৈঠকখানায় আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

বেলা প্রায় অবসান হইয়াছে। ললিতকুমার ব্যাকুল চিত্তে গৃহের মধ্যে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় মাধব আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মাধবকে দেখিয়া ললিত গৃহের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিলেন। মাধব ললিতকে তদবস্থায় দেখিয়া আনত বদনে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ললিত রোদন করিতেছিলেন, তাঁহার অস্ফুট রোদন মাধবের কর্ণে প্রবেশ করিল। মাধব ঊর্দ্ধদৃষ্টে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে বলিলেনঃ—

ললিত শান্ত হও, তোমাকে এ অবস্থায় দেখিয়া আমার যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি হইতেছে। আমি কাঁদিতে পারিতেছি না, আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে তবু প্রাণ বাহির হইতেছে না। যদি কাঁদিবার কোন ঔষধ থাকে তবে আমায় দিয়া এ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত কর।

ললিত রোদন সম্বরণ করিলেন, অশ্রু মোচন করিয়া মাধবের পশ্চাত

পশ্চাত গৃহ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মাধব পরিভ্রমণ করিতে করিতে কিয়ৎকাল পরে বলিলেনঃ—

ললিত, সুধা আমার জন্য তাহার কোন চিহ্নই রাখিয়া যায় নাই। তাহার সকল নিদর্শনই তাহার সঙ্গে গিয়াছে। তাহার সাধের শ্যামা পাখিটি দগ্ধ কলেবরে পিঞ্জরের মধ্যে প্রাঙ্গণে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার সাধেব গ্রন্থগুলি ভস্ম হইয়াছে, তাহার সাধের যন্ত্রগুলি ভস্ম হইয়াছে। আমি এক এক খানি করিয়া অঙ্গার তুলিয়া দেখিয়া আসিলাম, তাহার বস্ত্রের একগাছি সূতা পর্য্যন্ত পাইলাম না, অলঙ্কারের একটু চূর্ণকণাও পাইলাম না, তাহার অস্থি বা মাংসের একটু কণামাত্রও পাইলাম না। সকলি ভস্ম হইয়াছে। জগতে এত নিষ্ঠুরতা আছে, তাহা কখন ভাবি নাই।

মাধবের কথা শুনিয়া ললিত আবার রোদন করিয়া উঠিলেন। মাধব বলিলেনঃ—

ললিত শান্ত হও। তোমায় অনেক কথা বলিতে আসিয়াছি। বাধা দিও না। এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরবে পরিভ্রমণ করিতে করিতে বলিলেনঃ—

তাহার বাপ মা তাহাকে আপনাদের কাছে লইয়াগিয়াছেন। আমি পর বৈ ত নয়, আমার কাছে রাখিয়া তাঁহাদের তৃপ্তি হইবে কেন?

ললিত বিস্মিত বদনে মাধবের দিকে দৃষ্টি করিয়া স্থির পদে দাঁড়াইলেন।

মাধব আবার বলিলেনঃ—"আমি ত তাঁদের সঙ্গেই যাইতেছিলাম, তাঁহারাই নিষেধ করিলেন, আমি ত সুধার জন্যই রহিলাম, সে সুধাকে —তাঁহারা কাড়িয়া লইলেন।"

আবার বলিলেনঃ—

আমার অন্ন দাতা, শিক্ষা দাতা, জ্ঞান দাতা, ধর্ম্ম দাতা, প্রাণ দাতা, প্রভু, ও প্রভুপত্নীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সুধাময়ীকে রক্ষা করিবার জন্যই দক্ষিণ পাড়ায় ফিরিয়া আসিলাম। আমার সে সুধাময়ী কোথায়!

বৃদ্ধ মাধব আর দাঁড়াইতে পারিলেন না ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। ললিত ত্রস্তে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

ক্রমশঃ।

কি সাধ ?

একটু মধুর হাসি স্নেহের কথায়
নিরমিতে পারে স্বর্গ পাপের ধরায়।
একদিন পড়ে মনে
নিরখি তাহার পানে
দেখিয়া ছিলাম স্বর্গ নয়নে তাহার।
কিন্তু মম ভাগ্যদোষে
নিরদয় হইল শেষে
তদবধি দুনয়নে হেরি অন্ধকার।
শুষ্ক প্রাণে শুষ্ক মনে
সংসারের এক কোণে
প'ড়ে আছি, আঁধারেতে বাঁধিয়াছি বাসা !
এ আঁধার গুহা-মুখে
করুণা-মমতা বুকে
হাসিতে লইয়া আলো, আঁখিতে পিপাসা
কেহ ত আসে না কাছে
ছায়াটি পরশে পাছে,
ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে ভ্রমে আমা হ'তে।
কে তুমি কি সাধ ক'রে
এলে এ আঁধার ঘরে ?
বিদ্যুতের প্রভা যেন নয়নের পথে !
এসেছ কি অভাগার
জীবনে যা' বাকী আর
ও হাসিতে ফাঁকি দিয়ে ভুলায়ে লইতে
অথবা এ শুষ্ক কণ্ঠে গরল ঢালিতে ?

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মন আমার কি চায়?

১।

কাঁদে মন অনিবার
চারি দিক অন্ধকার
বিষাদে মগন সদা হৃদয় আমার
হুহু করে সদা মন—
মরুভূমে সমীরণ
আকুল হৃদয়ে হেরি বিশূন্য সংসার।

২।

ইচ্ছা ছাড়ি লোকালয়
বিভূতি মাখিয়ে গায়
নিভৃত পর্ব্বতমূলে বসি নিরন্তর
ধ্যানমগ্ন স্থিরচিত্ত
সব কর্ম্মে বিনিবৃত্ত
হরিনামে ডুবে রই প্রফুল্ল অন্তর।

৩।

কবে হবে সেই দিন
অভিমান হবে ক্ষীণ
প্রেমভাবে আলিঙ্গিব জগৎসংসার
মোহ হবে অবসান
ধরিয়া মধুর তান
গাইব হরির নাম প্রেমের আধার।

৪।

শূন্য চিত্ত লয়ে আর
গৃহে থাকা বড় ভার
তাই চাই চলি যাই কাটিয়া মায়ায়

নির্ঝরের পাশে বসি
আনন্দেতে সদা ভাসি
খুলে দি হৃদয়স্রোত মিশিতে তাহায়।

৫।

দিনমণি অস্তাচলে
ভাসিছে বিহঙ্গদলে
মধুর সঙ্গীতে ভরা আকাশপ্রান্তব
হেসে হেসে চলি যাই
হরিগুণ সদা গাই
ভাবেতে বিভোর হয়ে প্রফুল্ল অন্তর।

৬।

সরোবরে কমলিনী
আনন্দেতে প্রমোদিনী
ধ্যানে মগ্ন শান্তিনীরে শোভে অনিবার
ধীরে ধীরে তার পাশে
বসিয়া প্রেম উল্লাসে
যোগের মহিমা শিথি নিকটে তাহাব।

৭।

আঁধার আকাশে হায়
কত তারা ফুটে রয়
নিশানাথ বিনা তারা কাতর অন্তর
মর্ত্ত্যলোক পরিহরি
উড়ে যাই ত্বরা করি
শোভা পাই হয়ে চাঁদ তাদের ভিতর।

৮।

তাহাদের সনে মিশি
আনন্দেতে দিবা নিশি
হরিগুণ গাই সবে তুলিয়া সুতান

সেই তানে মত্ত হয়ে
ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে
জাগুক ভারতবাসী মোহেতে শয়ান।

৯।

ভালবাসা পাবে বলে
ঘোরে নর ধরাতলে
মরীচিকা ভ্রম তার ঘুচিল না আর
মনে ভাবে পাবে সুখ
পায় কিন্তু শুধু দুখ
মোহেতে পড়িয়া তার নাহিক নিস্তার।

১০।

দিন যায় ক্ষণ যায়
জল বুদ্বুদের প্রায়
জ্বলিছে সম্মুখে ঐ শ্মশান আমার
কি বল চাহিব আর
চাহি সেই সারাৎসার
অন্তিমের সখা হরি চরণ তাঁহার।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল

কিসে আমাদের পরিত্রাণ সম্ভব ?

ভিন্ন ভিন্ন লোকে এই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন রূপ উত্তর প্রদান করেন। ইংরাজ পাদরী বলেন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বনে দেশী বিলাত ফেব্‌তাবা বলেন বিলাত গমনে ও ইংরাজকে দেবভাবে পূজনে এবং নবদ্বীপবাসী ভট্টাচার্য্য বলেন হিন্দুশাস্ত্র শাসন ও ব্রাহ্মণের সম্মান এবং দেবগুরু সেবনে।

ভারতবর্ষ বন্য আফ্রিকা নয়। ভারতভূমি জগতে অতুল ধর্ম্ম সংহিতা বেদের প্রসূতি। সেথানে বেদের গীতার ধর্ম্ম রাজ্য; সাংখ্যাদি দর্শনের আধিপত্য। ভারতভূমে ঈষার ধর্ম্মরাজ্য বিস্তারের আশা সুদূরপরাহত। শাক্যসিংহের প্রতিষ্ঠিত উন্নতিবাদ যে ভারতভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছে

সেই পুণ্য ভূমিতে খৃষ্টধর্ম্মের স্থান লাভ করা একান্ত অসম্ভব। মহারাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় হইতে খৃষ্টান ইংরাজ বাইবেল হস্তে ভারতে গতাগতি করিতেছেন। কিন্তু কতগুলি হিন্দুকে সেই ইংরাজ স্বধর্ম্মাবলম্বী করিতে পারিয়াছেন? কয়টি ভট্টাচার্য্য, কয়জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কয়জন প্রকৃত শিক্ষিত হিন্দু বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগে জোসেফ্ খৃষ্টকে পরিত্রাতা বলিয়া পরিগ্রহ করিয়াছেন? নগণ্য সাঁওতাল, মেদিনীপুরের কৃষিজীবী অর্দ্ধউড়ে খৃষ্টানদের কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। বন্য আফ্রিকার ন্যায় ভারত জর্ডন্ জলস্নাত হইতে পারে না। হিন্দু আর্য্যধর্ম্ম সমক্ষে মুষা এবং ঈষার ধর্ম্মকে তটস্থ হইতে হয়।

১২৭১ সালের আশ্বিনের ঝড়ে কলিকাতার অনেক সুদৃঢ় ইমারত পতিত হয় কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের কোন কিছুই হয় না। কারণ এই দুর্গ অতীব সুদৃঢ় ইহার অস্থি পঞ্জর সবিশেষ শক্ত। কথিত প্রবল বাত্যার ন্যায় হিন্দু ধর্ম্ম সময়ে সময়ে প্রবল উৎপাত সহ্য করিয়াছে। বুদ্ধ দেব ইহার বিনাশ চেষ্টা করেন। মুসলমানেরা ইহার বিধ্বংশে বিশেষ ব্যগ্র হন। ইংরাজ পাদরী প্রভৃতি ইহার মূলোৎপাটনে ব্যস্ত। কিন্তু কেহই ইহার কোন কিছু করিতে পারেন নাই এবং পারিতেছেন না। উল্লিখিত দুর্গের মত অনেক ঝড় তুফান সহ্য করিয়াও হিন্দুধর্ম্ম প্রায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মহর্ষি বশিষ্ঠের কামধেনুর ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম আপনি আপনাকে রক্ষা করিতেছেন। ইহার অন্তরে অপূর্ব্ব মহামায়া ভাগবতী শক্তি বিরাজিতা। সেই শক্তি গতিকে ইহার আত্মরক্ষা সুসম্পন্ন হইতেছে। বাইবেলের বেদ-স্থান পরিগ্রহ করার আশা দুরাশা মাত্র। ভারতে নন্দোৎসবই হইবে। ভারতবাসী হিন্দু কখন যিশুর জন্মদিনে উৎসব করিবে না, যশোদা দুলালকে ছাড়িয়া জোসেফ্ নন্দনকে গ্রহণ করিবে না।

১৮৬০ খৃঃ অব্দ হইতে অনেক এদেশীয় বিলাত গিয়াছেন। ইহারাই বিলাত ফেরতা। ইহাদের মধ্যে অনেকের কেবল তাহাদের নিজের মনে তাহাদের উন্নতি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। কিন্তু ভারতের পরিত্রাণ পক্ষে তাহাদের দ্বারা কোন কিছুই হয় নাই, হইবারও সম্ভাবনা নাই। বিলাত ফের্‌তারা একটি পৃথক সম্প্রদায় হইয়া পড়িতেছেন। আমাদের সামান্য

বুদ্ধি যত দূর পরিগ্রহ করিতে সক্ষম, তাহাতে এইরূপ বুঝা যায় যে জনবৃন্দের সহিত তাহাদের প্রকৃত সমানুভূতি নাই। এদিকে আবার ইহারা দেশীয়দের সহিত মিলিত হইতে অসম্মত এবং দেশীয়েরাও তাহাদের প্রতি বড় রাজী নন। কাজেই ইহাদের রাজা ত্রিশঙ্কুর অবস্থা, না স্বর্গে না মর্ত্ত্যে। বিলাত গমনে, গঙ্গার পরিবর্ত্তে টেমস নীর পানে আমাদের পরিত্রাণ অসম্ভব। আর সমস্ত ভারতবাসীর বিলাত গমন ও ফিরিঙ্গী হওয়া সুসাধ্য এবং সম্ভবপর নহে।

অনেক ইংরাজি শিক্ষিত ইংরাজকে দেবতারূপে ভক্তি করিবার জন্য আমাদের অনুরোধ করেন। বিলাত ফেরতারা এই দলের অগ্রণী। আমাদের দেবতা এবং ইংরাজি gods প্রায় একই পদার্থ। দেবতাদের প্রধান গুণ মনুষ্য প্রতি অনুকম্পা। ইংরাজ আমাদের প্রতি প্রায় সদয় নহেন। ইংরাজ কার্য্যতৎপর কার্য্যকুশল হইলেও সাহঙ্কার ও লোভী। লোভ পরতন্ত্র চিত্ত দেব চিত্ত নহে। দেবতা আমাদের প্রায় দিয়াই থাকেন। ইংরাজ কেবল লন, দেন অত্যল্প। কাজেই ইংরাজ দেবতা নহেন। ইংরাজ বাহ্য জগৎ লইয়াই বিশেষ ব্যস্ত কাজেই তদপেক্ষা উচ্চ বিষয়ে ব্যাপৃত হিন্দুর চক্ষে ইংরাজ তেমন উচ্চ পুরুষ নহেন। আমরা ইংরাজকে সবিশেষ ভয় করি, তাহার সম্মান করি, কিন্তু তাহাকে পূজা, ভক্তি করিতে পারি না, করিতেও প্রস্তুত নহি।

ইংরাজের কার্য্য নাটক ভারতীয় কার্য্য নাটক হইতে শ্রেষ্ঠ নহে। হিন্দুর দর্শনের নিকট ইংরাজের দর্শন তেমন কোন কিছুই নহে। আমাদের নিজের কথা ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আমরা নিজে এ স্থানে কিছু বলিতে চাহি না। সার উইলেম্ জোন্স, ভিক্টার কুজিন, সেলেগেল, ম্যাকসমুলার এবং সোপেন্‌হোর প্রভৃতি পরম পণ্ডিতগণ আর্য্যদর্শন এবং হিন্দু ধর্ম্মের প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন। ম্যাকসমুলারের মতে আমাদের উপনিষদ অতি উচ্চ দর্শন শাস্ত্র। উপনিষদ নিহিত ধর্ম্ম অতীব হৃদয়গ্রাহী ও চিত্ততৃপ্তিকর। সোপেন্‌হোর বলিয়াছেন "উপনিষদ পাঠে যেরূপ চিত্তের উৎকর্ষ সাধিত হয় উপনিষদ অধ্যয়ন যেমন উপকারী এমন আর কোন কিছুই নহে। ইহা আমার জীবন মরণের সহায় শান্তি।" বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্য ইংরাজ গর্ব্ব করিয়া থাকেন। তাহার বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ,

বৈদ্যুতিক আলোক, মুদ্রা যন্ত্র, অনেক যুদ্ধের উপকরণ এবং আর আর অনেক মন্ত্র, তন্ত্র এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি ইংরাজ অপরাপর জাতীয়দের স্থানে পাইয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় স্মরণ করিলে, ইংরাজ প্রতি ভক্তি হইবার কারণ অল্পমাত্র থাকে।

তোমার কল্যাণার্থ পরিত্রাণ জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা হিন্দু পণ্ডিতগণ তোমাকে হিন্দুশাস্ত্র পদে অবনতশিরা হইতে অনুরোধ করিতেছেন। তুমি ইংরাজি শিক্ষায় গর্ব্বিত, তুমি বলিতেছ "আমি ভট্টাচার্য্যদের কথা মানি না।" আমরা বলিতেছি "ভাল! তা না শুনিতে, না মানিতে পার। তুমি পিতা মাতার কথা অগ্রাহ্য করিতে পার। কিন্তু তোমার য়ুরোপীয়দের, ইংরাজের, মার্কিনদের কথা শুনিবার বাধা নাই। তুমি সতত তাহাদের কথায় শ্রদ্ধা করিয়া থাক। এমন য়ুরোপীয় জাতি নাই যাহাদের ভাষায় গীতা অনুবাদিত হয় নাই। সে দিন সাইকাগো নগরীতে মার্কিনেরা বিবেকানন্দ স্বামীর হিন্দুধর্ম্মের কথার প্রতি কত না শ্রদ্ধা করিয়াছিলেন? প্রখ্যাত নাম্নী শ্রীমতী আনি বিশান্ত সে দিনকার কুম্ভ মেলায় প্রয়াগস্নানে আপনাকে পবিত্র করেন। সোপেনহোর প্রভৃতি পরম পণ্ডিতগণের প্রশংসাপত্র পূর্ব্বেই প্রদর্শিত করিয়াছি। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কথায় তোমার অশ্রদ্ধা হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার স্থানে শিক্ষালাভ করিয়া হিন্দু দায়ভাগাদি সম্বন্ধে কোলব্রুক সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা তোমায় অবিশ্বাস্য, অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।"

ইয়ঙ্ বেঙ্গল বলিতেছেন "হিন্দুশাস্ত্র মানিতে পারি, কিন্তু বামুন মানিতে পারি না। বামুনরা শঠ, ধূর্ত্ত, আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ইহারা একান্ত স্বার্থপর, ইংরাজের মত উদার নহে।।" ইংরাজ যেরূপ উদার তাহা তাহার দণ্ডবিধি ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি দ্বারা সুপ্রকাশ। এই স্থলে একটি কথার উল্লেখপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ধূর্ত্ত এবং স্বার্থপর কি না তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইব। অল্পদিন হইল কোন একজন দেশীয় উচ্চকর্ম্মচারীকে বহুসংখ্যক ভেড়ীওয়ালারা আক্রমণ করে। কর্ম্মচারী মহাশয়ের কোট্ হ্যাট্ পরা ছিল। আক্রমণকারীরা গুরুতর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে তিনি গলদেশ হইতে যজ্ঞসূত্রটি বাহির করিয়া ভেড়ীওয়ালাদের দেখান এবং তাহারা প্রহারে নিরস্ত হয় এবং বিপ্রের প্রাণ রক্ষা পায়। আমরা যতদূর

অধঃপাতে গিয়া থাকিনা কেন, এখন পর্য্যন্ত আমাদের চিত্ত ব্রাহ্মণে ভক্তি শূন্য হয় নাই। শূদ্রের অস্থি, মজ্জা, শোণিত মধ্যে কি এক পদার্থ আছে যাহার গতিকে বিপ্র সম্মুখীন হইলেই সে তাহাকে করযোড়ে প্রণাম করে তাঁহার পায়ে পা লাগিলে চরণস্পর্শ পূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি লইয়া থাকে। ইংরাজ প্রদত্ত কে, সি, এস, আই প্রভৃতি উপাধি ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতেব নিকট গণনীয় নয়।

মনুসংহিতায় দৃষ্ট হয় যে সেই "মহাদ্যুতি প্রভুর" মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। মুখ বাগ্ যন্ত্র। ব্রাহ্মণের মুখ হইতে বেদাদি শাস্ত্র বহির্গত, তাই ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মাব মুখজাত বলা হইয়া থাকিবে। যজন যাজন অধ্যাপন অধ্যয়ন, দান ও পরিগ্রহ এই ছয়টি ব্রাহ্মণেব কর্ম্ম। কৃষি বাণিজ্য যদ্দ্বারা অর্থাগম হইয়া থাকে তৎসমুদয় অন্য বর্ণের কার্য্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অধ্যাপনায় ব্রাহ্মণের প্রায় আয় ছিল না। অন্যথা পক্ষে ব্রাহ্মণকে স্বীয় শিষ্যগণের ভরণ পোষণ যোগাইতে হইত। যাজন ক্রিয়াতেও বিশেষ প্রাপ্তি ছিল না। প্রতিগ্রাহী বলিয়া তাঁহাব বিশেষ প্রাপ্তি থাকিলে ব্রাহ্মণ চিরভিক্ষুক বলিয়া অভিহিত হইতেন না। অনেক অপরাধের, পাপ কর্ম্মের শূদ্রাপেক্ষা ব্রাহ্মণের অতি কঠিন গুরুতর দণ্ড শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। অনুলোম বিবাহ এইক্ষণ নিষিদ্ধ হইলেও ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এবং শূদ্রা ব্রাহ্মণের যোগ্যা বলিয়া শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ছিল না। ইহার পর শাস্ত্রকাব ব্রাহ্মণগণকে শঠ ও স্বার্থপর বলা কতদূর সঙ্গত তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

পদ্মপুরাণ এবং মহাভারতে লিখিত আছেঃ—

> ন বিশেষো হস্তিবর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
> ব্রহ্মণাপূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতঃ॥

আরবেদরূপ গীতা বলিতেছেনঃ—

ব্রহ্ম দ্বারা পূর্ব্ব সৃষ্ট মনুষ্য সকল কর্ম্ম ও গুণ দ্বারা বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঋক্ বেদোক্ত কবস উলুষ ঋষি শূদ্র এবং বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। লোমহর্ষণ সূত জাতীয় হইয়াও ঋষিদিগের শ্রদ্ধেয় এবং তাঁহাদিগের দ্বারা মহাভারত ও পুরাণবক্তা পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এই সকল ব্রাহ্মণদিগের পরম উদারতার দৃষ্টান্ত। এই সমস্ত দৃষ্টে ব্রাহ্মণকে

কথন শঠ ও স্বার্থপর বলা যাইতে পারে না। কয়েক বৎসর হইল দ্বার ভাঙ্গা মহারাজের ম্যানেজার বাবু চন্দ্রশেখর বসু কলিকাতার কোন স্থানে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত প্রণয় বিষয়ে একটি অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা স্থলে ভট্টপল্লীর সুখ্যাত পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতান্তে শিরোমণি মহাশয় দাঁড়াইয়া বলেন "আজ হিন্দু রাজা থাকিলে আপনাকে ব্রাহ্মণ করিয়া লইতাম।" গুণানুসারে শূদ্রকে শ্রেষ্ঠতর জাতি মধ্যে তুলিয়া লইতে ব্রাহ্মণেরা যে প্রস্তুত, কথিত ঘটনা দ্বারা তাহাও প্রকাশ। ব্রাহ্মেরা যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দিবার উপদেশ দেন। এরূপ না করিয়া কর্ম্ম গুণানুসারে শূদ্রের যজ্ঞসূত্র ধারণের ব্যবস্থা করিলে তাহারা বুদ্ধিমানের কার্য্য করিবেন।

বেদের বিভক্তা ও অষ্টাদশ পুরাণের জনয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস স্বীয় জন্ম বৃত্তান্ত মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণে বিবৃত করিয়াছেন। ব্যাস দেব জননী সত্যবতী ক্ষত্রিয়া এবং ব্যাস দেবের জন্ম সম্বন্ধে কতকটা কুৎসা পরিলক্ষিত হয়। ইচ্ছা করিলে পরাশর পুত্র এ সমস্ত গোপন রাখিতে পারিতেন। কিন্তু সত্যানুরোধে নিজের নিন্দার কথা প্রকাশে যাঁহারা মুক্তকণ্ঠ তাঁহাদিগকে শঠ, ধূর্ত্ত বলা একান্ত অসঙ্গত। শাস্ত্রোদ্ঘাটন করিলে এইরূপ অন্যান্য দৃষ্টান্তও প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

স্বীয় পিতৃদেব যাহাতে সত্যপালনে সক্ষম হন, তজ্জন্য শ্রীরামচন্দ্র রাজত্ব পরিহার এবং বনগমন করেন। আপন সত্য রক্ষার্থে বলিরাজ এবং হরিশ্চন্দ্র পথের ভিখারী হন। দাতা কর্ণ স্বীয় সুতের শিরশ্ছেদন এবং যুধিষ্ঠির বনবাসাদি নানা ক্লেশ সহ্য করেন। সর্ব্বস্ব ত্যাগে সত্য রক্ষা করা উচিত, পুরাণ কর্ত্তা ব্রাহ্মণেরা কথিত বিবরণ সকল দ্বারা উপ দেশ করিয়াছেন। এই প্রকৃতির ব্রাহ্মণদিগকে শঠ বলা নিতান্ত অসঙ্গত।

ইংরাজ আমাদিগকে পরস্পর সমানুভূতি করিতে শিখাইতেছেন, দেশ বৎসল হইতে উপদেশ দিতেছেন। ইংরাজ এবং আমাদিগের মধ্যে মুসলমান এবং হিন্দুর মধ্যে সবিশেষ সমানুভূতি নাই। ইংরাজ ও মুসলমানের ধর্ম্ম, ভাষা এবং আচার ব্যবহার আমাদিগের হইতে পৃথক তাই এই অভাব। সামান্য সামান্য বিষয়ে প্রভেদ থাকিলে ও অনেক ভারতবাসীর এক হিন্দু ধর্ম্ম। অনেক ভারতবাসীই বেদ, তন্ত্র, মনু,

মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতির নিকট মস্তক অবনত করেন। সংস্কৃত ভাষাকে মধ্যবর্ত্তিনী রাখিয়া বাঙ্গালা ও হিন্দি প্রভৃতি ভাষা সকলকে প্রেমবদ্ধা সহোদরা রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় হিন্দু শাস্ত্র শাসন স্বীকারে ব্রাহ্মণ ও দেব গুরু পূজনে আমাদের মধ্যে সমানুভূতি সম্ভবে আমাদের প্রকৃত পবিত্রাণের উপায় হইতে পারে। ইংরাজের চরণ লেহন পরিবর্ত্তে যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বেদাদির সৃষ্টি ও সংগ্রহ এবং কেবল পরার্থ জীবন যাপন করিয়াছেন, আপন হিতার্থ মাত্র তাঁহাদের সম্মান, পূজা করিবার ক্ষতি কি? হিন্দুর, হিন্দু হওযা ভিন্ন রক্ষা ও পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। জাতীয় প্রকৃত বিরোধী ইংরাজি শিক্ষা দিন দিন আমাদের হৃদয়ে যে বিলাস ও বাসনানল প্রদীপ্ত করিতেছে কেবল আর্য্য হিন্দু শাস্ত্র তাহা প্রদমিত করিয়া আমাদের রক্ষা সাধন করিতে পারে।

শ্রীদীননাথ ধর।

ব্রহ্মজ্ঞান।

যে জ্ঞান দ্বারা মানব ব্রহ্ম কি তাহা অনুভব করিতে পারে, যে জ্ঞান প্রভাবে জীবের অন্তরে ব্রহ্ম জ্যোতির বিকাশ হইয়া থাকে তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। কিন্তু আজ কাল নব্য তন্ত্রীয় মহোদয়দিগের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান একটি কথার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সকলকেই এই গুরুতর বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে দেখা যায়, পথে ঘাটে, যেথানে সেথানে লোককে উপদেশ দিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বয়ং উপদেষ্টাই ইহার প্রকৃত অর্থ ও ভাব কারণ বুঝেন কি না সন্দেহ। সকলেই অধ্যাপক হইতে চাহেন, সুতবাং ব্রহ্মজ্ঞানটিকে তাঁহারা এরূপ ভাবে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছেন যেন তাহা অনায়াসসাধ্য; ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞান কথাটির সে মাধুর্য্যও অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। এই সকলের মূল কারণের অনুসন্ধান করিলে এই বুঝা যায় যে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই ইহার এক মাত্র কারণ। প্রকৃত জ্ঞান না হইলে ব্রহ্ম কি তাহা বুঝা সুকঠিন, সহজে তাহা কি উপলব্ধি হয় না এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হইলে মানবের মুক্তিলাভও হয় না। শাস্ত্রে বলেঃ—

"জ্ঞানাৎ সংযায়তে মুক্তি"

জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হয় এই জ্ঞান ধর্ম্ম যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সঞ্চিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। জনকাদি ঋষিগণ কর্ম্ম দ্বারা সিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। মহামতি শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকেও এই উপদেশ দিযা গিয়াছিলেন যেঃ—

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোক সংগ্রহ মে বাপি সংপশ্য কর্ত্তু মর্হসি॥
(গীতা, ৩। ২০)

অর্থাৎ জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধ সত্ত্ব হইযা সম্যক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, লোক সকলের স্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তোমারও কর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত, কেন না শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন তাহারই অনুসরণ করা বিধেয়। ফলতঃ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কর্ম্ম ত্যাগ করা অকর্ত্তব্য যেহেতু

"সদা ক্রিয়া প্রকর্ত্তব্যা ক্রিয়ায়াঃ সিদ্ধি মুত্তমাং
প্রাপ্নোতি সাধকঃ শ্রেষ্ঠ অতএব নচ ত্যজেৎ।"
(মুণ্ডমালা তন্ত্রম)

সাধকের সর্ব্বদা ক্রিয়াপর হওযা উচিত কারণ ক্রিযা দ্বারা বিশেষরূপে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে; সেই জন্য সাধক অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানাভিলাষীদিগের পক্ষে কর্ম্ম বিহীন হওয়া কোন রকমে যুক্তিসিদ্ধ নহে।

এক্ষণে দেখা যাক্ সেই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান কি? অধুনা সকল লোকই সংসারে জড়িত হইয়া নিজের পরিবারবর্গের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করা জীবনের এক মাত্র ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া থাকেন সকলেই স্বার্থতৎপর হইয়া নিজের নিজের সুখানুসন্ধানে বিব্রত।

"স্বকার্য্য সাধনে সর্ব্বে ব্যগ্রাশ্চ জগতীতলে।
ভাবাভাবং ন জানন্তি কেবলং স্বার্থতৎপরাঃ॥"
(ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ)

ফলতঃ বিষয়াসক্ত কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ ব্যক্তির পক্ষে প্রকৃত কর্ম্ম বা জ্ঞান লাভ হওয়া অসম্ভব। সাংসারিক পক্ষে জ্ঞানের সূক্ষ্ম পথ অনুসন্ধান

করা দুরূহ হইয়া পড়ে সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্ম আছেন এই সিদ্ধান্ত করিয়া "আমি ব্রহ্মজ্ঞ" ইহাই সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন; প্রকৃত জ্ঞান লাভ তাহাদের আর ঘটিয়া উঠে না। কারণ যাবৎ জীব কাম ও কামনাকে অন্তরে পরিপোষণ করেন তাবৎ তাহার অনিত্য বিষয়ে বিকার হওয়া অসম্ভব।

"ন জাতু কামঃ কামনা মুপ ভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে॥"

কাম ও কামনাকে যতই প্রশ্রয় দেওয়া যাইবে ততই তাহারা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় প্রবল হইয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে কিছুতেই তাহার নিবৃত্তি হয় না। সেই হেতু যাবৎ এই অবিদ্যারূপী মায়ার অনুচরগণকে পরাভূত করা না যায় তাবৎ জীবের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ আশা দুরাশা মাত্র। প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংসারের অনিত্য সুখ সকল বর্জ্জিত করিতে হইবে, কার্য্যনিপুণ, শুচি, সত্যভাষী, সংযতমনা ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কর্ম্মে তৎপর হইবে।

"দক্ষঃ শুচিঃ সত্যভাষী জিতচিত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অপ্রমত্তো নিরালস্যঃ মেধাবৃদ্ধো ভবেন্নরঃ॥"
(মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্)

কারণ কর্ম্ম ব্যতীত কোন জ্ঞান লাভ হয় না। শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছেন যে,

"—স্ববর্ণাশ্রম বর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ
কৃত্বা সমাসাদিতঃ শুদ্ধ মানসং।
সমর্প্য তৎপূর্ব্বমুপত্তি সাধনং
সমাশ্রয়েৎ সদ্গুরুমাত্ম লব্ধয়ে॥"
(রাম গীতা)

স্বীয় বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করত সেই সকল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া শুদ্ধচেতা হইবে পরে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। সদ্গুরু ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। সদ্গুরু পথপ্রদর্শক স্বরূপ তাহাকে চালিত করিবেন, প্রথমে শমদমাদি দ্বারা শিষ্যকে প্রবোধিত করিয়া পরে শুদ্ধ নির্ম্মল ব্যোম স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে বোধ করাইবেন।

"আদৌ শমদম প্রায়গুণৈঃ শিষ্যং প্রবোধয়েৎ।
পশ্চাৎ সর্ব্বমিদং ব্রহ্ম শুদ্ধং ত্বমিব বোধয়েৎ॥"

অনন্তর বেদাদি শাস্ত্র বিহিত শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা শরীর মন বুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা করিবে ; এবং

"বেদানুশাসনং যজ্ঞো ব্রহ্মচর্য্যংতপোদমঃ
শ্রাদ্ধোপবাস স্বাতন্ত্র্যমাত্মনা জ্ঞান হেতবঃ।"

যজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্যা, তপস্যা, ইন্দ্রিয় দমন, উপবাস, ব্রতাদি এই সকল দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিবে কারণ এই সকল আত্ম জ্ঞানের হেতু ইহা না হইলে চিত্ত সংযম হয় না, চিত্ত সংযম করিতে না পারিলে ব্রহ্ম চিন্তন হয় না, যেহেতু শাস্ত্রকারেরা বলেন "মানব মাত্রেই ভ্রমসঙ্কুল" ভ্রমে পতিত হইয়া সহজে আত্মজ্ঞান হারাইয়া ফেলে এবং অতি ঘৃণিত কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অতএব যাবৎ না ভ্রম তিরোহিত হয়, তাবৎ তাহার অজ্ঞান অন্ধকার দূর হইলে, যেমন ভানুর উদয়ে তমোরাশি বিনষ্ট হইয়া জগতে প্রতিভাত করে সেইরূপ জ্ঞানের আলোক প্রদীপ্ত হয়, এবং সমস্ত বৈষয়িক কামনা সকল দূর হইয়া অন্তর্দৃষ্টি প্রভাবে শান্তি ও মোক্ষ লাভ করেন। শাস্ত্রে বলে

"বিহায় কামান্ য সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥" (গীতা)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সমুদয় কাম্য বস্তু উপেক্ষা করিয়া নিস্পৃহ নিরহঙ্কার ও ভোগসাধনে মমতাশূন্য হইয়া প্রারব্ধবশে ভোগাদি করেন তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন। এবং

"যস্য বাঙ্মানসেশুদ্ধে সম্যগ্ গুপ্তেচ সর্ব্বদা।
সর্ব্বঃ সর্ব্বমবাপ্নোতি বৈদান্তোপগতং ফলম্॥"

যাহার বাক্য মন পরিশুদ্ধ ও সতত সংযত তিনি বেদান্ত প্রতিপাদ্য সর্ব্বপ্রকার ফললাভ করেন ; তাঁহার আর কিছুরই অভাব থাকে না। বিশুদ্ধান্তঃকরণ ব্রহ্ম-জ্ঞান-নিষ্ঠ ব্যক্তি ঈদৃশী পাইয়া সংসার মোহ প্রাপ্ত হন না ; মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থান করিতে পারিলে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন, তাহার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

করুণাময়ী।

সন্ধ্যা সমাগত, নিরাশ্রয় পথিক কোথায় যাইবে? এই ভাবনায় আকুল হইয়া চলিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিয়া একজন বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম "এখানে রাত্রিতে থাকিবার কোন স্থান আছে কি?" বৃদ্ধ আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া এবং একবার আমার হস্তস্থিত ব্যাগের দিকে তাকাইয়া কহিলেন "সে জন্য ভাবনা কি, আমার সঙ্গে আইস, আমি থাকিবার উৎকৃষ্ট স্থান দেখাইয়া দিব।" তখন সানন্দমনে বৃদ্ধের সহিত একটী সঙ্কীর্ণ পথে চলিতে লাগিলাম।

অনেকক্ষণ পর্য্যটনের পর চতুর্দ্দিক জঙ্গলাকীর্ণ একটী নির্জ্জন স্থানে উপনীত হইলাম। সেই স্থানে একটী প্রাচীন বটবৃক্ষতলে একটী মন্দির এবং তাহার পশ্চাতে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী দেখিতে পাইলাম। ঐ স্থানে প্রবেশের একটীমাত্র পথ আর চতুর্দ্দিক কণ্টকী লতাজঙ্গলে পরিবৃত। মন্দিরের সন্নিহিত হইলে বৃদ্ধ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া উঠিয়া কহিলেন "এই মন্দির কালিকা দেবীর মন্দির, তুমি উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া যেখানে ইচ্ছা শয়ন করিয়া থাক, প্রভাত হইলে তোমাকে সদর রাস্তা দেখাইয়া দিব। তোমার কোন ভয় নাই। তোমার ভাগ্য ভাল তাই আজ দেবীর চরণদর্শন করিতে পারিলে। তুমি থাক, আমি এখন চলিলাম, তোমার আহারের জন্য দেবীর প্রসাদ কিছু পরে পাঠাইয়া দিব।" এই বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন।

নির্জ্জন স্থানে দেবমন্দির দেখিয়া হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। সন্নিহিত পুষ্করিণীতে হস্তপদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক ভক্তিভাবে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। করালবদনার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়াকুল চিত্তে নয়ন নিমীলিত করিলাম, আবার দেখিলাম বিশাল-রসনা, বিকটদশনা, আরক্তিমলোচনা, খড়্গধারিণী, মুণ্ডমালিনী ভীমা পতিবক্ষে সমারূঢ় হইয়া সন্ত্রাস উৎপাদন করিতেছেন। স্তম্ভিত হইয়া এক-পার্শ্বে বসিয়া দেবীর চরণপ্রান্তে চাহিয়া রহিলাম—সে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির দিকে

তাকাইতে আর সাহস হইল না। মন্দিরের ভিতর একটী ক্ষীণালোক জ্বলিতেছিল তাহাতে অন্ধকার নিরাকৃত না হইয়া সেই ভীম মূর্ত্তিকে কতক প্রচ্ছন্ন রাখিয়া স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। একটী ভ্রমর গুণ গুণ করিয়া স্পর্দ্ধাসহকারে বিচরণ করিতেছিল, সহসা দেবীর ললাটে আঘাত-প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিপতিত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। ভাবিলাম এ সংহারিণী মূর্ত্তির নিকট কাহারও নিস্তার নাই। আমিও ত স্পর্দ্ধাসহকারে মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছি, আমারও দশা কি ভ্রমরের দশা হইবে। ভাবিতে ভাবিতে শরীর রোমাঞ্চ হইল। কাতরভাবে কহিলাম "মা বিশ্বজননি! তোমার এ আকৃতি—এ বেশ শোভা পাইবে কেন? এই বিশ্বপ্রপঞ্চ রচনা করিয়া আবার তাহা সংহার করিতে উদ্যত—তোমার এ ভাব বুঝিবার সাধ্য আমার নাই। সন্তানের নিকট তোমার এ ভীষণ আকৃতি মানিবে কেন? একবার করুণাময়ী মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া আমাকে অভয়দান কর, তোমার আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া যাই।" তদনন্তর কাতর-নয়নে ভক্তিভাবে দেবীর দিকে তাকাইলাম। সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। বোধ হইল যেন দেবী অট্টহাস্য করিয়া লোলজিহ্বা বিস্তার করত হস্তস্থিত খড়্গ দ্বারা আমার শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক তাহা ধারণ করিতে উদ্যত। ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল; নয়ন নিমীলিত করত কম্পিতকলেবরে কহিলাম "মা তোমার চরণে জীবন সমর্পণ করিলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর।" ক্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল এবং অচিরাৎ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

সহসা বোধ হইল মন্দির যেন অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইল। সেই আলোক সমুজ্জ্বল করিয়া দেবী ভগবতী জগদ্ধাত্রীরূপে সমাসীনা হইলেন। করালবদনা অন্তর্হিত হইলেন, দেবী জগদ্ধাত্রী আনন্দময়ীরূপে মন্দিরের অভ্যন্তরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। আমি যে মূর্ত্তি দেখিব বলিয়া কত কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলাম, সেই মূর্ত্তির বিকাশ দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, সে আনন্দবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, আমি চকিতের মধ্যে উঠিয়া বসিলাম এবং নয়ন উন্মীলন করিবামাত্র মন্দিরের অস্পষ্ট আলোকে সম্মুখে এক রমণী মূর্ত্তি দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলাম। কেমন আপনা হইতেই আমার করযুগল অঞ্জলিবদ্ধ হইল,

কেমন আপনা হইতেই আমি কাতরভাবে কহিলাম "মা জগদ্ধাত্রি! আমি তোমার চরণে আশ্রয় লইলাম, মা আমাকে রক্ষা কর।" রমণীর নয়নযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হইল, তিনি মধুর স্বরে বলিলেন "তুমি শীঘ্র আমার সঙ্গে বাহিরে আইস, তোমার জীবন সঙ্কটাপন্ন, আর দেরি করিও না।" আমি ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং অনতিবিলম্বে রমণীর সহিত মন্দিরের বাহিরে আসিলাম। রমণী কহিলেন "পলায়নের আর সময় নাই, তুমি ঐ পুষ্করিণীর মধ্যে নামিয়া পদ্ম পাতার নিকট গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়া লুকাইয়া থাক, বিপদ গেলে আমি যাইয়া তোমাকে উঠাইয়া আনিব। খুব স্থিরভাবে থাকিবে, যেন কেহ টের না পায়।" এই বলিয়া রমণী পুষ্করিণীর একটী অংশ আমাকে দেখাইয়া চকিতের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। আমিও তাঁহার আদেশ মতে পুষ্করিণীতে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়া কয়েকটী বৃহৎ পদ্ম পত্রের অন্তরালে লুকাইয়া রহিলাম।

অনতিবিলম্বে মন্দিরের প্রাঙ্গণভূমি হইতে "জয় কালী! জয় কালী!" শব্দ উত্থিত হইল। ক্রমে মন্দিরের ভিতর সেই ধ্বনি ভীষণরূপে প্রতিধ্বনিত হইল, পরক্ষণেই সকলে নীরব হইল। তখন শুনিতে পাইলাম "সর্ব্বনাশ হয়েছে, লোকটা পালিয়েছে।" কিয়ৎক্ষণপরে কয়েকজন ভীষণাকৃতি পুরুষ এক হস্তে মশাল ও এক হস্তে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক পুষ্করিণীর চারি পাড় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল পরে পুষ্করিণীর জলভাগও পরীক্ষা করিয়া দেখিল। মনে ভাবিলাম এইবার আর রক্ষা পাইব না। ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। নিতান্ত ভাগ্য গুণে আমি তাহাদের কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িলাম না। তাহারা সকলে নিরাশমনে চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বৃদ্ধের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইলাম। বৃদ্ধ কহিল "লোকটার ব্যাগ দেখিতেছি না, সে হয় ত অনেকক্ষণ পালিয়ে গেছে। আমার বুদ্ধির দোষে এই অনর্থ ঘটিল—আমি যদি সেই সময়ে কাজ নিকাশ করিয়া যাইতাম তবে আর বিপদ হইবে কেন? লোকটা হয়ত এতক্ষণ সদর রাস্তায় যাইয়া পড়িয়াছে, শীঘ্র যাইয়া ধরা যাক্, ধরা না পড়িলে আমাদের কাহারও রক্ষা নাই।" ইহার পর আর কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম না, স্থানটী নীরব হইল।

যখন বিপদাশঙ্কা কমিল, তখন সেই রমণীর কথা মনে পড়িল।

এ ভুবনমোহিনী কে? এ রজনীতে এ ষোড়শী এখানে কিরূপে আসিলেন। না, না, ইনি মানবী নহেন, ইনি জগদ্ধাত্রী। আজ আমার জীবন ধন্য হইল, আমি স্বচক্ষে দেবীর অভয়চরণ দর্শন করিলাম। তখন অশ্রুপূর্ণনয়নে কাতরভাবে কহিলাম—"মা আমায় রক্ষা কর, আমার শরীর শীতার্ত্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাণ বায়ু নিঃশেষ হইবে, এই বেলা রক্ষা কর।" সেই বিষম রজনীতে নিদারুণ শীত পড়িয়াছিল, তাহার উপর প্রায় এক ঘণ্টাকাল জলে মগ্ন থাকায় আমি মৃতকল্প হইলাম। অবশেষে মা বলিয়া চীৎকার রোদন করত বিচেতন হইয়া পড়িব এমন সময়ে কে যেন আমাকে ধরিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সাহস পাইলাম, দেখিলাম দেবী আসিয়া আমার হস্ত ধারণ করত আমাকে তীরের দিকে লইয়া যাইতেছেন। আমি পুষ্করিণীর বকচরে যাইয়া বসিলাম, কিন্তু উঠিতে পারিলাম না। রমণী স্বীয় অঞ্চলে আমার শরীর উত্তমরূপে মুছাইয়া একখানি কম্বল আনিয়া দিলেন, তদ্দ্বারা শরীর আবৃত করত আমি তথায় শুইয়া পড়িলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম আমার পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল, সেই আলোকে দেবীর প্রসন্নবদনের পবিত্র মাধুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণকমল ধারণ করত "মা, মা, মা" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, অন্য কোন বাক্যস্ফুরণ হইল না। করুণাময়ীর নয়নযুগল হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। আমি ভক্তিভাবে সেই চরণযুগলে মস্তক স্থাপন করিলাম। দেবী কহিলেন "আর বিলম্ব করিলে চলিবে না, এখনও বিপদ যায় নাই। তুমি একবার উঠিতে চেষ্টা কর।" আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলাম। দেবী কহিলেন "তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইব।" এই বলিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

তদানীন্তন আমার মনে যে ভাব হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। ভক্তি, বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইল। আমায় যেন বাল্যকাল ফিরিয়া আসিয়াছে, আমি কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর অনুসরণ করিতেছি। জননীর চরণযুগল দেখিব বলিয়া প্রাণ ব্যাকুল, কিন্তু অন্ধকারে অথবা আমার দুষ্কৃতিনিবন্ধন সে সৌভাগ্য ঘটিল না। তথাপি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিয়া ভক্তিপূর্ণ

হৃদয়ে ছায়াময়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। নয়নধারার নিবৃত্তি হইল না।

কিয়দ্দূর গমনের পর পার্শ্বস্থিত জঙ্গল হইতে রমণী আমার ব্যাগটী বাহির করিয়া নিজে বহন করিয়া চলিতে লাগিলেন। আমি বিস্মিতভাবে কহিলাম "মা এ ব্যাগ এখানে আসিল কিরূপে, আমাকে দিন্, আমি লইয়া যাইতেছি।" দেবী কহিলেন "জগদম্বার প্রসাদে তোমার কোন ক্ষতি হয় নাই ও হইবে না, তিনিই তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন ও করিবেন।" আমি সে মধুর কথা শুনিয়া ভক্তির আবেগে মায়ের চরণযুগলে পড়িয়া গেলাম, কাতরভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলাম "মা। আমি ঘোর পাপী, আমার উপর তোমার এত দয়া হইবে তাহা স্বপ্নের অগোচর।" দেবী স্নেহভরে কহিলেন "এত কাতর হইতেছ কেন? এখনও বিপদ যায় নাই। বিলম্ব করিও না, শীঘ্র শীঘ্র আমার সঙ্গে আইস। আমি আর তোমার কি করিলাম? তুমি নিজের পুণ্যফলে রক্ষা পাইয়াছ।" তদনন্তর আবার চলিতে লাগিলাম। পথ আর ফুরায় না। অনুমানে বুঝিলাম প্রায় দুই ক্রোশ আসিয়াছি। জঙ্গলের মধ্য দিয়া অন্ধকার রজনীতে কত সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যে কোথায় যাইতেছি তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে একটী নদীর তীরে প্রকাণ্ড রাস্তায় আসিয়া উপনীত হইলাম। রমণী সজলনয়নে স্নেহবচনে কহিলেন "বাবা! আর ভয় নাই, জগদম্বার কৃপায় তোমার জীবন রক্ষা হয়েছে। আমার একটী কথা তোমাকে শুনিতে হইবে। যে স্থানে বিপদে পড়েছিলে তাহার অনুসন্ধান কখনও করিও না, এবং যাহারা তোমার প্রাণনাশে উদ্যত হয়েছিল তাহাদের অনিষ্টের চেষ্টা করিও না। আমি চলিলাম। রজনীর ব্যাপার ভুলিয়া যাও, কিন্তু বাবা! জগদম্বাকে কখনও ভুলিও না।" আমি আকুলভাবে তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলাম "মা তুমি আমার জগদম্বা, আজ আমার জীবন রক্ষা করিলে, যেন অন্তিমে মা তোমার চরণে স্থান পাই। মা আমাকে তোমার পরিচয় দিতে হইবে, আমার মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া দেও। মা তুমি দেবী না মানবী? মা আমি কি আবার তোমার দেখিতে পাইব?" রমণী সকরুণস্বরে কহিলেন "বাবা! আমার নাম করুণাময়ী, আমি দেবী জগদম্বার দাসী, আমার সহিত তোমার হয়ত ইহলোকে

আর দেখা হইবে না, আমি আর কোন পরিচয় দিব না, আমি চলিলাম।” এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে সেই নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া নিমেষমধ্যে অলক্ষিত হইলেন।

সেই রজনীতে আমি আর একপদ অগ্রসর হইতে পারিলাম না। সেই স্থানে বসিয়া মাতৃহীন সন্তানের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলাম। করুণাময়ীর সেই যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, ইহজীবনে আর তাহা বিস্মৃত হইতে পারিলাম না।

পথিক।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। Aryan Traits, Part I. by Babu Kailas Chandra Mukhopadhyay, M.B., Physician, Chinsurah Hooghly. পুস্তকখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। ইহাতে হিন্দুর আচার ব্যবহার এবং অন্যান্য অনেক কথার উল্লেখ আছে। এ দেশের ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে ইংরাজদের যে ভ্রান্তি আছে তাহাই বিশদরূপে দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। এই পুস্তক পাঠে অনেক ইংরাজেরই ভ্রম দূর হইবে। গ্রন্থকারের যে নানা বিষয়ে দর্শন আছে তাহার পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এইরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইলে, আমাদের অধিকতর আনন্দের বিষয় হইত।

২। মনোভাব। শ্রীযুক্ত মোহিতচন্দ্র রায় প্রণীত। হুগলী সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা মুদ্রিত। হুগলী ছাত্র-সমিতি ও বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৵০ আনা মাত্র। ডাক মাশুল ১০। উক্ত যন্ত্রে প্রাপ্তব্য। এই খানি গদ্য পদ্যময় গ্রন্থ। কবিতাগুলি সুরচিত এবং সুখপাঠ্য হইয়াছে। গদ্যে যে মনোভাব অঙ্কিত করা হইয়াছে—তাহাতে বৈরাগ্যের ঔদাসীন্যের সহিত ধর্ম্মের প্রফুল্লতার মিলন আছে। এরূপ পুস্তক সকলেরই আদরণীয় হওয়া কর্ত্তব্য।

পূর্ণিমার মূল্য প্রাপ্তি।

সন ১৩০০ সাল।

বাবু চিন্তামণি মুখোপাধ্যায়, কাশী।
,, জগৎপ্রিয় ভট্টাচার্য্য, হুগলি।
,, ললিতমোহন দাস, ময়মনসিং।
,, মতিলাল দাস, খুলনা।
,, হীরালাল হালদার, হুগলি।
,, প্যারীলাল চৌধুরী, সিলেট।
,, লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, চুঁচুড়া।
,, রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলি।
,, যুগোলকিশোর পাল, ঐ
,, হরিপদ মুখোপাধ্যায়, ঝান্সী।
বাবু প্রমথচন্দ্র কর, কলিকাতা।
,, রাজেন্দ্রলাল মজুমদার, হুগলি।
,, সাতকড়ি ঘোষ, দ্বারবাসিনী।
,, কুমার বসন্তকুমার রায়, কলিকাতা।
,, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হুগলি।
, নীলমাধব মজুমদার, ঐ
,, ত্রিপুরাচরণ বিশ্বাস, কলিকাতা।

ক্রমশঃ।

সন ১৩০১ সাল।

বাবু চিন্তামণি মুখোপাধ্যায়, কাশী।
,, মতিলাল দাস, খুলনা।
,, অখিলচন্দ্র বসু, ক শী।
,, রাখালদাস শূর, বাঁকিপুর।
,, সি, চক্রবর্ত্তি, গৌরীপুর।
,, বটকৃষ্ণ প্রামাণিক, হুগলি।
শ্রীমতী কিরণময়ী দাসী, উত্তরপাড়া।
বাবু নরেশচন্দ্র সেন, কলিকাতা।
,, তারাপদ ঘোষ, কলিকাতা।
,, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গুপ্তিপাড়া।
,, অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঝান্সী।
,, ছোট লালবিহারী বড়াল, হুগলি।
বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুস্তফী, চুঁচুড়া।
,, পূর্ণচন্দ্র আঢ্য, চুঁচুড়া।
,, মতিলাল মুখোপাধ্যায়, মেদিনীপুর।
কুমার গিরীন্দ্র দেব, হুগলি।
বাবু রাধাকান্ত রায়, ঐ
রায় ললিতমোহন সিংহ, শিবপুর।
বাবু নিত্যসখা মুখোপাধ্যায়, বালেশ্বর।
,, অমূল্যনাথ চৌধুরী, চুঁচুড়া।
,, হীরালাল বসু, বুটীয়াবাজার।
রাণী বামাসুন্দরী দেবী, চুঁচুড়া।
বাবু যোগেন্দ্রনাথ রাহা, কলিকাতা।
,, গোকুলচন্দ্র মণ্ডল, চুঁচুড়া।
,, কেদারনাথ মেটে, হুগলি।

ক্রমশঃ।

সীতাচরিত।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল প্রণীত।

মূল্য ||০ আনা

ডাকমাশুল——১০

১৮৯৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে পাঠ্য পুস্তকের তালিকা বাহির হইয়াছে তাহাতে এই পুস্তক মধ্যবৃত্ত বালিকা বিদ্যালয় সমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইযাছে।

সংবাদ পত্র সমূহ কর্ত্তৃক বিশেষ প্রশংসিত।

অতি সরল ও পরিশুদ্ধ ভাষায় এই অপূর্ব্ব জীবন ইহাতে লিপিবদ্ধ হইযাছে। পড়িতে পড়িতে স্থানে স্থানে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। পুস্তক খানি স্কুলের তালিকাভুক্ত হওযার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষে এ পুস্তকের ন্যায় পাঠ্য পুস্তক বাঙ্গালায় বিরল।

নব্যভারত।

এরূপ পুস্তক আমাদের দেশে অতীব বিরল।——সোমপ্রকাশ।

এই পুস্তক হুগলীতে গ্রন্থকারের নিকট ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন।

হুগলীর চকে সাবিত্রী যন্ত্র নামে একটী ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী বহু প্রকার নূতন অক্ষর আছে এবং কলিকাতার দরে পুস্তকাদি ছাপান হইতেছে। বিশেষ সুবিধা এই, গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে, প্রুফ সংশোধনের ভার রীতিমত লওয়া হইয়া থাকে। চিঠিপত্র চেক দাখিলা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জবওয়াক সুলভ মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে ছাপান হইয়া থাকে। আমাকে লিখিলে বিশেষ বিবরণ সকলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল

ম্যানেজার

হুগলী।

ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

২য় ভাগ—৭ম সংখ্যা। কার্ত্তিক—১৩০১।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সূচী।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

হুগলী,
সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কার্ত্তিক—১৩০১।

এই সংখ্যার মূল্য ৵১০ [illegible]

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হয়। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়াছেন। যাহাতে ইহা স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন আছে। এই পত্রিকা যাহাতে সকলেব সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পাবেন তজ্জন্য ইহাব অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায ডাক মাসুল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যেব কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনার জন্য পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

বিজ্ঞাপন।

হুগলীর চকে সাবিত্রী যন্ত্র নামে একটী ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী বহু প্রকার নূতন অক্ষর আছে এবং কলিকাতার দরে পুস্তকাদি ছাপান হইতেছে। বিশেষ সুবিধা এই, গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে, প্রুফ সংশোধনেব ভার রীতিমত লওয়া হইয়া থাকে। চিঠিপত্র চেক দাখিলা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জবওয়ার্ক সুলভ মূল্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাপান হইয়া থাকে। আমাকে লিখিলে বিশেষ বিবরণ সকলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
ম্যানেজার।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় ভাগ। } কার্ত্তিক, সন ১৩[illegible]১ সাল। { ৭ম সংখ্যা।

হিমাচল।

৩। ৺ গহনা হ্রদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

হিমাচল সম্বন্ধীয় অনেক কথা যুগপৎ উপস্থিত হওয়ায় কোন‌্টি ছাড়িয়া কোনটি বলি ইহাই সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। অদ্য গহনা কাহিনী শেষ করিব, ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু আনুসঙ্গিক দুই একটি কথাও না বলিলে চলিতেছে না।

হিমাচলের প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম দেশের সাধারণ লোকের হিমালয সম্বন্ধে অনেকানেক ভ্রমাত্মক ধারণা আছে, গহনা প্রসঙ্গে আমার একথা অতি বিশদরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সাধারণ লোকের ত দূরের কথা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সহযোগীদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও দুর্ভাবনা হইয়াছিল যে, একে গঙ্গার স্থিতিকাল ফুরাইবার কথা রটিতেছে, এমন সময়ে গঙ্গা যদি গহনা হইতে অন্য পথে চলিয়া যান, অর্থাৎ দেবপ্রয়াগ, হরিদ্বার, কাণপুর, এলাহাবাদ, বারাণসী, মুঙ্গের প্রভৃতির প্রচলিত প্রবাহ শুষ্ক হইয়া যায় (!)—তাহা হইলে পতিতোদ্ধারের কাজটা কাহাকে দেওয়া যাইবে। অনেক গবেষণার পর নূতন স্রোতকে এক্টিনী দেওয়া সাব্যস্ত করিয়া সম্পাদকীয় সর্ব্বজ্ঞমস্তিষ্ক কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল দেখিয়া আমরা সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম। পূর্ণিমার পাঠকগণ ইঁহাদিগের দুশ্চিন্তা দেখিয়া নিশ্চয়ই হাসিয়াছেন।

ওদিকে কিছুদিন পূর্ব্বে দেশীয় চালিত ইংরাজী বাঙ্গালা সংবাদপত্র মহলে একটা হুলস্থূল ব্যাপার চলিতেছিল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পাস করা একটি বাবু হিমগিরি শিখরে কি প্রকারে সিদ্ধাশ্রম নামক পুণ্যাশ্রমের আবিষ্কার করিয়াছেন তাহারই কলম্বাসী ধরণের বিস্তৃত বিবরণের পত্র হইতে পত্রান্তরে লোফালুফি চলিতেছিল। এই আবিষ্কার প্রসঙ্গে অক্সফোর্ডী মহাশয় আমাদিগকে অনেক নূতন কথা শিখাইয়াছেন, সেগুলি কোনও সময়ে প্রিয় পাঠককে উপহার দিব ইচ্ছা আছে, অদ্য প্রস্তাবনা হইয়া রহিল মাত্র।

আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে কেহ বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদক হইতে ইচ্ছুক আছেন কি? যদি থাকেন, আমি তাঁহাকে কিছুকাল দরজীর দোকানে—বিশেষতঃ যেখানে বাউলেব সাজ তৈয়াব হয়, শিক্ষানবিশী করিতে পরামর্শ দিই। সেখানে সম্পাদকের প্রাণধন, অনেকের অনন্য শরণ্য কাঁচিরূপ মহাস্ত্রের যথাযথ ব্যবহার শিক্ষা করিয়া তবে তাদৃশ উচ্চ পদবী প্রতি সলালস দৃষ্টি সঞ্চালনে অধিকারী হইতে পারিবেন। বরং ডাক্তার ষ্টেথেস্কোপ বিহনে, মাষ্টাব "কি" ব্যতিরেকে, এঞ্জিনিয়ার মোলেস্ওয়ার্থ বিনা, আর নব্য গ্রন্থকার উপহারের সূক্ষ্মজাল না পাতিয়া স্বীয় স্বীয় ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন, তথাপি হে কাঁচি! তুমি প্রসন্না না হইলে সম্পাদকত্ব নিতান্তই অ-চল। সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণ অবশ্যই দেখিতে পাইয়াছেন, আমাদের গহনার বিবরণ "ঘোণা" নামে গা ঢাকা দিয়া কর্ত্তাদের ঘানিগাছ নিঃসৃত ভ্রমনির্য্যাস কলুষিত হইয়া কেমন বেমালুম ও বিক্ষিপ্তভাবে বাউলের সাজ বিশেষের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। বলিহারি খলিফাগিরি!

গহনা হ্রদ কি প্রকারে "গঙ্গালাভ" করিল সে পুরাতন কথা এখন সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই, সুতরাং অতি সংক্ষেপে বলিতেছি।

শ্রাবণ মাসেই বাঁধ ভাঙ্গিত, কিন্তু বাঁধের গা দিয়া এত অধিক পরিমাণে জল চুঁইয়া পড়িতেছিল যে হ্রদের জলের যে হিসাবে বাড়িবার সম্ভাবনা ছিল, সে হিসাবে বৃদ্ধি হয় নাই। এই জন্য আনুমানিক সময়ের প্রায় এক পক্ষ পরে ১১ই ভাদ্র তারিখে বাঁধ ভাঙ্গিয়াছিল। হ্রদের জল যাবৎ উপরে না উঠিয়াছিল বাঁধ ততক্ষণ অটলভাবেই দণ্ডায়মান ছিল।

ভাগ্যহীন হ্রদের অন্তিমকাল জন্ম সময় অপেক্ষাও সমধিক ভীতিব্যঞ্জক হইয়াছিল। কয়েক দিন ধরিয়া অনবরত বৃষ্টি হইতেছিল। আকাশের মেঘ আর হ্রদোত্থিত কুজ্ঝটিকা উভয়ে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল। ১০ই ভাদ্র শনিবার, নন্দোৎসবের রাত্রি, সেদিন আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়াছিল। আজ গহনা রঙ্গমঞ্চে প্রকৃতি দেবীর অতি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি প্রকটিত। মধ্যে মধ্যে বিকট নির্ঘোষে বজ্রপাত হইতেছে, সহচরী ক্ষণপ্রভার অট্টহাসি মধ্যরজনীর গাঢ় অন্ধকারকে গাঢ়তর প্রতীয়মান করিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে উন্নতস্কন্ধ পর্ব্বতাঙ্গ হইতে স্বস্থানভ্রষ্ট প্রস্তরখণ্ড সমূহ ভৈরবনাদে হ্রদগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া বৃষ্টিবিক্ষোভিত বারিরাশিকে তরঙ্গাকুল করিতেছে। এমন সময়ে অকস্মাৎ কৃষ্ণানবমীর প্রায়ার্দ্ধচন্দ্র মেঘান্তরাল হইতে নিমেষার্দ্ধের নিমিত্ত মুমূর্ষু হ্রদের ম্লান হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইল, সূতিকাগারস্থ আসন্নকাল শিশুটি যেন একবার এ জন্মের মত শেষ "দেয়ালা" করিল, নির্ব্বাণোন্মুখী দীপশিখা যেন নিবিবে বলিয়াই দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, ওদিকে সহসা এঞ্জিনিয়ারগণপ্রতিষ্ঠাপিত সাঙ্কেতিক ঘণ্টা * গভীরে অথচ ধীরে ধীরে বাজিয়া উঠিল—খৃষ্টানদিগের প্রেতভূমির অন্ত্যেষ্টি সূচক ঘণ্টারবের ন্যায় উহার প্রতিনির্ঘোষে শ্রোতৃমাত্রেরই হৃদয়ের সাহস ও দার্ঢ্য ঝলকে ঝলকে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কি ভীষণ মুহূর্ত্ত! আর কেন? সকলে বল, "হরি হরি বোল, হরি বোল"! নিমেষ মধ্যে বাঁধের উপর হইয়া জল চলিতে আরম্ভ হইল।

বাঁধ ধ্বসিল না, কিন্তু জলস্রোতে শীঘ্র শীঘ্র কাটিয়া যাইতে লাগিল। পশ্চাতে বিপুল জলরাশি, সুতরাং অল্পক্ষণ মধ্যেই বিরহী বহিয়া প্রলয়স্রোতঃ নক্ষত্রবেগে ছুটিতে লাগিল। কল্লোলকোলাহলে দূরদূরান্তর পর্য্যন্ত মানব ও তদেতর জীবগণ প্রমাদ গণিয়া জাগিয়া উঠিল। অনেকের তখনও চক্ষে নিদ্রার আবিলতা, তখনও বুঝিতে পারে নাই কি হইয়াছে। দাহ্যমান গৃহশায়িত ব্যক্তি সহসা সুপ্তোত্থিত হইয়া যেরূপ ইতিকর্ত্তব্যতাবিধানে নিতান্ত অপারগ হয়, সকলেরই সেইরূপ অবস্থা।

---

* এই ঘণ্টা এরূপ কৌশলে রক্ষিত হইয়াছিল যে বাঁধের উপরিভাগ পর্য্যন্ত জল উঠিলেই তরঙ্গহিল্লোলে বাজিতে থাকিবে। এইরূপ কৌশল ব্যতিরেকে হ্রদের তাৎকালিক অবস্থা জ্ঞাত হইবার অন্য উপায় ছিল না।

পার্ব্বতীয় অংশে প্রতি ঘণ্টায় অন্যূন ২০ ক্রোশ হিসাবে জল চলিয়াছিল। গভীরতা দূরত্বের বিপর্য্যানুপাতে দ্বিশত হস্ত হইতে পঞ্চবিংশতি হস্ত পর্য্যন্ত হইয়াছিল। যেখানে গভীরতা অল্প, সেখানে আবার পরিসরাধিক্য। পাঠক একবার বঙ্গীয় গঙ্গার সহিত এই বিরাট জলস্রোতের তুলনা করিয়া দেখুন। হুগলী ও কলিকাতার মধ্যে কোথাও ২০ হাতের অধিক গভীরতা আছে কি না, আর প্রবল বন্যার সময় প্রতি ঘণ্টায় ৪ ক্রোশের অধিক স্রোতবেগ হয় কি না, সন্দেহের বিষয়। জলস্রোতঃ বলিতেছি, কিন্তু কর্দ্দমস্রোতঃ বলাই উচিত। আমরা দেশে যে বন্যার জল দেখিতে পাই, সে ত ইহার তুলনায় 'স্ফটীকজল'। উপরিভাগ মাত্র দেখিয়া জল বা কর্দ্দম স্থির করা নিতান্ত সহজ ছিল না। ভাসমান লতাগুল্মদ্রুমরাজি, গো, মেষ, মৃগ, মহিষ ও কপি, দ্বীপি, ব্যাঘ্র, ভল্লূকাদি জীবগণ, গৃহাদির ভগ্নাবশেষ এবং দেবমন্দির সমূহের কারুকার্য্যখচিত কবাট, গবাক্ষ, চূড়াদণ্ড ও কাষ্ঠস্তম্ভ প্রভৃতি স্রোতোবক্ষ ছাইয়া তীরবেগে ছুটিতেছিল। প্রকৃতির সেই গতিশীল মহাশ্মশান যিনি স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন তাঁহার সে ভীষণ দৃশ্যের সম্যক উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব।

ধ্বংসকার্য্য রাত্রির মধ্যেই প্রায় নিঃশেষিত হইল। গহনা গ্রামের কিয়দংশ ভাসিয়া গিয়াছে। চামোলী, নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, শ্রীনগর, দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি স্থানের গৃহাদির চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট নাই; কেবল শ্রীনগরের দুইটি মাত্র দেবমন্দির অতি আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছে। দেবপ্রয়াগের পুলের ভিত্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত। ব্যাসঘাট ও হৃষীকেশের কতক কতক গৃহাদি ভাসিয়া গিয়াছে। শেষোক্ত স্থানের অন্যতম গৌরব স্বরূপ বিখ্যাত চন্দ্রেশ্বর মন্দির প্লাবন কবলিত হইয়াছে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ধনকুবের সুরযমল ঝুন্ঝুন্ওয়ালার অন্যতম কীর্ত্তিকেতু লছমন ঝোলার পুল প্লাবনপীড়নে বিধ্বস্ত হইয়াছে। পরদিন (১১ই ভাদ্র) বেলা এক প্রহরের সময় হরিদ্বারে বন্যা আসিল সহরের উপর দিয়া প্রায় ৪ হাত জল চলিয়া গেল, লোকের গৃহপ্রাঙ্গণ বালুকা ও কর্দ্দমে পরিপূরিত হইল, নদী সন্নিহিত গৃহাদির ও কয়েকটি পুলের অল্পাধিক হানি হইয়াছে। কনখলে ও ঐরূপ অল্পাধিক অনিষ্ট হইয়াছে। তন্নিম্নে, অর্থাৎ সমতল প্রদেশে কোথাও উল্লেখযোগ্য অনিষ্টপাত হয় নাই। জলস্রোতঃ অল্পে অল্পে

বাঁধের কিয়দংশ মাত্র কাটিয়া ধীরে ধীরে বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছিল, হ্রদের সমস্ত জলরাশি একেবারে আসিতে পারে নাই; নতুবা আরও অধিক অনিষ্ট হইত, ইহা বলাই বাহুল্য।

এ স্থলে গবর্ণমেণ্টের সুবন্দোবস্তের সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। রাজপুরুষদিগের সতর্কতাগুণে সকলেই প্রাণে বাঁচিয়াছে। স্থানে স্থানে কার্য্য বিশেষে বেশ একটু রহস্যও আছে। শুনিতে পাই, মিরাট, সাহারণপুর প্রভৃতি জেলার গ্রামে গ্রামে দুই টিন করিয়া কেরোসিন তৈল দেওয়া হইয়াছিল, আর গ্রামের দুই প্রান্তে কাষ্ঠাদি স্তূপাকৃত করিয়া রাখিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। বন্যার সূচনা জানিবা মাত্র গ্রাম-বাসিগণ কাষ্ঠস্তূপে কেরোসিনের সাহায্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে, এই অগ্নি দর্শনে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোক সতর্ক হইবে এবং আপন আপন স্তূপে ঐরূপে আগুন লাগাইবে, এইরূপে সত্বরই সমগ্র জেলার লোক বন্যার আগমনবার্ত্তা অবগত হইবে, এবম্বিধ একটা বিরাট আয়োজন হইয়াছিল। বাঁধটি "বে-রসিক" ভাবে অল্পে অল্পে ভাঙ্গায় কর্ত্তারা একটু অপ্রতিভ হইয়াছেন বৈ কি? কেরোসিন টিনগুলা ফেরত লওয়া হইয়াছে কি না জানিতে পারি নাই।

অনিষ্টপাত অল্প হওয়ার আরও একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। হ্রদ মরিয়াছে বটে, কিন্তু নির্ব্বংশ হয় নাই। বাঁধের মৃদংশ স্রোতসহ ভাসিয়া গিয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডও অনেক চলিয়া গিয়াছে, এখন অবশিষ্ট রহিয়াছে দৃঢ়প্রোত বিশাল শিলাখণ্ড সমূহের অনুচ্চ অথচ অটল স্তূপ। তৎপশ্চাতে—দ্বিশত হস্ত গভীর, প্রায় ক্রোশৈক দীর্ঘ ও স্থল বিশেষে প্রায় সহস্রধনুঃ বিস্তৃত একটি স্থায়ী হ্রদ—গহনার চিরজীবী বংশধররূপে বিরাজমান। হ্রদের সমস্ত জল নিঃশেষিত হইয়া চলিয়া গেলে কেরোসিন তৈল ও কাষ্ঠস্তূপের কীর্ত্তিকাহিনী সরকারী রিপোর্টে অবশ্যই উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিত।

বর্ত্তমান হ্রদকে "চিরজীবী" বলিয়াছি, কিন্তু যাহার জন্ম হইয়াছে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য প্রকৃতির এ নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম নাই। গহনার ক্ষুদ্র হ্রদটিও কালে বিলয়প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু পৈত্রিক রোগে নয়। ইহার উত্তরে পূর্ব্বে ও দক্ষিণে যে সকল পর্ব্বতমালা উচ্চ প্রাচীরবৎ

দণ্ডায়মান তাহাদিগের বিপুলাঙ্গ হইতে প্রস্তরখণ্ড ও মৃত্তিকাকণা বৃষ্টিবারি চালিত হইয়া ক্রমশঃ হ্রদগর্ভে সঞ্চিত হইতে থাকিবে; তন্নিবন্ধন ক্রমশঃ হ্রদের গভীরতার হ্রাস ও অন্তিমে হ্রদত্বের বিলোপ সংঘটিত হইবে।

তথাপি কিন্তু গহনা নির্ব্বংশ হইবার নয়, কেননা "ইহার একটা বংশ আছে।" গহনা হ্রদ প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খল পুত্র ধূমকেতুর ন্যায় অজ্ঞাত কুলশীল একাকী "জীব" নয়। গহনা না অদ্বিতীয়, না অপূর্ব্ব পদার্থ। এই শ্রেণীর হ্রদের পুরাতন স্মৃতিচিহ্ন হিমাচল প্রদেশে বিরল নয়, আর নূতন হ্রদের জন্মগ্রহণের সম্ভাবনাও বহুস্থানে সর্ব্বদা বিদ্যমান। ইহার কারণ এই যে—হিমগিরি—পৃথিবীর মানদণ্ড সদৃশ, জগজ্জননীর জনক সুতরাং জগতের "দাদামহাশয়"রূপী ত্রিকালদর্শী এই হিমগিরি, পর্ব্বত সমাজে কতকটা আধুনিক। এটা নিতান্ত অসহনীয় ধৃষ্টতার কথা হইয়া পড়িল, অনেকে হয় ত পড়িয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিবেন; তাঁহাদিগের নিকট করযোড়ে বিনীত নিবেদন, একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, যথাসময়ে ইহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করিব। আপাততঃ আমার অনুরোধে স্বীকার করুন, হিমগিরি আধুনিক। আধুনিক বলিয়া এখনও ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, এইজন্য ভূস্তরের অস্বাভাবিক সংস্থান বহুস্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে, ভূমিকম্প প্রায়ই অনুভূত হয়, নদীগণের স্রোতপথ অদ্যাপি প্রয়োজনানুরূপ সুপরিসর বা সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে নাই, এক কথায়, গিরিবরের গঠনোপাদানের সংযোগ বিয়োগ এখনও চলিতেছে, কে বলিতে পারে আরও কত লক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া চলিবে? এই সংযোগ বিয়োগই মরস্থানের পতন এবং গহনা ও তৎসহোদর অন্যান্য হ্রদের উৎপত্তির মৌলিক কারণ।

মরস্থানের পতনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও কতকগুলি কারণ আছে, সেগুলি একটি নিদর্শন দ্বারা সমষ্টিভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। মনে করুন দুই খণ্ড কাচ ও তত্তুল্য দৈর্ঘ্য বিস্তার বিশিষ্ট দুই খণ্ড তক্তা পৃথকরূপে উপর্য্যধোভাবে কোনও সমতল স্থানে রাখিলাম। এখন কাচ ও গুরুত্ব খণ্ডদ্বয়কে যদি একদিকে কিয়ৎ পরিমাণে উঁচা করি, তাহা হইলে উপরের খণ্ড অন্য প্রতিবন্ধক না পাইলে পূর্ব্বাবস্থ না থাকিয়া সরিয়া পড়িবে। কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়কে একদিকে ঠিক অতটুকু উঁচা করিলে উপরের তক্তা খানি

সরিবে না, সরাইতে হইলে আরও অনেক উঠাইতে হইবে। যে গুণ থাকাতে তক্তা সরিল না, আর যাহার অভাব বা অল্পতা হেতু কাচ সরিয়া গেল, তাহাকে বন্ধুরতা * বলা যাইতে পারে। উক্ত উদাহরণে ইহাও বুঝা গেল যে স্থল বিশেষে অসামতলিকতা দ্বারা বন্ধুরতার কার্য্যকারিতা বিনষ্ট হয়; অর্থাৎ বন্ধুরতা যতই অধিক হউক না কেন, ঢাল অধিক হইলে উপরের দ্রব্য নিশ্চয়ই সরিয়া পড়িবে; অন্য কোন শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে একা বন্ধুরতা কিছুতেই তাহাকে স্বস্থানে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না। এখন মনে করুন নিম্নের তক্তা খানির উপর পৃষ্ঠে কিঞ্চিৎ কলিচুণ ভাল করিয়া পিটিয়া তদুপরি দ্বিতীয় তক্তা খানি বসাইয়া দিলাম, ইহাতে বন্ধুরতার কার্য্যকারিতা চুণের সহায়তা বলে বাড়িল বৈ কমিল না, সুতরাং ইতিপূর্ব্বে যে পরিমাণে উঁচা করিলে উপরের তক্তা খানি সরিয়া যাইতে পারিত, এখন তদপেক্ষা কথঞ্চিত অধিক উঁচা করিলেও সরিবে না। মনে করুন এইরূপ বহু তক্তা চুণ সংযোগে স্তূপকৃত করিলাম, প্রত্যেক তক্তারই এক প্রান্ত অপর প্রান্ত হইতে এ পরিমাণে উঁচা যে চুণের সাহায্য ব্যতিরেকে উহা নিম্নস্থ তক্তা হইতে নিশ্চয়ই সরিয়া পড়িবে। এখন যদি তক্তাস্তূপের উপরিভাগে অনবরত জল সেচন করা যায়, আর দুই একটা নর্দ্দামার জলও ক্রমে আসিয়া কলি চুণের সঙ্গে মিশিতে থাকে, তাহা হইলে পরিণাম ফল কি দাঁড়াইবে? জল পাইয়া ক্রমে কলিচুণ ফুলিয়া উঠিবে, সুতরাং তক্তাগুলাকে নিম্ন হইতে ঠেলিতে থাকিবে, ওদিকে কতক চুণ জলের সঙ্গে ক্রমে ধুইয়া যাইতে থাকিবে, চুণের স্তরে জল শোষিত হওয়ায় তক্তাস্তূপের উপরের অংশ ক্রমশঃ "মাথাভারী" হইয়া পড়িবে, ফলে তক্তাগুলি যথা সময়ে সরিয়া পড়িবে।

ময়স্থানের পক্ষে কতকটা এইরূপ ঘটনাই ঘটিয়াছিল, ভূস্তরগুলি উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে বিরহী গঙ্গার দিকে হেলিয়া ছিল। যে প্রস্তর সমূহে † স্তর সংগঠিত তাহাদের বন্ধুরতা বা কাঠিন্য অধিক নয়। স্তরগুলির

*ইংরাজী Friction.

†Carbonaceous shales, dolomitic marls. tale-schist tale, ইত্যাদি।

ব্যবধানে সংযোজক ভাবে যে সকল দ্রব্য * ছিল জল সংযোগে ও পর্ব্বত-পেষণে শ্লথ ও বিকৃত হওয়াই তাহাদের ধর্ম্ম। উপরে বৃষ্টি ত আছেই, অধিকন্তু পশ্চাতে উচ্চতর পর্ব্বত থাকায় অন্তরে অন্তরে বহু প্রস্রবণ (দৃষ্টান্তের নর্দ্দামা) অবশ্যই প্রবাহিত ছিল। এই সকলের ফল সমষ্টিই ময়স্থানের পতন ও গহনার জন্ম।

গহনা হ্রদতত্ত্বে ভূতত্ত্ববিদ্ মহলে একটা নূতন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, প্রবন্ধ পরিসমাপ্তির পূর্ব্বে সে কথাও পাঠকদিগকে বলিয়া রাখি। ইহাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে আনুমানিক আট দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর কোন ও কোন অংশ বরফ † মণ্ডিত ছিল। এই বরফরাশি উন্নতভূমি হইতে নিম্নভূমি অভিমুখে ধীর অথচ অবিরাম ভাবে প্রবাহিত হইত। এই বরফ প্রবাহের ‡ নিম্ন স্তরে ও দুই পার্শ্বে অসংখ্য তীক্ষ্ণধার প্রস্তরখণ্ড দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া যাইত। চলনশীল প্রবাহে দৃঢ়প্রোত প্রস্তরনিচয়ও অবশ্যই চলনশীল। সুতরাং যে যে স্থান হইয়া প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে, সেই সেই স্থানের স্থায়ী প্রস্তর সমুহে সমান্তরালভাবে রেখানিচয় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। হিমালয়ের চিরবরফমণ্ডিত উচ্চতমাংশে এবং অন্যান্য উচ্চ পর্ব্বতে, আধুনিক বরফ প্রবাহ দৃষ্ট হয়, সেই সকল প্রবাহের গতি ও কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া উক্তরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করা হইয়াছে। সুতরাং যেখানেই ঐরূপ রেখা দৃষ্ট হয়, ভূতত্ত্ববিদেরা উহা বরফপ্রবাহের কার্য্য বলিয়া প্রায়ই ধরিয়া লয়েন। এখন মনে করুন ময়স্থানের ন্যায় পর্ব্বতশৃঙ্গ নদীপ্রবাহে আড় হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাতেও বরফ প্রবাহের ন্যায় বহুতীক্ষ্ণধার প্রস্তর উপরিভাগে নিম্নে ও পার্শ্বদেশে সুদৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া ছিল। সুতরাং সমগ্র বাঁধ যদি একই মুহূর্ত্তে পশ্চাৎস্থ জলরাশি পেষণে স্বস্থানচ্যুত হইয়া যাইত, তাহা হইলে তদঙ্গীভূত প্রস্তরনিচয় গতিশীল

---

*Carbonates of lime and Magnesia, iron pyrites, clay, ইত্যাদি। (Mr. Holland's Report on the Ghona Landslip).

†ইংরাজী Ice, snow নয়।

‡ইংরাজী Glacier

হইয়া নদীগর্ভনিবদ্ধ বহু প্রস্তরপৃষ্ঠে পূর্ব্বোল্লিখিতবৎ রেখা অঙ্কিত করিতে পারিত। যে ভাবে অল্পে অল্পে বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে, তাহাতেও স্থান বিশেষে ঐরূপ রেখা খোদিত হওয়া অসম্ভব নয়। তবেই দেখুন, রেখা দেখিলেই বরফ প্রবাহের কার্য্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া সুসঙ্গত নয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি গহনাকাণ্ডের অভিনয় হিমাদ্রি রঙ্গমঞ্চে বহুবার হইয়াছে, আরও কতবার হইবে কে ইয়ত্তা করিবে? সুতরাং অন্যত্র যেমন হউক, অন্ততঃ হিমালয়াংশে বরফ প্রবাহের অবস্থান ও বিস্তার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যেরূপ অভিজ্ঞতা আছে, তাহা সংশোধনসাপেক্ষ বলিয়া সহজেই উপলব্ধি হইতেছে।

গহনা কথার এখানেই 'ইতি'।* পরিশেষে সহিষ্ণু পাঠক! সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশে আদ্যন্ত প্রস্তরাকীর্ণ খরস্পর্শ দুর্গম পথে কঠোর কষ্টভোগ করিয়াও আপনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সাহচর্য্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া অদ্য বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল।

গীতা।

(১)

(মর্ম্মানুবাদ)†

প্রথম অধ্যায়—অর্জ্জুন বিষাদ যোগ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেনঃ—

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে একত্র হইয়া
আমাদের পাণ্ডবের যোদ্ধাগণ গিয়া

*কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে পাইওনিয়ার, ষ্টেট্‌সম্যান, মর্ণিংপোষ্ট, ইণ্ডিয়ান এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি সংবাদপত্র এবং মেড্‌লিকট্ ও ব্লান্‌ফোর্ডের "জিওলজী অব্ ইণ্ডিয়া" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও "রেকর্ডস্ অব্ দি জিওলজিক্যাল সারবে অব্ ইণ্ডিয়ার" সপ্তবিংশতি বালমের দ্বিতীয় খণ্ডে হল্যাণ্ড সাহেব লিখিত গহনা বিবরণ হইতে এই প্রবন্ধের অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছি।

†সংস্কৃতানভিজ্ঞের নিকট খাঁটি অনুবাদ দুর্ব্বোধ্য হয়।

কি করিল, হে সঞ্জয় কহ বিবরণ,
শুনিতে ব্যাকুল বড় হইয়াছে মন। ১।

সঞ্জয় কহিলেনঃ—

পাণ্ডবের সৈন্য ব্যূহ করি দরশন
দ্রোণাচার্য্যে কহিলেন রাজা দুর্য্যোধন ;
দেখ আর্য্য, অরিসৈন্য করিয়া বেষ্টন,
রক্ষা করে তব শিষ্য দ্রুপদনন্দন। ২. ৩।
রহিয়াছে ধনুর্দ্ধর মহাশূরগণ,
ধৃষ্টকেতু কুন্তি ভোজ শৈব চেকিতান,
ভীমার্জ্জুন সমযোদ্ধা বিরাটদ্রুপদ
পুরুজিৎ কাশিরাজ অতুল সম্পদ। ৪, ৫।
উত্তমৌজা যুধামন্যু সৌভদ্র দ্রৌপদ
সকলেই মহারথ যুদ্ধবিশারদ। ৬।
আমাদের শূরশ্রেষ্ঠ মহাবীর্য্যবান
সৈনিক নায়ক যত কর প্রবিধান ; ৭।
আপনি সমিতিঞ্জয় ভীষ্ম কৃপ আর
বহু শূর মোর লাগি মরণে স্বীকার !
অশ্বত্থামা সৌমদত্তি কর্ণ ও বিকর্ণ
যুদ্ধবিশারদ সবে অস্ত্র শস্ত্রে পূর্ণ। ৮, ৯।
অসীম মোদের সেনা ভীষ্মের রক্ষণে,
পর্য্যাপ্ত পাণ্ডব সেনা ভীমের অধীনে ; ১০।
করুন ভীষ্মের রক্ষা ব্যূহদ্বারে গিয়া
বিভাগানুসারে সবে একত্র হইয়া। ১১।
কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম শঙ্খ ধরি
সিংহনাদে দুর্য্যোধনে হরষিত করি,
বাজান গভীর নাদে ; চৌদিকে অমনি
হইল পণব ভেরী পটহের ধ্বনি। ১২, ১৩।
উঠিল তুমুল শব্দ। কৃষ্ণ ধনঞ্জয়
বাজান শ্বেতাশ্ব রথে দিব্য শঙ্খদ্বয়। ১৪।

পাঞ্চজন্য হৃষিকেশ বাজান গম্ভীরে,
বৃকোদর পৌণ্ড্র, দেবদত্ত পার্থকরে। ১৫।
অনন্ত বিজয় বাজাইলা যুধিষ্ঠির,
বাজান মণিপুষ্পক সহদেব বীর,
নকুল সুঘোষ শঙ্খ বাজান ত্বরায়। ১৬।

ধনুর্দ্ধর কাশিরাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন তায়
অপরাজিত সাত্যকি শিখণ্ডী সুরথ
বিরাট দ্রুপদ আর দৌপদ তাবৎ
মহাবাহু সুভদ্রার তনয়, তখন
পৃথক পৃথক শঙ্খ করিলা বাদন। ১৭, ১৮।

সেই শব্দ ক্ষিতি ব্যোম ধ্বনিত করিয়া
বিদারণ করে যত কৌরবের হিয়া। ১৯।

রাজন্, অর্জ্জুন হেরি শাস্ত্র উত্তোলন
ধনু তুলি কৃষ্ণপ্রতি কহিলা তখন ; ২০।

অর্জ্জুন কহিলেনঃ—

এই রণোদ্যমে যুদ্ধ কার সনে করি ?—
কৌরব হিতার্থী দলে যাবত নেহারি,
তাবত অচ্যুত মোর রথ রাখ তুমি
উভয় সেনার মধ্যে ;—স্থির করি আমি। ২১, ২২, ২৩।

সঞ্জয় কহিলেনঃ—

হে ভারত অর্জ্জুনের এই বাক্য শুনি
হৃষিকেশ দিব্যরথ রাখিলেন আনি ২৪।
ভীষ্মাদি প্রমুখ রাজগণের সম্মুখে ;
কহিলেন,—অরি সৈন্য ওই দেখ সখে ! ২৫।
হেরিলেন পার্থ পরে, উভয় পক্ষীয়
পিতৃব্য আচার্য্য ভ্রাতা বান্ধব আত্মীয়,
পিতামহ পুত্র পৌত্র শ্বশুর মাতুলে
সবে মিলি অবস্থিত সেই রণস্থলে। ২৬।

নিরখি কৌন্তেয় তবে সেই বন্ধুগণ,
কহিলেন, কৃপাবিষ্ট অবসন্ন মন,—২৭।

অর্জ্জুন কহিলেনঃ—

হে কৃষ্ণ, যুদ্ধার্থী এই যতেক স্বজনে
শুষ্কমুখ অবসন্ন হই দরশনে!
হইতেছে রোমহর্ষ, কম্প মোর দেহে,
গাণ্ডীব স্খলিত হস্তে, মনস্থির নহে। ২৯।
রহিতে না পারি গাত্রে দাহ উপস্থিত
দেখিতেছি যে লক্ষণ, সব বিপরীত! ৩০।
এ যুদ্ধে স্বজনগণে নিধন করিয়া
শ্রেয় নাই হে কেশব কি হবে বাঁচিয়া; ৩১।
কি হইবে রাজ্যভোগে? চাহিনা বিজয়!
গোবিন্দ! যাদের জন্য রাজ্য বাঞ্ছা হয়; ৩২।
তাঁহারাই করেছেন সবে আগমন
পিতামহ পুত্র পৌত্র শ্যালক স্বজন,
আচার্য্য পিতৃব্য আর শ্বশুর মাতুলে;
ধন প্রাণ বিসর্জ্জনে প্রস্তুত সকলে!
যদ্যপি ইহারা করে মোদের নিধন,
পৃথিবী কি? পাই যদি এ তিন ভুবন
এ সবে নাশিতে নারি শ্রীমধুসূদন;
কি সুখ সংহার করি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ? ৩৩, ৩৪, ৩৫।
আমি ত নাশিতে নারি ধার্ত্তরাষ্ট্রকুলে
বিনাশ করিলে এই আততায়ী দলে,
আমাদিগকেই পাপ করিবে আশ্রয়;
মাধব! স্বজন বধে কিবা সুখোদয়?
যদিও ইহারা লোভে জ্ঞানশূন্য সবে,
কুলক্ষয়ে মিত্রদ্রোহ দোষ নাহি ভাবে,
জানিয়াও আমাদের কিন্তু জনার্দ্দন,
কেননা হইবে পাপবুদ্ধি নিবারণ? ৩৭, ৩৮।

সনাতন কুলধর্ম্ম কুলক্ষয়ে নাশ,
অধর্ম্ম সমস্ত কুলে হয় সুপ্রকাশ! ৩৯।
তাহাতে কুলস্ত্রী দুষ্টা হয় নিঃসংশয়;
বাষ্ণের্য়, বর্ণসঙ্কর তাহ'তে উদয়! ৪০।
কুলঘ্নগণের আর কুলের নিশ্চয়
নরকের তরে এই সঙ্কর উদয়,
পিতৃপুরুষের পিণ্ডোদক বিলোপন,
তাতেই পতিত হন যত পিতৃগণ। ৪১।
বর্ণাশ্রম কুল ধর্ম্ম—সকলি বিফল
কুলঘ্নগণের এই দোষেতে কেবল! ৪২।
কুল ধর্ম্ম সমুৎসন্ন হয় যাহাদের,
শুনেছি নিবাসী তারা হয় নরকের! ৪৩।
হায়! মোরা মহাপাপ করিতে উদ্যত,
রাজ্যলোভে করিব এ স্বজন নিহত! ৪৪।
শস্ত্রশূন্য করি মোরে—কি কহিব আর!
মারে যদি কৌরবেরা, মঙ্গল আমার! ৪৫।

সঞ্জয় কহিলেন;—

এত বলি রথে পার্থ—বসিলা তখন
ফেলিয়া সশর চাপ, শোকাকুল মন। ৪৬।

ইতি প্রথম অধ্যায়—অর্জ্জুনবিষাদযোগ।

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।

হিন্দুতীর্থ।

চিত্রকূট।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত বান্দা জেলার মধ্যে করুই নামক একটী উপজেলা আছে, চিত্রকূট সেই করাইয়ের অধীন। এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের যে লাইন গিয়াছে, সেই

লাইনের মধ্যবর্ত্তী মাণিকপুর নামক একটী ষ্টেশন হইতে আর একটী লাইন ঝান্সী পর্য্যন্ত গিয়াছে, করই সেই লাইনের অন্তর্গত একটী ষ্টেশন। করই হইতে চিত্রকূট ৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

চিত্রকূট অতি প্রাচীন স্থান। এই স্থান অতিশয় নির্জ্জন ও রমণীয় বলিয়া প্রাচীন কাল হইতে অনেক যোগী তপস্বী সাধুপুরুষগণ এখানে একান্ত চিত্তে আপনাপন ইষ্টদেবতার সেবাতে নিযুক্ত থাকিতেন। সেই জন্য এই স্থান একটী প্রধান তপভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামায়ণে বর্ণনা আছে মহাত্মা রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন জন্য বনভ্রমণ কালে এই স্থানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া ছিলেন। ধর্ম্মাত্মা হিন্দুগণ এই স্থান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া অনেক ক্লেশ স্বীকার পুর্ব্বক দেখিতে গিয়া থাকেন। স্থানটী অত্যন্ত রমণীয়, প্রায় চতুর্দ্দিকে পাহাড়। ইহার মধ্যে মধ্যস্থলের একটী পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইতেছে, স্থানীয় অধিবাসিগণ এই নদীকে গঙ্গা বলিয়া অভিহিত করেন। এই নদীর অপর পারে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর চিত্রকূট সহর অবস্থিত। এই চিত্রকূটে ছোট বড় প্রায় ৫০।৬০টী দেবালয় আছে, প্রায় সকল দেবালয়েই রাম সীতার মূর্ত্তি। এই সকল দেবালয়ের অধিবাসিগণ সকলেই শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব, মহাত্মা রামানুজাচার্য্য এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহাঁরা সকলেই রাম সীতার উপাসনা করিয়া থাকেন, এইজন্য ইহাঁদিগকে রামাৎ কহে। এই রামাৎ বৈষ্ণবগণ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। ১ম আচারী; ২য় সাধারণী। ইহাঁরা সকলেই প্রধানতঃ সাধু তুলসীদাস কৃত রামায়ণকে বিশেষ ভাবে মান্য করিয়া থাকেন। এখানকার কোন সাধু ব্রহ্মচারীর সহিত আমার এক দিন বিচার হয়, তাহাতে তিনি সাধু তুলসী দাসের বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ দিতে লাগিলেন। আমি মহাত্মা তুলসী দাসের উক্ত প্রমাণ খণ্ডন করিতে লাগায়, ব্রহ্মচারীজী বলিলেন যে "আপনি স্বামীজীকে (তুলসী দাসকে) কি মানেন না? যিনি স্বামীজীকে মানেন না, আমরা তাঁহার সহিত বিচার করিতে চাহি না" বলিয়া বিচার বন্ধ করিলেন। যাহা হউক এখন পাঠকবর্গের নিকট উক্ত শ্রী সম্প্রদায়ের আচারী ও সাধারণী বৈষ্ণবগণের বিবরণ কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি।

১ম, আচারী। ইহাঁরা দেবালয়ে বাস করেন ও রামসীতার মূর্ত্তি পূজা করেন। ইহাঁদের মধ্যে আবার দুই শ্রেণী; ১ম গৃহী, ২য় বৈরাগী। গৃহীগণ স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া ঠাকুর বাড়ীর মহন্তরূপে অবস্থিতি করিয়া শিষ্যাদি করিয়া থাকেন ও রাজা রাজড়া প্রদত্ত যায়গীর ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

বৈরাগীগণের দেবালয়ে স্ত্রীলোক বাস করিতে পারেন না। ইহাঁরা চিরকাল অবিবাহিত থাকিয়া কেবল ধর্ম্ম চর্চ্চাতেই নিযুক্ত থাকেন। বৈরাগীদের আচার ব্যবহার অতি সুন্দর; প্রায় সকলেই প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে তিন বার স্নান করিয়া থাকেন, ডোর কৌপীন পরিধান করেন ও নিজ সম্প্রদায়ের প্রচলিত কণ্ঠী ও বিশেষ তিলক ধারণ করেন। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা একটু বয়স্ক তাঁহারা সর্ব্বদা মালা জপ করেন। রাম নামই ইহাঁদের জপের বিষয়। ইহাঁরা সাধারণতঃ বৈকালে একত্র হইয়া শাস্ত্রালোচনা ও সৎপ্রসঙ্গ করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সকলেই দয়ালু প্রকৃতি, প্রাণিহিংসা করেন না। অনেকেই দিন রাত্রির মধ্যে মধ্যাহ্নে একবার মাত্র আহার করেন। ইহাঁদের মধ্যে জাতিভেদ পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হস্তে (অর্থাৎ পূর্ব্বে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এক্ষণে বৈষ্ণব হইয়াছেন) আহার করিতে কাহারও আপত্তি নাই কিন্তু অন্য জাতির হস্তে আহার করেন না। যে স্থানে ব্রাহ্মণ বৈরাগী না পাওয়া যায় সে স্থানে স্বহস্তে পাক করিয়া থাকেন। ইহাঁদেরও অনেক শিষ্য সেবক আছে এবং রাজা রাজড়া প্রদত্ত যায়গীরও অল্পাধিক পরিমাণে সকলেরই আছে।

২য়, সাধারণী। বৈরাগীদিগের স্নানাহার ঐরূপই। ইহাঁরা মালা তিলক ধারণের তত পক্ষপাতী নহেন এবং অনেকে তাহা ধারণও করেন না। ইহাঁদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই, কিন্তু এই সাধারণী জাতিভেদ অস্বীকারের একটু বিশেষত্ব আছে, তাহা এই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির হস্তে ইহাঁরা আহার করেন কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য জাতি যথা—খৃষ্টান, মুসলমান বা কোন ইতর জাতির হস্তে আহার করেন না।

এই সাধারণীগণ দেবালয়বাসী নহেন। চিত্রকূট সহর হইতে প্রায়

দেড় মাইল দূরে জানকীকুণ্ড নামক একটী অতি নির্জ্জন স্থান আছে, (এই স্থান বঘেল খণ্ডের রাজার অধীন) সেই স্থানের পর্ব্বতের পাদদেশে স্থানীয় গঙ্গা কুল কুল ধ্বনি করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহারই নিকট কতকগুলি পর্ব্বত গুহা, সেই গুহা সকলের মধ্যে এই সমস্ত সাধুগণ বাস করিয়া নির্জ্জনে সেই মহান পুরুষের তপস্যায় ও ধ্যানে নিযুক্ত আছেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ চির কুমার ও কেহ কেহ গৃহত্যাগি।

এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। গুহাগুলির সম্মুখে পাহাড় ভেদ করিতে করিতে নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং সেই নদীর পর পারে বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ বড় বড় পাহাড়। এই সমস্ত পাহাড়ে বিচিত্র রঙ্গের বিবিধ পক্ষী সর্ব্বদাই বিহার করিতেছে; বিশেষতঃ ময়ূর ময়ূরীগণের কেকারবে সর্ব্বদাই স্থানটীকে একটী অপূর্ব্ব মাধুর্য্যভাবে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। এক দিকে নদী প্রবাহের উচ্চ ও গম্ভীর শব্দ, নানা শ্রেণী পক্ষিগণের বিবিধ সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনি ও ময়ূরগণের কেকারব, এবং অপর দিকে বৃক্ষরাজী সুশোভিত পাহাড় সমূহ; এইরূপ সুন্দর রমণীয় নির্জ্জন স্থানে যাইলে সকলেরই মন স্বভাবতই সেই বিশ্বপিতার চরণ পূজার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। ঈশ্বর কৃপায় আমি এই স্থানের একটী গুহাতে কয়েক দিন বাস করিয়া বিশ্বপিতার অপার কৃপা অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম।

এই সমস্ত গৃহত্যাগী গুহাবাসী রামোপাসক বৈষ্ণবগণের চরিত্র অতি সুন্দর। ইহাঁদের ভগবানে বিশ্বাস ও জীবে দয়া দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমি যে গুহাতে ছিলাম সেই গুহাতে অন্য দুইটী সাধু আছেন। এক দিন রাত্রে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি হয় এবং তজ্জন্য আমার অত্যন্ত শীত করিতে থাকে, কিন্তু আমার নিকট কম্বল বা অন্য কোন গাত্রবস্ত্র না থাকায় শীত নিবারণের কোন উপায় ছিল না! আমি শীতে কষ্ট পাইতেছি জানিতে পারিয়া উক্ত সাধু দ্বয়ের মধ্যে রামজী দাস নামক একটী সাধু, আপনার নিজের গাত্রের লুই খানি আমার গাত্রের উপর ফেলিয়া দিয়া হিন্দি ভাষায় বলিলেন "সঙ্গে একখানি গরম কাপড় রাখার প্রয়োজন, তুমি এই খানি কাহাকেও দিও না।" আমি বলিলাম "আপনি আমাকে নিজের গাত্রের কাপড়

খানি দিলেন, আপনার কি হইবে?" প্রত্যুত্তরে তিনি কহিলেন যে তোমার দুঃখ দেখিয়া সীতাপতি তোমাকে এই কাপড় দিলেন, আমি দি নাই। আমাকে আবার সীতাপতি দিইয়ে দিবেন, ইহাতে তুমি কিছু মনে করিও না।" আমি তাঁহার দয়া ও স্বার্থত্যাগ দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমরা নিজে সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিয়াও ২।৪টা পয়সা কাহাকেও দিতে হইলে আমাদের কত মমতা হয়, আর এই নিঃস্বম্বল সাধু পুরুষ নিজে শীত ভোগ করিয়া গাত্রবস্ত্র খানি আর একজনের শীত নিবারণ জন্য অম্লানবদনে দিলেন, আবার বলিলেন যে "আমি দি নাই, তোমার দুঃখ দেখিয়া সীতাপতি তোমাকে দিলেন।" ইহাতে তাঁহার ঈশ্বর পরায়ণতা ও নিঃস্বার্থতা দেখিয়া আমাদের জীবনের দুর্গতি কতদূর হইয়াছে তাহা একবার চিন্তা করুন। বাস্তবিক ভগবানে বিশ্বাস ও নির্ভর না হইলে মানুষ এইরূপ দয়ালু ও নিঃস্বার্থ হইতে পারে না।

এই সমস্ত গুহাবাসী বৈষ্ণব সাধুগণের মধ্যে একটী গুহায় একজন বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী সাধু আছেন, তাঁহার নাম কৃপাল নাথ। তিনি উলঙ্গ থাকেন, মৌনী, কাহারও সহিত কথা কহেন না; বিশেষ আবশ্যক হইলে স্লেটে হিন্দি ভাষায় লিখিয়া দেন। এইরূপে তাঁহার সহিত আমার কিছু কথাবার্ত্তা হয়। তিনি প্রশ্ন করিলেন "তুমি কে?" আমি উত্তর করিলাম "আমি অতি দীন মনুষ্য।" তাহাতে তিনি বলিলেন "আপনার এখনও দিব্য জ্ঞান হয় নাই।" পরে প্রশ্নোত্তরে জানিলাম যে "আমি সেই পরমাত্মা" এইরূপ জ্ঞান না হইলে অন্য জ্ঞানকে দিব্যজ্ঞান বলিয়া তিনি মনে করেন না। তাঁহার সাধনের বিষয় জিজ্ঞাসায় বলিলেন যে "আত্মায় পরমাত্মায় এক বলিয়া চিন্তন করাই আমার সাধন।" পাঠক মহাশয়গণের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত এই অদ্বৈতবাসী সাধুর পক্ষ সমর্থন করিবেন, আর কেহ কেহ হয় ত ইহা গ্রাহ্য করিবেন না। কিন্তু আমার জ্ঞানে ইহার মধ্যে কিছু সত্যও আছে আর কিছু ভ্রান্তিও আছে বলিয়া বোধ হয়। সত্য এই যে এক পরমাত্মা ভিন্ন জগতে অন্য কোন পৃথক বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সকলই তাঁহার অস্তিত্বে অস্তিত্ববান। জীবাত্মাও তাঁহারই স্বরূপ বটে কিন্তু জীবাত্মা পূর্ণ নহে। তিনি জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছাময় পূর্ণপুরুষ; আর জীব জ্ঞান প্রেম

ইচ্ছা শক্তি বিশিষ্ট পরিমিত পুরুষ। সুতরাং একত্ব,—জ্ঞান,—প্রেম ও ইচ্ছাতে, এইটুকু সত্য। আর ভ্রান্তি এই যে জীবকে পরমাত্মা কখনই বলা যাইতে পারে না, কেননা পরমাত্মা পূর্ণ, অনাদি ও অনন্ত। জীব তাঁহার সহিত জ্ঞানেতে, প্রেমেতে ও ইচ্ছাতে এক হইলেও সীমাবদ্ধ, পরিমিত। জীবের আমিত্বরূপ (অহঙ্কার মূলক আমিত্ব নহে, কিন্তু বিশুদ্ধ সেব্য সেবক ভাব রূপ আমিত্ব) সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকায় তাঁহার সহিত ভাবেতে পৃথক প্রকাশ পাইতেছে। সেই জন্যই পরমাত্মা ও জীবে সেব্য সেবক সম্বন্ধ সম্ভব হইয়াছে। একদিকে পরমেশ্বরের সহিত জীবের একত্ব ও অন্য দিকে সেব্য সেবকরূপ দ্বিত্বভাব থাকায়, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার এক নিরবচ্ছিন্ন অভেদ্য ভাব প্রকাশ করিয়া উপাস্য উপাসকরূপ পরম সম্বন্ধ নিত্যকাল প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। ইহা গভীর দার্শনিকতত্ত্ব, অল্প কথায় বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করা সহজ নহে, তবে প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আভাস দেওয়া গেল মাত্র।

এইরূপে এই সমস্ত গুহাবাসী সাধুদিগের সহিত প্রায় প্রতিদিন বৈকালে ধর্ম্মালোচনা করিতাম। এই সমস্ত গুহার মধ্যে ২০।২২ জন সাধু আছেন, ইহাঁদের মধ্যে দুই জন সাধু বেশ শাস্ত্রজ্ঞ ও বিচারক্ষম। এখানকার বর্ত্তমান সাধুগণের মধ্যে রামা বাবা নামক সাধুকেই সকলে শ্রেষ্ঠ স্থান দেন, তিনি বেশ শাস্ত্রজ্ঞ ও বিচারশীল, তাঁহার সহিত আমার অনেক বিষয়ের আলাপ হইয়াছিল। তিনি আমাকে খুব ভাল বাসিতেন ও আমার সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। এই সমস্ত সাধুরা কেহই শিষ্য সেবক করেন না, আগন্তুক ব্যক্তি ধর্ম্মালোচনা করিতে আসিলে তাহাদের সহিত ধর্ম্মালোচনা ও উপদেশাদি দিয়া থাকেন। ইহাঁদের নিকট শুনিলাম এখানে যমুনা দাস নামক একটী সাধু ছিলেন, তিনি ৬।৭ বৎসর হইল পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে সকলে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া মান্য করিতেন, লোকে উপদেশাদি পাইবার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহাকে বিরক্ত করিত বলিয়া তিনি কয়েকটী কুকুর পুষিয়া ছিলেন, তাঁহার গুহার নিকট কাহাকেও যাইতে দেখিলে তিনি সেই কুকুরগুলিকে লেলাইয়া দিতেন, কোন ব্যক্তি সেই কুকুরগণের বাধা অতিক্রম করিয়া

তাঁহার নিকট যাইতে পারিলে তবে তিনি তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন বা উপদেশ দিতেন।

এই নির্জ্জনপ্রিয় উদাসীন গুহাবাসী সাধুগণের মধ্যে কাহাকেও সাকার মূর্ত্তি পূজা করিতে দেখি নাই ও ইহাঁদের গুহায় কোন সাকার দেব দেবীরও মূর্ত্তি নাই। মূর্ত্তি পূজার কথা জিজ্ঞাসিলে কহিতেন যে আমরা নিজে কোন মূর্ত্তি পূজা করি না ও তাহার আবশ্যকও নাই, তবে দেবালয় আদিতে যাইলে অন্যদের ন্যায় মূর্ত্তির নিকট প্রণামাদি করিয়া থাকি। রাম নাম জপ করাই আমাদিগের প্রধান সাধন ইহাঁরা আরও বলেন যে মূর্ত্তি পূজা অজ্ঞানীদের জন্য, আমাদের জন্য নহে।

ইহাঁদের আহারাদি চারি প্রকার নিয়মে উপার্জ্জিত হয়। ১ম, অজগর বৃত্তি বা আকাশ বৃত্তি। এই বৃত্তিধারিগণ কাহারও নিকট কিছু চাহেন না বা আহারের অন্বেষণে অন্যত্র যান না, আপনা হইতে যাহা আইসে তাহাই ভোজন করেন। ২য়, মাধুকুরি বৃত্তি। ইহাঁরা মধ্যাহ্ন কালে গৃহস্থদের বাড়ী বা দেবালয়ে যাইয়া ডাল রুটী ভিক্ষা করিয়া আহার করেন। ৩য়, চুটকি অর্থাৎ প্রাতে ৮। ৯ ঘটিকার সময় গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া ময়দা ভিক্ষা করিয়া আনেন ও তাহাই স্বহস্তে রুটী প্রস্তুত করিয়া আহার করেন। ৪র্থ, বৃত্তিভোগী। ইহাঁদিগকে কেহ কেহ কিছু কিছু করিয়া বৃত্তি দেন, তদ্দ্বারাই ইহাঁরা জীবিকানির্ব্বাহ করেন।

এই স্থান হইতে এক মাইল দূরে কান্তারনাথ নামক একটী পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ের পরিধি ৬ মাইল। এই ছয় মাইল পরিধিবেষ্টিত পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া ৫। ৬ ফিট পরিসর পাকা ও আমাদের দেশের ছাদের ন্যায় পিটিয়া বাঁধান একটী রাস্তা আছে এবং তাহার ধারে ধারে দেবালয় ইত্যাদি দ্বারায় রাস্তাটীর শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। তীর্থযাত্রীগণ এই স্থানে আসিয়া এই রাস্তা দিয়া এই পাহাড় প্রদক্ষিণ করাকে অতি পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করেন। এখান হইতে ৫। ৬ মাইল দূরে অনুসূয়া নামক পাহাড়ে অত্রি মুনির আশ্রম নামে একটী স্থান আছে, সেখানেও দুই এক জন সাধু থাকেন। এই সমস্ত স্থান নির্জ্জন সাধনের উপযোগী বলিয়া স্থানে স্থানে অনেক সাধু বাস করেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে সকলের সহিত আমার আলাপ করিবার সুবিধা হয় নাই। এই সমস্ত স্থানের

তাহারা ইচ্ছা বা চেষ্টা করিলে যে সুধাময়ীকে রক্ষা করিতে পারিত না, সে কথা আমি বিশ্বাস করি না।

ললিত। কে রক্ষা করিবে? যে রক্ষা করিতে যাইত তাহারি আমার দশা ঘটিত। আপনি বোধ হয় শুনিয়াছেন, মাথায় বাঁশ পড়িয়া আমি আঘাত পাইয়াছিলাম। প্রকৃত কথা তাহা নহে। আমি দেখিয়াছি আমার মাথায় একজন লাঠি মারিয়াছে। আমি সে লোককে চিনিতে পারি নাই, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস যে সুধাময়ীকে হত্যা করাই লোকের উদ্দেশ্য ছিল।

মাধব ললিতের কথা শুনিতে শুনিতে তীব্রদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া ছিলেন। ললিতের কথা সমাপ্ত হইলে মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল, শীর্ণ দেহ থর থর কম্পিত হইয়া উঠিল। মাধবের ক্রোধ কেউ কখন দেখে নাই, সুধাময়ী তাঁহার এ অবস্থা দেখিলে বিস্মিত হইতেন। কিন্তু মাধবের সে ভাব মুহূর্ত্ত পরেই অপনীত হইল। মাধব অভিমান করিতে জানিতেন, কাঁদিতে জানিতেন, সহ্য কবিতে জানিতেন, কিন্তু রাগ করিতে জানিতেন না, রাগ করিতে পারিতেন না। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আনত দৃষ্টে বলিলেনঃ—

এই দক্ষিণপাড়ায় অনেকের হিংসা বহন করিয়াছি, প্রতিহিংসা করিতে কখন ইচ্ছা হয় নাই। সুধাময়ীর সঙ্গে এই দক্ষিণপাড়ার সহিত আমার সকল সম্পর্ক ঘুচিয়া গিয়াছে, আমার জীবনের সকল কর্ত্তব্য ফুরাইয়াছে। নতুবা আমার নিজের জন্য না হউক, রাজা মণিমোহনের অনাথা কন্যার প্রতি এই পাশবাধিক অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতাম। রাজা ও রাণী সুধাময়ীকে আমারি হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। যদি বুঝিতাম প্রতিহিংসা করিলে সুধাকে ফিরিয়া পাইব, তাহা হইলে এখনি সে জন্য প্রস্তুত হইতাম, কিন্তু যখন দক্ষিণ-পাড়াবাসী সমস্ত লোকের জীবনের পরিবর্ত্তেও সুধাময়ীর একগাছি কেশ পর্য্যন্ত ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন আর প্রতিহিংসা কেন? দুষ্টের দমন ভগবান করিবেন, আমার এ জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে।

ললিত বিস্মিতের ন্যায় মাধবের মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। মাধবের কথা সমাপ্ত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আপনি রাজা মণিমোহনের নাম দুই বার উল্লেখ করিলেন। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি খুলিয়া বলুন, সুধাময়ী কে?"

তখন মাধব ধীরে ধীরে তাহার আপনার ও সুধাময়ীর পরিচয় প্রদান করিলেন। রাজা মণিমোহনের পরলোক প্রাপ্তি ও রাণী অন্নপূর্ণার সহগমন এবং নবাব সুজাদ্দৌলার বদান্যতার কথাও উল্লেখ করিলেন। শেষে বলিলেন, "ললিত, আমার জীবনে একটি কার্য্য বাকি আছে; কিন্তু আমা হইতে আর সে কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। আমার জীবনীশক্তির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আমার দেহ, মন, প্রাণ, সকলি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া কোন নির্জ্জন তীর্থে গিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিব। তুমি আমার সেই শেষ কার্য্যটির ভার লইয়া আমার ইহসংসারের কর্ত্তব্য হইতে উদ্ধার কর।"

ললিত রোরুদ্যমানস্বরে বলিলেন "আপনি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবেন না। আপনি আমায় পরিত্যাগ করিলে আমি সুধাময়ীর শোকের সান্ত্বনা হারাইব।"

বৃদ্ধ মাধবের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। আগ্রহে ললিতকে অঙ্কে তুলিয়া লইয়া তাঁহার ললাট চুম্বন করিলেন। সস্নেহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "তুমি কি আমার সুধাকে এত ভাল বাসিতে?"

এইবার ললিতকুমার বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। রোদনপরায়ণ মাধব গদ গদ কণ্ঠে কহিলেন "ললিত! আমার চিরদিনের সাধ ছিল, সুধাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া আমি সংসার হইতে অবসর লইব। রাজা মণিমোহনও অন্তিমকালে আমার সে অভিপ্রায় শুনিয়া পরম শান্তিতে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আমার চিরদিনের সে সাধ অপূর্ণ রহিল।"

ললিতকুমার মাধবের অঙ্ক হইতে অবতীর্ণ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আপনারা পুণ্যাত্মা আপনাদের বাসনা অপূর্ণ হয় নাই, আপনার অনুপস্থিতি কালে সিদ্ধেশ্বরী পাগলিনী আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু আমি পাপিষ্ঠ, আমার ভাগ্যে অত সুখ সহিবে কেন? আমি অমূল্য রত্ন পাইয়াও কণ্ঠে ধারণ করিতে পারিলাম না। আমা অপেক্ষা হতভাগ্য জগতে আর কাহাকেও দেখিয়াছেন কি?"

মাধব বিস্মিতনেত্রে ললিতকুমারের দিকে দৃষ্টি করিলেন। ললিত ধীরে ধীরে সিদ্ধেশ্বরী পাগলিনী সংক্রান্ত সকল কথা বিবৃত করিলেন। মাধব দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, সিদ্ধেশ্বরী অদ্ভুত মানবী, ভূত ভবিষ্যৎ তাঁহার চক্ষে বর্ত্তমানের ন্যায় প্রতীয়মান। তিনি তোমাদের ভবিষ্যৎ দেখিয়া ছিলেন কিন্তু শুধাময়ীর আসন্ন বিপদ কেন দেখিতে পান নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। যাহোক, আমি তাঁর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া এ স্থান ত্যাগ করিব। এক্ষণে শুন আমি মনস্থ করিয়াছি, সুধাময়ীর বিষয় সম্পত্তি সকলি ভিখারী সেবায় উৎসর্গ করিব। তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য একজন উপযুক্ত ও বিশ্বাসী লোকের আবশ্যক। তুমি ব্যতীত এমন কোন লোক দেখিতে পাই না, যাহার উপর সে কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। তুমি এই ভার গ্রহণ করিয়া আমার সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত কর।

ললিত। আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিবার সাধ্য আমার নাই। কিন্তু আমিও এই ঘটনা হইতে সংসারের প্রতি স্পৃহাশূন্য হইয়াছি, আর কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে আমার ইচ্ছা করে না।

মাধব। সুধার অনুরোধে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ কর।

ললিত। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য, আমি ভার গ্রহণ করিলাম।

মাধব সস্নেহে ললিতের মস্তকে কর স্থাপন করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন "তবে আমি বিদায় হই, তোমার শরীর সুস্থ নহে, তুমিও অন্তঃপুরে গমন কর। আমি সত্বর মুরশিদাবাদ যাইব, তথা হইতে তোমার নিয়োগ পত্র ও আবশ্যকীয় কাগজ পত্রাদি তোমার নিকট প্রেরণ করিব।"

ললিত। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আজ এই স্থানেই অবস্থিতি করুন।

মাধব। না ললিত, আমি অদ্যই এই স্থান পরিত্যাগ করিব!

ললিত। মুরশিদাবাদে আপনি কত দিন অবস্থিতি করিবেন, তাহার পর কোথায় যাইবেন? আমি কি আর আপনার সাক্ষাৎ পাইব না।

মাধব। মুরশিদাবাদে কত দিন থাকিতে হইবে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না, তবে মনস্থ করিয়াছি, অতি সত্বর তথা হইতে তীর্থ পর্য্যটনে

বহির্গত হইব। সকল তীর্থই দর্শন করিবার কল্পনা আছে। বোধ হয় সে কার্য্যে বৎসরাধিক অতিবাহিত হইবে। তাহার পর ইচ্ছা আছে, হরিদ্বারের সন্নিকট কন্খলে অবস্থিতি করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিব। সংসারে আর ফিরিব না।

ললিত। আমি মধ্যে মধ্যে কন্খলে গিয়া আপনার চরণ দর্শন করিয়া আসিব।

এই বলিয়া ললিতকুমার সজলনেত্রে মাধবকে প্রণাম করিলেন। মাধব সিক্তনেত্রে ললিতের মুখচুম্বন করিয়া প্রস্থান করিলেন। ললিত অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে, তথাপি মাধব সিদ্ধেশ্বরীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। প্রথম কালী বাড়ীতে গমন করিলেন, তথায় শুনিলেন, সিদ্ধেশ্বরীর কাল হইয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি মাধবের অনেক সন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া হারাধন নামক জনৈক কৃষককে গোপনে তাঁহাকে বলিবার জন্য কি বলিয়া গিয়াছেন। মাধব তখনি হারাধন কৃষকের বাটীতে গমন করিলেন, তথায় শুনিলেন হারাধন কার্য্যোপলক্ষে কোন দূর গ্রামে গিয়াছেন, আসিতে বিলম্ব হইবে। মাধব হারাধনের অপেক্ষা করিতে না পারিয়া সেই রাত্রিতেই দক্ষিণপাড়া ত্যাগ করিয়া মুরশিদাবাদ গমন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মাধব মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে নবাব সুজাউদ্দৌলা তাঁহার সন্ধান করিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। মাধব অবিলম্বে নবাবের নিকট গমন করিলেন। নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হইলে মাধবের অবরুদ্ধ শোকবেগ উথলিয়া উঠিল, তাঁহার বাক্য নিঃসরণ হইল না, কম্পিতদেহে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। নবাব সুজাদ্দৌলা ত্রস্তে মসনদ হইতে উঠিয়া মাধবের কর ধারণ করিয়া তাঁহাকে তুলিলেন এবং আপনার আসনের পার্শ্বে তাঁহাকে বসাইয়া বিস্তর সান্ত্বনা করিলেন। অবশেষে বলিলেন—"মাধব, দুর্ঘটনার কথা আমি সকলি শুনিয়াছি। তোমার অনুচরবর্গের মুখে যে বিবরণ শুনিলাম, তাহাতে

আমার সন্দেহ হইয়াছিল যে হয় রত্নেশ্বর, নয় তাহার পক্ষের লোকেরা, তোমার প্রতি আক্রোশ বশতই হউক, বা রত্নেশ্বরের পুত্র সুধাময়ীর অভিলাষী হইয়াছিল, সেই কারণেই হউক, ষড়যন্ত্র করিয়া অগ্নিদাহে সুধাময়ীকে হত্যা করিয়াছে। নতুবা দক্ষিণপাড়ার ন্যায় বহুতর লোকের বাসস্থান মধ্যে গৃহদাহে সে বালিকার মৃত্যু হইল, অথচ কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না, আমি সে কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। সেই জন্য আমি উজীরের উপর এ বিষয়ের তদন্ত করিবার ভার দিয়াছিলাম। উজীর তোমার অনুচরবর্গের নিকট স্থানীয় লোকের কথাবার্ত্তা ও তাহাদের আপনাপন কর্ত্তব্য জ্ঞাত হইয়া স্থির করিয়াছেন, যে গ্রামের লোকেরা ষড়যন্ত্র করিয়াই সুধাময়ীকে হত্যা করিয়াছে, এবং রত্নেশ্বর সে বিষয়ে একজন প্রধান উদ্যোগী। আমি স্থির করিয়াছি, যে রাজা মণিমোহনের "অনাথা কন্যার হত্যাকাণ্ডের বিচার আমি নিজে করিব, এবং অপরাধিগণকে ঘোরতর দণ্ড প্রদান করিব। এক্ষণে তোমার কি ধারণা আমায় বল।"

মাধব। জাঁহাপনা, আপনি দেশের রাজা। আমাদের শাস্ত্রে বলে, রাজা ভগবানের প্রতিনিধি। পাপ পুণ্যের বিচারকর্ত্তা আপনি, পাপীর দণ্ড এবং পুণ্যবানের রক্ষণের ভার আপনারই উপর ন্যস্ত। সুধাময়ীকে কে হত্যা করিয়াছে ও তাহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যই বা কি ছিল, সে বিষয়ে বিশেষরূপ তদন্ত করিতে আমি পারি নাই, করিবার ইচ্ছাও আমার নাই। সমস্ত দক্ষিণপাড়াবাসীর শিরশ্ছেদন করিলেও আমার সুধাময়ীকে আর ফিরাইয়া পাইব না। সুতরাং হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করিয়া আমার কোন ইষ্টলাভ হইবে না। সুধাময়ী আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল, তাহার সঙ্গে আমার জীবনের সকল কার্য্য শেষ হইয়াছে। দক্ষিণপাড়ার অদূরবর্ত্তী জঙ্গলে সিদ্ধেশ্বরী পাগলিনী বলিয়া এক স্ত্রীলোক বাস করিতেন। লোকে তাঁহাকে পাগলী বলিত, কিন্তু তিনি অদ্ভুত রমণী। তাঁহার অসাধারণ ঐশী শক্তির পরিচয় আমি নিজে জানিতাম, এবং অনেক স্থানীয় লোকেও জানিতেন। রত্নেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ললিতের মুখে শুনিলাম যে আমি ইতিপূর্ব্বে যখন মুরশিদাবাদে ছিলাম, সেই সময়ে সিদ্ধেশ্বরী পাগলিনী আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া আমার সুধাকে ললিতের হস্তে

সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে উভয়ের অদৃষ্টলিপি দেখিয়াই তিনি তাহাদের পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিতেছেন। আমি সিদ্ধেশ্বরীর অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিলাম যে আমার গৃহদাহের কয়েক দিবস পরেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এবং মৃত্যুকালে আমাকে কি বিশেষ কথা বলিবার জন্য আমার বিস্তর সন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান না পাইয়া জনৈক কৃষককে সেই কথা গোপনে আমাকে বলিবার জন্য, বলিয়া গিয়াছেন। আমি সে কৃষককে বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু সে স্থানান্তরে গিয়াছে, কবে আসিবে কেহ বলিতে পারিল না। অবশেষে ভাবিলাম যে সুধাময়ী যখন নাই, তখন আর সংসারের আবশ্যকীয় বা অনাবশ্যকীয় কথায় আমার আর কোন প্রয়োজন নাই। আমি সে কৃষকের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া আসিয়াছি। আপনি আপনার রাজধর্ম্ম পালন করুন, পাপের শাস্তি বিধান করুন। আমি আমার বক্তব্য নিবেদন করিয়া বিদায় হইব। সুধাময়ীর হত্যাকারী যেই হউক, আমি তাহার মুখদর্শন করিব না, বা তাহার পাপ কার্য্যের বিবরণ শুনিব না। এক্ষণে আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। সুধাময়ীর পৈত্রিক সম্পত্তি, সকলি অতিথী সেবায় অর্পণ করিবার মানস করিয়াছি। বিষয় সম্পত্তি ও অতিথশালা তত্ত্বাবধারণ জন্য একজন উপযুক্ত লোকও স্থির করিয়াছি। এ সংসারে আমার সুধাকে আর একজন ভাল বাসিত—সে রত্নেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র ললিত। ললিত সর্ব্বগুণান্বিত এবং আমার পরলোকগত প্রভুর ও আমার উভয়েরই বাসনা ছিল যে ললিতকেই সুধাময়ী অর্পণ করিব। শাস্ত্রানুসারে না হউক, দৈব ঘটনায়, সিদ্ধেশ্বরী কর্ত্তৃক উভয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধও হইয়াছিল। আমার চক্ষে ললিত কুমারই সুধাময়ীর স্বামী। অতএব আমি ললিত কুমারকেই অতিথশালার ও সুধাময়ীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধারক করিবার মনস্থ করিয়াছি। ললিতকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়াছি। সুধাময়ীর শোকে সেও উদাসীন হইয়াছে, তবে আমার অনুরোধে ও সুধার কার্য্য বলিয়া, উভয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে ললিত সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে আমার প্রার্থনা, আপনি আমার অভিপ্রায় অনুমোদন করিয়া ললিতের নিয়োগ প্রেরণের সত্বর আদেশ প্রদান করুন। আমিও আমার উপদেশ পত্র ললিতকে প্রেরণ করিয়া সংসার হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করি।

নবাব। তোমার এ সাধু অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমার কোন আপত্তিই নাই। ললিতের নিয়োগপত্র অচিরে প্রেরণ করা হইবে। কিন্তু তুমি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে? তোমাকে আমার নিকটে থাকিতে হইবে।

মাধব বদ্ধাঞ্জলি করিয়া কহিলেন—"জাহাপনা, আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, আমি অন্ধ হইয়াছি। এ যে চক্ষু দেখিতেছেন ইহা দৃশ্যমান মাত্র, আমি আমার চক্ষের মণি হারাইয়াছি, আমার হৃদয়পঞ্জর চূর্ণ হইয়াছে, আমার পিণ্ড ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, আমার আকৃতি মাত্র অবশিষ্ট আছে, আমার প্রাণ এ দেহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। আমার দ্বারায় জগতের আর কোন কাজই হইবে না। আমি জীবনের অবশিষ্ট কাল কোন নির্জ্জন তীর্থে গিয়া বাস করিব। সংসার আমার চক্ষে শ্মশান। এ শ্মশানে আমি তিষ্ঠিতে পারিতেছি না, আমায় অব্যাহতি দিন।

নবাব। দেখিতেছি তুমি বড়ই কাতর হইয়াছ। এক্ষণে তীর্থ পর্য্যটন করাই তোমার পক্ষে সুপরামর্শ। অবশ্য এখন তুমি তীর্থদর্শনে গমন কর, কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ রহিল যে তুমি একটু সুস্থ হইলে আবার আমার নিকট আসিও। সুধাময়ীর হত্যার প্রতিবিধানের ভার আমার উপর রহিল, আমি অচিরে তাহার বিহিত করিব। এক্ষণে তুমি বিদায় হও।

এই বলিয়া নবাব সুজাউদ্দৌলা মাধবকে বিদায় করিলেন। এবং উজীরকে ডাকিয়া ললিতের নিয়োগপত্র প্রেরণের অনুমতি দিয়া আদেশ করিলেন যে রত্নেশ্বর ও আর আর যে সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে সুধাময়ীর হত্যায় লিপ্ত থাকার সন্দেহ হয়, সে সকল ব্যক্তিই যেন এক পক্ষের মধ্যে নবাব দরবারে উপস্থিত হয়। পক্ষান্তে নবাব নিজে তাহাদের বিচার করিবেন।

ক্রমশঃ।

গুরু শিষ্য।

(১)

গুরু দ্বিবিধ, শিক্ষা গুরু ও দীক্ষা গুরু। গুরু বিনা এই সংসারে একটী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তৃণেরও ভালরূপ পরিচয় সহজে জানিতে পারা যায় না। পশু, পক্ষী, তরু, লতা, গুল্মাদি হইতেও আমরা অনেক সময় অনেক শিক্ষা পাই, সুতরাং শিক্ষা গুরু অনেকেই, শিক্ষা দীক্ষার অনুকূল হওয়া চাই, শিক্ষা দ্বারা চিত্ত সংস্কৃত, মার্জ্জিত ও দিব্যদৃষ্টিযুক্ত হয় এবং দীক্ষা দ্বারা জীবনের পরমারাধ্য পরম দেবতাকে দর্শন ক্রমে জীব কৃতার্থ হয়। উপযুক্ত গুরু ব্যতীত শিক্ষা ও দীক্ষা দিবার অধিকারী কেহই নয়। যিনি সদ্‌গুরু সমীপে শিক্ষিত হইয়া দীক্ষিত হয়েন, তিনিই ধন্যজন্মা।

আমরা শিক্ষা গুরু নিয়া আর কালক্ষেপ করিতে চাহি না, দীক্ষা গুরুর কথাই এখন বক্তব্য। গুরু বলিলে সাধারণতঃ আমরা দীক্ষা গুরুই বুঝি, গুরুকে মনে করিলেই জ্ঞানী বা অজ্ঞানী হউন; সকলেই আপনা হইতে অতি উচ্চ সোপানে অধিরূঢ় স্বর্গীয় পথ প্রদর্শক কোন এক মহৎ পুরুষ বলিয়াই বুঝিয়া থাকেন, এইক্ষণ এই গুরুতর অধিকারী কে তাহাই শাস্ত্র সাহায্যে বিচারের চেষ্টা করিব। শাস্ত্রে আছেঃ—

> "সর্ব্বশাস্ত্রপরোদক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ সদা।
> সুবচঃ সুন্দরঃ স্বন্দঃ কুলীন শুভ দর্শনঃ॥
> জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্তমানসঃ।
> পিতৃ মাতৃহিতে যুক্তঃ সর্ব্ব কর্ম্ম পরায়ণঃ।
> আশ্রমী দেশবাসী চ গুরুরেবং বিধীয়তে॥"

কই! আজ কালের গুরু দলের মধ্যে শাস্ত্রোক্ত গুণের মধ্যে কয়টী পাওয়া যায়।

গুরু ঠাকুর! একটী কথা করযোড়ে বলি, রাগ করিও না, যখন শিষ্য বলেঃ—

> "অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
> চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

তখন তোমার গুরুতার সার্থকতা হয় কিরূপ। তুমি ত তাহার অজ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিতে গিয়া তীক্ষ্ণ শলাকাতে উৎপাটিত করিয়া বসিয়া আছ।

শিষ্য যখন গুরুকে প্রণাম কালে বলেঃ—

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

তখন কি তুমি প্রবঞ্চনা দোষে অপরাধী হও না? তুমি ত তাহাকে চরাচরব্যাপী অখণ্ড মণ্ডলাকার পুরুষ দেখাইতে পার নাই (তুমি ত নিজেই দেখ নাই, তখন আর পরকে কিরূপে দেখাইবে!) তবে সদ্‌গুরুর প্রাপ্য প্রণামটা চুপি চুপি চুরি করিতেছ কেন?

অধুনা চাকুরী বাণিজ্যাদির ন্যায় গুরুতা ও একটী অর্থোপার্জ্জনের উপায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যখন কোন গুরু নূতন একটী শিষ্য জুটাইতে যান, তখন তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহার সাংসারিক অবস্থা কেমন, কোন চাকুরী আছে কি না, এই সব অনুসন্ধান নিয়া থাকেন। তাহার বেদে, দ্বিজে কিরূপ ভক্তি, শাস্ত্রবাক্যে কিরূপ বিশ্বাস, এই সব সংবাদ গ্রহণ করিতে কিন্তু ঠাকুর মহাশয়ের সময়াভাব। এইরূপ দক্ষিণা লাভই যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহারা কি কখনও সদ্‌গুরু পদবাচ্য হইতে পারেন।

শিষ্যের মাথায় পা দিয়া পয়সা লইবার গুরু অনেকই, কিন্তু শিষ্যের ত্রিতাপহারী শান্তিদাতা সদ্‌গুরু বড়ই দুর্লভ। কুলগুরু ত্যাগ না করার প্রথাই, আমাদের এ দুর্দ্দশার কারণ। আমরা স্বীকার করি কুল গুরুর মধ্যেও অনেক সুশিক্ষিত ব্রহ্মনিষ্ঠ আছেন, তাঁহারা অবশ্য সদগুরু বলিয়া পরিগণিত; আমরা তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি। অনেক লোক আজ কাল কুলগুরুগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া দীক্ষা গ্রহণেও পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের ভ্রম। গুরু হাট বাজারে সুধু অন্বেষণ করিলেই পাওয়া যায় না, সৎশিষ্য হইলে ভগবানের কৃপায় সদ্‌গুরু লাভ হইয়া থাকে। ধ্রুব পদ্মপলাশলোচন দর্শনাভিলাষে কাতর হইলেন, ভগবান অমনি নারদকে তাঁহার গুরু স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। মহারাজ পরীক্ষিত ভগবান দর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, দয়াময় অমনি শুকদেবকে তাঁহার সমীপে প্রেরণ করিলেন, ভগবদ্বিরহে কাতর হইলে সদ্‌গুরু আসিয়া আপনিই দেখা দিবেন। নতুবা তুমিও যেমন শিষ্য গুরুও তোমায় তেমনি জুটিবে।

শিষ্যের লক্ষণ যথাঃ—

"অলুব্ধ স্থিরনাত্রশ্চ আজ্ঞাকারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আস্তিকো দৃঢ় ভক্তিশ্চ গুরৌ মন্ত্রেচ দৈবতে।
এবম্বিধোভবেৎ শিষ্য ইতরো দুঃখ কৃদন্তয়োঃ।"

উপসংহার কালে ইহাও বলা আবশ্যক যে গুরু যেমনই হউন না কেন, শিষ্যের তাঁহার প্রতি ভক্তি থাকিলে, দীক্ষামন্ত্রেও ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে, শিষ্য পরম ধামের অধিকারী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীপ্যারীলাল চৌধুরী।

প্রেমের নবাঙ্কুর।

১

নবীন অঙ্কুরে প্রেয়সীর প্রেম,
মরি কিবা সুধা মাখা হেরিলাম,
প্রেম লজ্জা মাখা, পুষ্পপত্র ঢাকা,
কহিনুর যেন বিজড়িত হেম।

২

হৃদয়ে না ধরে মধুর মাধুরী,
প্রকৃতি তনয়া না জানে চাতুরী,
হৃদয়ের আশা, পূর্ণ ভালবাসা,
সযতনে রাখে হৃদয়ে আবরি।

৩

না দেখিয়ে সদা পাগলিনী প্রায়,
দেখা হলে গিয়ে অন্তরে লুকায়,
নয়নে নয়ন, পড়িলে কখন
আনত আননে অন্য দিকে চায়।

৪

দেখিব দেখিব মনে থাকে আশা,
দেখে নাহি মিটে দেখার পিপাসা,
দেখা হ'লে পরে, দেখিতে না পারে
পয়োনিধি পারে কি দারুণ তৃষা।

৫

ফাঁকে ফাঁকে থাকে ফাঁকে ফাঁকে দেখে,
বিরলে গোপনে প্রেমপত্র লেখে,
মনে মনে পড়ি, ফেলি দেয় ছিড়ি
কুড়াইয়া পুন মিলাইয়া দেখে।

৬

অন্তরে হেরিয়ে মনে সাধ হয়,
নিকটেতে যেয়ে দুটী কথা কয়,
কিযে দুটী কথা, মরমের ব্যথা
ভাবিতে অমনি ব্যাকুল হৃদয়।

৭

এক দিন তুলে কুসুম কলিকা,
গেঁথে ছিল সাধে চিকণ মালিকা,
যতন করিয়ে, হৃদয়ে ধরিয়ে
কেঁদে ছিল যেন অবোধ বালিকা।

৮

আর এক দিন নিদ্রার সময়,
অশ্রুবিন্দু মম কপোলে উদয়,
মুছিতে যতনে, গোপনে গোপনে
গিযাছিল কিন্তু কাঁপিল হৃদয়।

৯

কত ভালবাসা ! ছোট প্রাণে আর,
ধরিতে পারে না, প্রেম পারাবার,
উঠিলে উথলি, আকুলী বিকুলি
নয়নের কোণে নিশানা তাহার।

১০

বিরহে ব্যাকুল দিশা নাহি পায়,
মিলনেতে যেন আরো ম'রে যায়,
বুকে মাথা গুঁজি, আঁখি দুটী বুজি
প্রাণে কথা কয় নীরব ভাষায়।

শ্রীমঃ

পূর্ণিমার মূল্য প্রাপ্তি।

সন ১৩০০ সাল।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হুগলী।
,, রাখালদাস ঘোষ, কলিকাতা।
,, মথুরানাথ নাগ, খুলনা।
,, বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তি, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ দত্ত, এলাহাবাদ।
,, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া।
,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, উলুবেড়িয়া।

সন ১৩০১ সাল।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র জানা, মহিষাদল।
,, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা।
,, অক্ষয়কুমার সেন, হুগলী।
,, কুঞ্জবিহারী সিংহ হুগলী।
,, কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চুঁচুড়া।
,, যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক, হুগলী।
,, ত্রিদেবেন্দ্রনাথ শূর, হুগলী।
,, কালীকুমার দত্ত, ঘুঁটেবাজার।
,, হেমশশী সোম, চুঁচুড়া।
,, সাতকড়ি ঘোষ, দ্বারবাসিনী।
,, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, হুগলী।
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হুগলী।
,, ত্রিপুরাচরণ বিশ্বাস, কলিকাতা।
,, বঙ্কুবিহারী ঘোষ, মরাট।
,, কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, হুগলী।
,, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, হুগলী।
শ্রীযুক্ত বিশ্বভূষণ চট্টোপাধ্যায় মেনপুরা।
,, বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা।
,, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া।
,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, উলুবেড়িয়া।
,, নিতাইচাঁদ দত্ত এলাহাবাদ।
,, যোগেন্দ্রনাথ মাইতি মহিষাদল।
,, প্রসন্নকুমার দত্ত, হুগলী।
,, অখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হুগলী।
আশুতোষ মিত্র, নড়াল।
,, বিজয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী, বেঙ্গরেঙ্গের বাজার।
,, রাখালদাস ঘোষ, কলিকাতা।
,, মথুরানাথ নাগ, খুলনা।

ক্রমশঃ।

সীতাচরিত।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল প্রণীত।

মূল্য ॥০ আনা

ডাকমাসুল——৴১০

১৮৯৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে পাঠ্য পুস্তকের তালিকা বাহির হইয়াছে তাহাতে এই পুস্তক মধ্যবৃত্ত বালিকা বিদ্যালয় সমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণর পাঠ্য পুস্তক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সংবাদ পত্র সমূহ কর্ত্তৃক বিশেষ প্রশংসিত।

অতি সরল ও পবিশুদ্ধ ভাষায় এই অপূর্ব্ব জীবন ইহাতে লিপিবদ্ধ হইযাছে। পড়িতে পড়িতে স্থানে স্থানে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। পুস্তক খানি স্কুলের তালিকাভুক্ত হওয়ার সম্পূর্ণ উপযোগী হইযাছে। বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষে এ পুস্তকের ন্যায় পাঠ্য পুস্তক বাঙ্গালায বিরল।

নব্যভারত।

এরূপ পুস্তক আমাদের দেশে অতীব বিরল।——সোমপ্রকাশ।

এই পুস্তক হুগলীতে গ্রন্থকারের নিকট ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

নির্ম্মলা।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল প্রণীত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

ডাক মাসুল ৴১০ দেড আনা।

এই পুস্তক খানি সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা ইহা পাঠ করিযাছেন সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস পাল,
হুগলী।

ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

২য় ভাগ—৮ম সংখ্যা। অগ্রহায়ণ—১৩০১।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সূচী।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

হুগলী.

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ—১৩০১।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হয়। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়াছেন। যাহাতে ইহা স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন আছে। এই পত্রিকা যাহাতে সকলের সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন তজ্জন্য ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাসুল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনার জন্য পুস্ত প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

বিজ্ঞাপন।

হুগলীর চকে সাবিত্রী যন্ত্র নামে একটী ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী বহু প্রকার নূতন অক্ষর আছে এবং কলিকাতার দরে পুস্তকাদি ছাপান হইতেছে। বিশেষ সুবিধা এই, গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে, প্রুফ সংশোধনের ভার রীতিমত লওয়া হইয়া থাকে। চিঠিপত্র চেক দাখিলা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জবওয়ার্ক সুলভ মূল্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাপান হইয়া থাকে। আমাকে লিখিলে বিশেষ বিবরণ সকলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল
ম্যানেজার।
হুগলী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় ভাগ। } অগ্রহায়ণ, সন ১৩০১ সাল। { ৮ম সংখ্যা

মধুময়ী গীতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়—সাংখ্য যোগ।

সঞ্জয় কহিলেনঃ—

কৃপাবিষ্ট বাষ্পাকুল বিষাদিত মন—
অর্জ্জুনে কহেন তবে শ্রীমধুসূদনঃ—১

শ্রীভগবান কহিলেনঃ—

অকীর্ত্তিকর অধর্ম্ম অনার্য্য সেবিত
এ মোহ কেমনে তব হইল উদিত ? ২
কাতর হ'য় না, এত তব যোগ্য নয়,
তুচ্ছ দুর্ব্বলতা ত্যাজি উঠ ধনঞ্জয়। ৩

অর্জ্জুন কহিলেনঃ—

অরিন্দম, করি আমি কিরূপে তা' কহ
বাণযুদ্ধ, পূজনীয় ভীষ্ম দ্রোণ সহ ? ৪
গুরুবধ না করিয়া ভিক্ষান্ন ভোজন
ইহলোকে শ্রেয়ঃ ; করি গুরুর নিধন
অর্থকামাত্মক ভোগ, রুধির সংযুত,
এ লোকে করিতে হ'বে উপভোগ যত ! ৫
জয়ী হই কিম্বা মোরা হই পরাজিত ?
বুঝিতে না পারি কিবা শ্রেয়ঃ সমুচিত।

যাদের নিধন করি বাঁচিতে না চাই,
সম্মুখে সে ধার্ত্তরাষ্ট্র দেখিতে যে পাই! ৬
চিত্তের দীনতা আর কুলক্ষয় দোষে
অভিভূত, ধর্ম্মমূঢ় আমি! সবিশেষে
কহ মোরে, শিষ্য আমি, কি শ্রেয়ঃ বিধান?
আমি ত শরণাগত, কর শিক্ষাদান। ৭
যদ্যপি ধরায় পাই রাজ্য নিষ্কণ্টক,
অথবা দেবাধিপত্য শোক সংহারক,
ইন্দ্রিয় শোষক এই শোকাপনয়ন,
করিবে, কিছুই হেন করিনা দর্শন! ৮

সঞ্জয় কহিলেনঃ—

এত কহি গুড়াকেশ হৃষিকেশ পাশে
"করিব না যুদ্ধ" বলি মৌনী অবশেষে। ৯
হে ভারত, কৃষ্ণ তবে প্রসন্ন বদনে
কহিলেন সেনা মধ্যে বিষণ্ণ অর্জ্জুনে— ১০

শ্রীভগবান কহিলেনঃ—

যাহাদের তরে শোক উচিত না হয়,
শোকার্ত্ত তাদের লাগি হ'তেছ নিশ্চয়!—
কিন্তু জ্ঞানী সম কথা! কভু নাহি শুনি,
মৃত কি জীবিত লাগি শোক করে জ্ঞানী! ১১
না ছিলাম আমি পূর্ব্বে, এমন ত নয়;
হেন নহে ছিল না এ নৃপতি মণ্ডল;
পরেও নিশ্চয় মোরা থাকিব সকল। ১২
কৌমার যৌবন জরা জীবের যেমন
অবস্থা অন্তর মাত্র, মরণ তেমন;
পণ্ডিতেরা কভু নাহি মুগ্ধ হন তা'তে। ১৩
কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়যুক্ত হ'লে বিষয়েতে
শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখ করে উৎপাদন,
অনিত্য, উৎপত্তি নাশ রয়েছে যখন।

অস্থায়ী সে সুখ দুঃখ উল্লাস বিষাদ,
সহ্য কর ; বশীভূত হ'লেই প্রমাদ। ১৪
সমভাবে সুখ দুঃখ করিয়া বহন,
হে ভারত, যেই জন ব্যথিত না হন,
তাঁহারই মোক্ষলাভ হয় সুনিশ্চয়,
অনিত্যে মোহিত যেই তাহার বিলয়। ১৫
অনিত্য বস্তুর সার দেখিতে না পাই ;
নিত্য আত্মা, তাঁর কভু বিনাশ ত নাই।
আত্মা নিত্য, অন্য যত অনিত্য কেবল ;—
দেখেছেন তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত সকল। ১৬
অনিত্য দেহাদি ব্যাপ্ত রয়েছেন যিনি,
জানিবে জগতে মাত্র অবিনাশী তিনি।
উৎপত্তি বিলয়-শূন্য অব্যয় আত্মার
বিনাশ করিতে পারে, হেন সাধ্য কার ? ১৭
নিত্য আত্মা, দেহ তাঁর অনিত্য নিশ্চয় ;
হে ভারত, যুদ্ধ কর, দেহান্তে কি ভয় ? ১৮
এই আত্মা হন্তা যেই করে বিবেচনা,
এই আত্মা হত হয় যাহার ধারণা,
জানেনা উভয়ে তা'রা ! আত্মা সর্ব্বময়
কখনো করে না হত্যা, হত নাহি হয়। ১৯
জন্মে না মরে না আত্মা ; জন্মি একবার
হইবে না সমুৎপন্ন কিম্বা পুনর্ব্বার।
পরিণাম শূন্য আত্মা, নাহি বৃদ্ধি ক্ষয়,
শরীর হইলে নষ্ট, বিনষ্ট না হয়। ২০
অজ নিত্য এই আত্মা, জানেন যে জন,
না করান হত, নাহি করেন হনন। ২১
জীর্ণবাস ত্যাগ করি মানুষে যেমন
অপর নূতন বস্ত্র করয়ে গ্রহণ,

সেইরূপ এই আত্মা নবদেহ ধরে,
পুরাতন জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ ক'রে। ২২
শস্ত্র নাহি পারে আত্মা করিতে ছেদন,
নাহি পারে বহ্নি তাঁ'রে করিতে দহন। ২৩
জলেতে ভেজেনা, নাহি বাতাসে শুকায়,
অনাদি অচল নিত্য স্থির সর্ব্বময়! ২৪
অনিন্ত্য অব্যক্ত আত্মা কর্ম্ম অগোচর,
জানিলে শোচনা নাহি হয় অতঃপর। ২৫
নিত্য জাত নিত্য মৃত মনে যদি হয়,
তথাপি করিতে শোক পারনা নিশ্চয়; ২৬
মরিলেই জন্ম হয়, জন্মিলে মরণ,
অনিবার্য্য এই কার্য্যে শোক কি কারণ? ২৭
আদিতে অব্যক্ত জীব, অব্যক্ত নিধনে,
স্বল্প মধ্যে ব্যক্ত,—তা'তে দুঃখ কি কারণে? ২৮
কি আশ্চর্য্য! কেহ দেখে, কেহ বলে, শুনে,
আত্মার আশ্চর্য্য ভাব তথাপি না জানে! ২৯
ভারত, অবধ্য আত্মা; সর্ব্বদেহে আছে;
সর্ব্বভূত লাগি শোক দুঃখ করা মিছে! ৩০
তোমার স্বধর্ম্ম দেখ, ধর্ম্মযুদ্ধ হ'তে
ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়ঃ কিছু নাই এ জগতে। ৩১
অযাচিত হেন যুদ্ধ মুক্ত স্বর্গদ্বার,
ধন্য সে ক্ষত্রিয় ভিন্ন কে লভিবে আর? ৩২
যদি এ ধর্ম্মের যুদ্ধ না করিতে চাও,
ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম কীর্ত্তি পাপভাগী হও। ৩৩
চির অপযশ তব ঘোষিবেক লোকে;
তা'হতে মরণ শ্রেয়ঃ কহিনু তোমাকে। ৩৪
ভীরু তুমি, জানিবেন মহারথ যত;
সামান্য লোকের কাছে হইবে ঘৃণিত। ৩৫

ক্রমশঃ।

কোন্ ধর্ম্মে ঈশ্বর সেবা, ঈশ্বর পূজার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহজ বিধি বিহিত হইয়াছে ?

বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্ট এবং হিন্দুধর্ম্মের কথা লইয়াই এই প্রবন্ধ গঠিত হইবে। আনুষঙ্গিকরূপে ইহাতে মার্সডিসম্ অর্থাৎ পার্শিদের ধর্ম্মের দুই একটি কথা থাকিবে। সংক্ষেপে বৌদ্ধাদি ধর্ম্মের কথা কহিয়া হিন্দুধর্ম্ম এবং তদন্তর্গত বৈষ্ণবধর্ম্মের স্থূল স্থূল দুই-চারিটি কথার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমরা যতদূর বুঝি বুদ্ধ নিরীশ্বর। "ধম্মপদ" বৌদ্ধদের অতি প্রধান গ্রন্থ। ইহার কোনও স্থানে ঈশ্বর শব্দ লক্ষিত হয় না। কোন কোন স্থানে এইরূপ কথা আছে যথা :—"অনায়াস বিশ্বাসশীলতা শূন্য অস্পৃষ্ট পরিজ্ঞাতা পুরুষ অতি শ্রেষ্ঠ এবং মহান্। যিনি জাগ্রত, সর্ব্বজ্ঞ এবং অননুসরণীয় (the trackless) অর্থাৎ যাঁহার অনুসরণ অসাধ্য এবং যিনি বাসনাজাল জড়িত নহেন, তাঁহাকে কি উপায়ে অবগত হইবে।" কিন্তু অস্পৃষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ, শব্দের অর্থের ব্যাখ্যা "ধম্মপদে" কিছু নাই। এই সকল শব্দ ঈশ্বরবাচক হইলেও ঈশ্বর সেবা, ঈশ্বর পূজার বিধান এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। বুদ্ধদেবের মতে, মানুষ জাগ্রত, পূর্ণ জ্ঞানী এবং সত্যবিধি পরিজ্ঞাত হইলে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। বুদ্ধের কথা, দেহই সকল দুঃখের কারণ। দেহ বিবর্জ্জিত, জন্মরহিত এবং নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে মানুষ বুদ্ধ হন বা বুদ্ধত্ব লাভ করেন। "ধম্মপদে" উক্ত হইয়াছে যে নির্ব্বাণই পুরুষের পরম গতি। জলে সাঁতার দিতে, খেলা করিতে, জল খাইতে আমোদ আছে, আনন্দ হয়। কিন্তু জলে একবারে তলাইয়া যাইলে, ডুবিয়া আর না উঠিলে কি সুখ কি আনন্দ তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেনের কথায় আমরা বলি "চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভাল বাসি।"

মুসলমানদের মতে কোরাণ স্বয়ং ঈশ্বরের বাক্য। কোরাণ পায়গম্বর মহম্মদের কণ্ঠে পরিস্ফুটিত হয়। কোরাণের প্রধান আদেশ :—(১) ঈশ্বর এবং মহম্মদকে পরিগ্রহ এবং বিশ্বাস কর (২) পাঁচ ওয়াক্তা নমাজ পড় (৩) খয়রাত উপবাস এবং হজ্ কর। ইস্লামিস্ম জুডেইস্মের ছায়া হইলেও,

"ঈশ্বরে প্রেম কর" কোরাণে এরূপ কথার বিরলতা দৃষ্ট হয়। "ঈশ্বর এবং মহম্মদকে ভয় কর" কোরাণে এই আদেশেরই বিশেষ ছড়াছড়ি। মহম্মদকে সমর করিতে হইয়াছিল। সমরপ্রিয় জাতির ঈশ্বর বজ্রমুষ্টি, রুদ্রমূর্ত্তি, শাস্তারূপে প্রায় বর্ণিত হইয়া থাকেন। মারিবার, শাসন করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর নিয়ত বেত্রহস্তে অধিষ্ঠিত, ভগবানের এই ভাবটি আমাদের কেমন কেমন লাগে। গোবেড়েন করা গুরু মহাশয়ের পাঠশালে অনেক ছেলে যেতে চায় না।

খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান পুঁথি বাইবেল্। ইহার দুই অঙ্গ, নূতন এবং পুরাতন টেষ্টেমেণ্ট। অরেব্ গিরিশিরঃস্থিত আকাশ সম্ভূত আদেশ সমূহ বাই-বেলের মর্জ্জা স্বরূপ। "ঈশ্বরকে ভয় করিবে" এইটিও ঈশ্বরাদেশ। ইহাও অরেব অচল হইতে মোসেসের শ্রুতি দ্বারে আঘাত করিয়াছিল। "ঈশ্বর ভীতিই জ্ঞানের মূল।" (The fear of God is the beginning of wisdom) বাইবেল এবং ইংরাজের অন্যান্য পুস্তকে এই বাক্যেরও বিস্তর ছড়াছড়ি। কিন্তু "ঈশ্বরে প্রেম কর" এ কথাও উভয় টেষ্টেমেণ্টে দেখা গিয়া থাকে। "হে ইস্রাএল্! সর্ব্বান্তঃকরণে, নিজের সমূহ শক্তি সহকারে, ঈশ্বরে প্রীতি কর।" এই বাক্য ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া ষষ্ঠ ডিউট্রণমিতে উক্ত হইয়াছে। "কোন্‌টি শ্রেষ্ঠতর আদেশ" কোন ফ্যারাসিস্ ব্যবহারজীবের প্রশ্নের উত্তরে ঈশা বলেন "সমস্ত মন, হৃদয় এবং আত্মাসহ ঈশ্বরে প্রেম কর।" ইহাই সর্ব্বোচ্চ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদেশ। বোধ হয় আমরা দেখাইতে পারিব যে গীতা, ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যদেব কথিত ঈশ্বর পূজা, সেবা বিষয়ক বিধি সকল ইহা অপেক্ষা উচ্চ, বিমল, এবং হৃদয়গ্রাহী।

পারসিদের মূল গ্রন্থ জেন্দাবস্তা। ইহা ঈশ্বর বাক্য, এবং জোরেষ্টার মুখে লোকমাঝে প্রকাশিত হয়, পারসিরা এই প্রকার বলিয়া থাকেন। আবস্তায় দুইটী শক্তির (principle) উল্লেখ দৃষ্ট হয়, আহুরা মাজ্‌দা (Ahura Mazda) এবং আঙরা মায়ান্যু (Angra Mainyu) এ দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি। প্রথমটি জগতের শিব, দ্বিতীয়টি অশিব সাধন করিতেছে। ইহারা কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষের ন্যায় নহে। দৃষ্টতঃ জগতে অনবরত একটি দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা চলিতেছে। ইহাই বুঝাইবার জন্য বোধ হয় এই শক্তি দ্বয়ের অবতারণা। জেন্দাবস্তানুসারে পবিত্রতা

লাভই মানুষের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। মৃত্যুই অপবিত্রতা উৎপাদন করে এবং তাহা "সাগদিদ্" (Sagdid) দ্বারা দূরীভূত হয়। "সাগদিদ্" শব্দে কুকুরের দৃষ্টি বলা হইয়াছে। জেন্দাবস্তায় উক্ত হইয়াছে, যে জড় জগৎ স্রষ্টা আহুরা মাসদাকে জোরেষ্টার জিজ্ঞাসা করেন "পবিত্র বাক্য মধ্যে কোন্‌টি প্রবল, কিসে অসুর নাশ, প্রকৃষ্ট আরোগ্য সাধিত, এবং জড় জগতের বাসনা সিদ্ধ হইতে পারে এবং কি করিলে হৃদয় ভাবনাশূন্য হইয়া থাকে। মাস্‌দা উত্তর করেন "পবিত্র বাক্য মধ্যে আমাদের নামই অতি প্রবল, বিজয়ী, মহান্ এবং ফলদায়ী।" তৎপরে আহুরা মাস্‌দা স্বীয় বিংশতি নাম প্রকাশ করত জলাদি উপহার দ্বারা দিবা রাত্রি তাঁহার পূজা করিবার জন্য জোরেষ্টারকে আদেশ করেন। মোটামুটি মাজী ধর্ম্মের ঈশ্বরাধনার এই পদ্ধতি ও নিয়ম। "আমার" না বলিয়া "আমাদের" নাম আহুরা মাস্‌দা কেন প্রয়োগ করিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই।

হিন্দু ধর্ম্মের অতি প্রাচীন, মূল এবং প্রধান গ্রন্থ বেদ। ছান্দগ্য উপনিষদের, ১ম কাণ্ডের ১ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে "মানুষ ওঁ অথবা উদ্গীত শব্দ চিন্তা করিবে।" ওঁ শব্দ অবিনশ্বর ব্রহ্ম বাচক এবং বেদের শীর্ষ স্বরূপ। ওঁ চিন্তা দ্বারা ত্রিধা জ্ঞান উৎপন্ন, মানুষ আপ্তকাম হইয়া থাকে। ইহাই উপনিষদের প্রধান কথা।

ইহার পর পুরাণাদির কথা। পরাশর নন্দন ব্যাসদেব বহুবিধ পুরাণাদি প্রণয়নে তৃপ্তিলাভে অসমর্থ হইয়া অবশেষ দেবর্ষি নারদের উপদেশ মত ভগবদ্গুণ বর্ণন পূরিত পবিত্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অন্যান্য পুরাণাদিতে যেরূপ হউক না কেন, এই পরম পবিত্র গ্রন্থের ২য় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। "ধর্ম্ম প্রোজ্‌ঝিত কৈতব।" অর্থাৎ ইহাতে প্রকৃষ্টরূপে অকৈতব ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। নিজ গূঢ় অভিপ্রায় পরিত্যাগের নাম অকৈতব। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন, প্র শব্দের অর্থে মোক্ষাভিসন্ধি, মোক্ষাভিলাষ পর্য্যন্ত কৈতব অন্তর্গত। তাহাও ভাগবতোক্ত ধর্ম্মে পরিত্যক্ত। ভাগবতে ধ্রুব এইরূপে ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন "নিষ্কাম হইয়া যাঁহারা আপনার আনন্দ স্বরূপ মূর্ত্তিকে পুরুষার্থ জানিয়া ভজনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে আপনার পাদপদ্ম পরম অর্থ।" ধ্রুব মোক্ষ ইচ্ছা করেন।

নাই, স্বীয় গূঢ় অভিপ্রায় ত্যাগে ভগবানের ভজনা করিয়াছিলেন। সর্ব্ব শাস্ত্রের সারভূতা ব্রহ্মস্বরূপিণী বিশুদ্ধা গীতাতেও এই নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা। গীতা এবং ভাগবত বলিতেছেন "সর্ব্বকামনাশূন্য বাসনা বিবর্জ্জিত এবং একবারে লক্ষ্যবিহীন হইয়া ভগবানের ভজনা করিবে।" কি উচ্চ, কি বিমল কি মহান্ উপদেশ। স্বার্থের, নিজের নাম গন্ধ মাত্র নাই। ব্রজ-গোপিকাগণ আত্ম বিস্মৃতা হইয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তি জন্য তাঁহাকে বসন ভূষণ পরাইতেন এবং ভোজন করাইতেন, তাঁহার নিকট নৃত্য গীত এবং তাঁহার পদ সেবা করিতেন।

"সোঽহং" জ্ঞান বলে মানুষ সেই পরব্রহ্ম হইতে পারেন, অদ্বৈতবাদীরা এইরূপ বলেন। সুখ দুঃখ ভাব শূন্য হইয়া পবিত্র জ্ঞানযোগে মানুষ "সেই" হইতে সক্ষম। সুখ দুঃখ বিরহিত, এটি আত্মার কি অবস্থা বুঝা দুষ্কর। আর্য্য মুনি ঋষির ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। অথচ সর্ব্ববিধ জ্ঞান শূন্য এই জড় লেখনীর অবস্থা অদ্বৈতবাদীদের বাঞ্ছনীয়। আমাদের বিবেচনায় ভক্তি বিহীন জ্ঞান শুষ্ক ইক্ষু দণ্ডের স্বরূপ। তাই ভগবানের স্তব কালে ধ্রুব বলিয়াছিলেন "আপনার পাদপদ্ম ধ্যান অথবা আপনার ভক্তজনের কথা শ্রবণে যে সুখ হয় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেও তাহা হয় না। যে সকল সাধু পুরুষ আপনার প্রতি ভক্তি করেন তাহাদের সহিত যেন আমার সাহচর্য্য হয়।" ভক্তিসূত্র গ্রন্থে ভক্তি এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছেঃ—"ভক্তি পরানুরক্তিরীশ্বরে" অর্থাৎ ঈশ্বরে ঐকান্তিকী অনুরাগের নাম ভক্তি। যাহাতে সেই ভক্তি অব্যভিচারিণী এবং ভগবান প্রতি-নিয়ত বিদ্যমান থাকে ধ্রুব প্রহ্লাদ সেই বরই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নির্ব্বাণ, সম্পূর্ণ আত্মলোপেচ্ছা করেন নাই। পরম পবিত্র অমৃতময় সেই আনন্দ নদীতটে থাকিয়া তাহার জল পানে অনন্ত কাল প্রাণ শীতল করিবার জন্য ভগবান পাদ মূলে দীন ভাবে প্রার্থী হইয়াছিলেন।

দেবর্ষি নারদ ধ্রুবকে যমুনা তটস্থ মধুবনে যাইতে বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, ভগবান হরি তথায় নিত্য অবস্থিতি করেন। আরও বলিয়াছিলেন, ভগবান শ্রীহরি দেবগণ মধ্যে পরম সুন্দর। বাস্তবিক সৌন্দর্য্যই আনন্দের উৎস। যথায় সৌন্দর্য্য নাই তথায় আনন্দ কোথায়? এই জন্য নাস্তিক শ্রেষ্ঠ জন ষ্টুয়ার্ট মিলও বলিয়াছেন "ঈশ্বরের ভাব অত্যুচ্চ

সৌন্দর্য্যের"। বৈষ্ণবের হরিও সৌন্দর্য্যময়, পরম শোভার ভাণ্ডার। তাঁহার হরি, শ্যাম সুন্দর মদনমোহন। শাক্তের শ্যামাও পরম শোভাময়ী, সৌন্দর্য্যের আধার। শ্যামসুন্দর গোকুলে শ্যামা হইয়াছিলেন। অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হয় না। শ্যামসুন্দর হইতে সমুৎপন্ন শ্যামা সৌন্দর্য্যময়ী ভিন্ন ভয়ঙ্করী হইতে পারেন না। কালীর ধ্যান সুখপ্রসন্নবদনা, স্মেরাননা, হসন্মুখী ইত্যাদি শব্দ জড়িত। কবিরঞ্জন ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদ সেন নৃত্যশালিনী কালী মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করত উপসংহারে বলিয়াছেন "মম মানস নৃত্যতি, রূপ কি ধরে নয়নে।" প্রকৃতি স্বরূপা কালী দেবী সৌন্দর্য্যধার বলিয়া, করুণাময়ী আনন্দময়ী এবং দক্ষিণা কালী রূপে উক্ত। আর কালী বরাভয় দাত্রী। কাজেই কালী দেবী শাসনকর্ত্রী বজ্রপাণিনী ভক্ত-হৃদে ভয় সঞ্চারকারিণী নন।

গীতা ও ভাগবত কীর্ত্তিত নিষ্কাম ধর্ম্ম শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু হস্তে অধিকতর পরিমার্জ্জিত এবং পরিস্ফুটিত হয়।

মহাপ্রভু মাধুর্য্যরসাশ্রয়ে এইরূপ করিয়াছিলেন। জগৎপতি হইয়া ভক্ত ভাবে আপনাকে নারী কল্পনা করত শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণনাথ বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতেন। বলিতেন "হে জীবন শ্রীহরি! আমার প্রাণ মন চুরি করিয়া কোথায় গেলে। এই যে তোমাকে পাইয়াছিনু, আবার কোথায় লুকাইলে।" কখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করত বাড়ীর অঙ্গন অশ্রুজল পূর্ণ করিতেন। প্রেমাবেশে প্রভুর মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রব সতত বাহির এবং অবিরল ধারায় নয়নজল বিগলিত হইত। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কখন হাসিতেন, কখন কাঁদিতেন এবং কখনও বা নৃত্য গীত করিতেন। মধ্যে মধ্যে কঠোর আছাড় খাইতেন কিন্তু কখনও ব্যাথা কি ক্লেশ বোধ করিতেন না। এইরূপে প্রেমের বন্যা আনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু জগৎ ভাসাইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু আর এক উপায়ে লোককে কৃষ্ণানুরক্ত করিতেন। বলিতেন "তোমরা হরিনাম, কৃষ্ণনাম জপ কর, কলিতে "হরিনাম ভিন্ন জীবের উপায় নাই।" কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ত্রাহিমাং এই শ্লোক পাঠ করত প্রভু পথে চলিয়া যাইতেন এবং লোক দেখিলেই "হরি বল" এই কথা বলিতেন। অনেকেই প্রভুর

কথা মত শ্রীনাম জপ করত ধন্য হইয়াছিলেন। দেখা গিয়াছে যে শ্রীনামের গুণ মাহাত্ম্য এমনই যে জড় জিহ্বায় মাত্র উচ্চারিত হইয়া ক্রমে কণ্ঠগত হইয়া অবশেষে হৃদয়ে বসিয়া যায়। তখন অভ্যাস বশতঃ নাম জপ ব্যতীত লোকের তৃপ্তি হয় না। পরিণামে নাম জপ এত মধুর হইয়া উঠে যে স্নানাহার ছাড়িয়া সাধক কেবল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ করিয়া কালাতিপাত করিতে থাকে। শুককে "রাধা কৃষ্ণ" পড়াইয়া গণিকা পর্য্যন্ত ত্রাণ লাভ করিতে পারে, মীরা বাই এর এই কথাটি নিরর্থক নহে।

এখন পাঠক বোধ হয় বুঝিযাছেন, যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিহিত এবং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু দ্বারা উপদিষ্ট ঈশ্বর সেবাব ঈশ্বর পূজার বিধিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহজ এবং বিমল প্রেমময়।

শ্রীদীননাথ ধর।

ছুটি।

আমার ছুটিব কিছুই প্রয়োজন ছিল না। যথা সময়ে অর্থাৎ দশ ঘটিকার সময় সযত্নপাচিত ভক্ষ্য উদরস্থ করিয়া, এই দেহখানিকে চাপকান চোকা পাগড়িতে যথাযত সুশোভিত করিয়া কর্ম্মস্থলে দৈনিক হাজির হইতাম, আর ভাদ্রের সেই উত্তপ্ত দীর্ঘ বেলাটা আকাশমার্গে ভাসমান সংসার বীতস্পৃহ গৃধিণীর ন্যায় এ কামবা ও কামরা করিয়া বেড়াইতাম। তখন বাস্তবিক কিছু অশান্তি বোধ হইত। কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্য কোনই কার্য্য ছিল না। তাই বলিতেছিলাম যে আমার ছুটির কিছুই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ছুটি যখন হইল তখন ভাবিলাম ইহার সদ্ব্যবহার করিতেই হইবে। বড়লোকে ছুটিতে নানা দেশে বায়ু সেবন করিতে যায়। আমি বড়লোক না হইলেও ইচ্ছা হইল, আমিও কানুজংসন পর্য্যন্ত হাওয়া খাইতে যাইব। তাহার অধিক দূর পারিব না, শুদ্ধ হাওয়া ভক্ষণ করিলেই ত চলিবে না—রেল কোম্পানিকেও কিছু দিতে হইবে, তা না হইলে ষ্টীম চলিবে না, আর উদর কোম্পানিকেও কিছু না দিলে পঞ্চ কর্ম্মচারিই একেবারেই জবাব দিবে। কিন্তু একটু সুযোগ হওয়াতে আরও দূরে যাইবার সুবিধা ঘটিল।

এই সহরে সম্বৎসর বহুলোক কর্ম্মোপলক্ষে বাস করে। ছুটি হওয়ায় ঝটিকাহত বৃক্ষের ন্যায় এই সহরকে নেড়া মুড়া করিয়া তাহারা স্ব স্ব আবাসভূমে চলিয়া গেল। আমিও যথা সময়ে তল্পী লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পশ্চিমে আসিয়া একটী সহরে আড্ডা স্থাপন করিলাম। বাঙ্গালী সর্ব্বত্রই আছে। এই সহরেও বিস্তর বাঙ্গালী, অনেকেই সঙ্গতিপন্ন লোক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কাহারও বাটীতে পূজাদি নাই। ইহার দুইটী কারণ হইতে পারে। হয় এই সহরের বাঙ্গালীরা অধিক মার্জ্জিত নীতির ব্যক্তি, দেব দেবীর অকিঞ্চিৎকর উপাসনায় তাহাদের বিশুদ্ধ চিত্তের স্ফূর্ত্তি হয় না, ধর্ম্মজ্ঞান প্রশস্ত হয় না; নয় তাহারা হিন্দুস্থানীর মধ্যে পড়িয়া নিজ জাতীয়ত্ব হারাইয়াছে। সাহেবদিগের জাতীয়ত্ব বড়ই প্রবল, যেখানে সাহেবের আবাস সেই খানেই তাহাদের জাতীয়ত্বের ভূরি ভূরি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। লনটেনিসগ্রাউণ্ড, ক্লাব, ঘোড় দৌড়ের মাঠ, চার্চ্চ আর কত উল্লেখ করিব। এই জাতীয়ত্বের দরুণই ইংরাজ স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। কিন্তু বাঙ্গালীর জাতীয় ভাব বড়ই দুর্ব্বল। বাঙ্গালী দেশভেদে জাতীয়ত্ব পরিবর্ত্তন করে। যাই হউক এই—সহরে কতিপয় বঙ্গসন্তান মিলিয়া একখানি দুর্গা মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিয়াছিল। পূজা বাঙ্গালীর জাতীয়ত্বের একটী বিশেষ লক্ষণ। সাকার নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধে বহুতর আলোচনা হইয়াছে, আমি তৎসম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতেছি না। কিন্তু এই কথাটী বলিব যে বাঙ্গালী জাতির যদি কিছু জাতীয়ত্বের লক্ষণ থাকে তাহা পূজা পার্ব্বণে। বিশুদ্ধ নৈতিক! তুমি যদি এই সকলকে কুসংস্কার জ্ঞানে উচ্চ উপাসনার অনুপযুক্ত মনে কর, তাহা হইলে এই সকল পূজা পার্ব্বণকে গরীব সেবী বিশুদ্ধ আমোদে পরিণত করিতে পার। কিন্তু বাঙ্গালীর এ জাতিয়ত্বের লক্ষণকে ত্যাগ করিও না। আসুরিক ইংরাজও গির্জ্জায় যায়।

দশমীর দিন—ডাক্তার বাবুর গাড়ী চড়িয়া ভাসান দেখিতে গেলাম। রাস্তায় বড় ভিড় হইয়াছিল। আমরা ভিড় ঠেলিয়া ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইলাম। জাহ্নবীর কূলে ক্রোশাধিক ব্যাপিয়া সরকারি গুদাম চলিয়াছে, তাহার মধ্যে এই ঘাটটী,—অপ্রশস্ত, রাস্তা হইতে অনেক নিম্নে আসিয়া জল স্পর্শ করিয়াছে। একে ঘাটটী নিচু, তাহার উপর আবার

গুদামের উচ্চ প্রাচীর, তদগ্রান্তে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিয়াছে, তাহাদের শাখা ঘাটের মাথার উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। জলের নিকট দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধে চাহিলে মনে হয় যেন পাতালতলে আসিয়াছি।

আমরা ক্রমে ক্রমে জলের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম সম্মুখে অনন্ত প্রসারিণী ভাগিরথী—বর্ষার প্লাবনে একাকার হইয়াছে; অগাধ বারি দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করিয়া ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তাহার প্রশস্ত বক্ষে একখানিও তরণী ভাসিতেছে না। কেবল অনন্ত জলস্রোত আকাশস্খলিত নক্ষত্রের ন্যায় বেগে ছুটিতেছে। প্রণয়ের প্রথম উচ্ছ্বাসের ন্যায় সেই খরধারা সম্মুখে যাহা পাইতেছিল তাহাই ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। সেই প্রবল আবেগে এখনও আলস্য ঔদাস্য আসে নাই, কুল কুল করিয়া কুলের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়া যাইবার বুঝি এ সময় নয়! বঙ্গদেশের জাহ্নবীর শান্ত মূর্ত্তি যে নিয়তই দেখে তাহার নিকট এই খরধারার ভীষণ মূর্ত্তি এক প্রকার ভীতি মিশ্রিত আনন্দময় বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। তখন জ্যোৎসনা মিশ্রিত অন্ধকারের ছায়া আসিয়া জল স্থল আবরিত করিয়াছিল। আমাদের পশ্চাতে বহুদূর ব্যাপিণী জনতা,—সেই মানবস্রোত গমনাগমনে তরঙ্গায়িত হইতেছিল, উল্লাসের কল কল ধ্বনিতে গম্ভীর গর্জ্জিতেছিল। আর সেই জনতা হইতে ধূমোদ্গারী মসালদিপীত আলোক রশ্মি আকাশমার্গে সঞ্চারিত হইয়া বৃক্ষচূড়া প্রভৃতিকে স্বর্ণমণ্ডিতের ন্যায় শোভমান করিয়া তুলিয়াছিল। সেই আলোক রশ্মির ভিতরে বহুসংখ্যক শক্তির প্রতিমা। আ মরি! কি চারু শোভা!

বহুসংখ্যক প্রতিমা! এখানে কথাটী একটু খুলিয়া বলিতে হইল। হিন্দুস্থানীরা কোথাও প্রতিমা গড়িয়া দুর্গা পূজা করে না। তাহারা অনেক স্থলে শ্রীরামচন্দ্রের লীলা করিয়া থাকে; তাহার মধ্যে দুর্গোৎসব একটা বিশেষ অঙ্গ নহে। বীর জাতি বীরত্বের ক্রীড়া করে, বীরত্বের উৎসব করে। দুর্ব্বল বাঙ্গালী নিরীহ আমোদটুকু গ্রহণ করে। তাই রামচন্দ্রের সমস্ত লীলার মধ্যে দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে। পশ্চিমের হিন্দুরা আরও একটী আমোদ করে। তাহারা মুসলমানের সহিত একত্র হইয়া মহরম করিয়া থাকে। এলাহাবাদ, পাটনা প্রভৃতি বড় বড় সহরে অনেক ধনবান হিন্দু

তেজিয়া গড়িয়া মহা ধুমধামের সহিত মহরম করিয়া থাকে। ইহাতে কি বুঝায় ?—যে বহুদিন হিন্দুমুসলমান জাতির মধ্যে প্রতিবেশী সূত্রে একটা দৃঢ় সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল, যে সৌহৃদ্যবলে হিন্দু মুসলমানে এক হইয়া আমোদ করিতে পারে। ইংরাজকৃত ইতিহাস আমরা জন্মাবধি পড়িতেছি, তাহা হইতেই জানিয়াছি যে মুসলম নের পক্ষপাতী শাসনে হিন্দু প্রজারা জর্জ্জরিত হইয়াছিল, এবং সহৃদয় নিরপেক্ষ ইংরাজ শাসন যদি ধীরে ধীরে স্বপ্রভাব বিস্তার করিয়া অত্যাচারী মুসলমানদিগকে সিংহাসন হইতে বিচ্যুৎ না করিত তাহা হইলে মুমূর্ষ হিন্দুজাতি এতদিনে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে লুপ্ত হইত। কিন্তু যখন দেখি যে পশ্চিমাঞ্চলের তেজস্বী হিন্দু ধর্ম্মোন্মাদী মুসলমানের সহিত একত্রে মুসলমান ধর্ম্মউৎসবে মাতিয়া উঠে তখন আমাদের সেই বাল্যপঠিত ইতিহাসের বিশুদ্ধ সত্যতা সম্বন্ধে কেমন একটা সংশয় জন্মায়। শতাধিক বৎসরের অধিক হইল, ইংরাজের সুশাসনে ভারত সুসভ্য হইয়া উঠিয়াছে, ইংরাজের নিরপেক্ষ শাসনে হিন্দু মুসলমান সমান সুখী। এমন সুশাসন ও সভ্যতার মধ্যে হঠাৎ হিন্দু মুসলমানের সেই পুরাতন সৌহৃদ্য সূত্র ছিন্ন হইল কেন? কেন আজ উদ্ধত মুসলমান হিন্দুর ধর্ম্মপ্রাণে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। কেনই বা হিন্দু মুসলমানের মহরম ছাড়িয়া তাহাদের ধর্ম্মাচরণেব প্রতিবন্ধকতা করিয়া গৃহ বিবাদের বিষম বীজ ভারতের ভবিষ্য ভাগ্যক্ষেত্রে রোপিত করিতেছে। এত দিনের উদার শিক্ষার পর হঠাৎ এই প্রবল ধর্ম্মোচ্ছ্বাসের কারণ কি? কে এই দারুণ সমস্যার অন্তঃচ্ছেদ করিবে? সত্যের ইতিহাস কবে লিখিত হইবে?

এই সহরের হিন্দুস্থানী এ বৎসর মহরমে যোগ দিবে না সঙ্কল্প করিয়াছে। তাই তাহারা বাঙ্গালীর দেখা দেখি দুর্গা প্রতিমা গড়িয়া পূজা করিয়াছে। আমোদ করিবার জন্য হিন্দুস্থানীদের পূজা। কেহ কেহ দুর্গার প্রতিমা না গড়িয়া কালীর মূর্ত্তি গড়িয়াছে। ভাসানে প্রায় শতাধিক প্রতিমা আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে বিস্তর কালী মূর্ত্তি ছিল। গঠনের কোন সৌন্দর্য্য নাই। সাজ সজ্জার আধিক্য আছে, পারিপাট্য নাই। শুনিলাম অনেক দেবীই পূজা পর্য্যন্তও পান নাই। পাঠক আর একটী কথা শুনিলে বিশ্বাস করিবেন কি? পূজার সময় নাকি পুলিসের মহাপুরুষেরা একটী

ফরম লইয়া যেখানে যেখানে পূজা হইয়াছিল সেইখানে সেইখানে গিয়া লিখিয়া লইয়াছে যে এ পূজা কাহার, নূতন না পুরাতন, এই পল্লীর মুসলমানেরা ইহাতে সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট! বাঙ্গালীর বারারি পূজাস্থলেও ঐরূপ জুলুম হইয়াছিল। কিন্তু জনৈক ব্যক্তি সংবাদ পত্রে ঐ কথা প্রচার করিব বলায় শান্তির (?) অনুচরবর্গ সরিয়া পড়েন।

কিন্তু আমার এই পলিটিকস তত্ত্বের প্রয়োজন? ভাসানের কথা বলিতে ছিলাম, সেই কথাই বলি। এক এক খানি প্রতিমা আসিতে ছিল, সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাদকের দল। বঙ্গদেশে ঢোলের ও কাঁসির অসংলগ্ন কর্কশ বাদ্য শুনিয়া কর্ণ যেমন পীড়িত হয় এখানে সেরূপ নয়। এখানে ফ্লুট বংশী বাদিত হইতেছিল। বিদায়ের সেই মৃদু বিষাদময়ী গীতি আমরি! কি কোমল, কি মর্ম্মস্পর্শী! বংশী যেন বিদায়ের অসহ্য যন্ত্রণায় মরমে মরমে গুমরিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। বুঝি দর্শক-দিগকেও সেইরূপ আকুল করিয়া কাঁদাইতেছিল। ঐ নির্জ্জীব নির্গুণ একখণ্ড কাষ্ঠের এমন কি শক্তি যে এই সুসংস্কারে মার্জ্জিত আঁটা সাঁটা প্রাণটাকেও দ্রবীভূত করিতেছিল। উহার স্বর আমায় এত মিষ্ঠ লাগে কেন? ওহো বুঝিয়াছি, ঐ কাষ্ঠখণ্ড এখন আর নির্জ্জীব নির্গুণ কাষ্ঠখণ্ড নয়। উহা যে গায়কের আবেগপূর্ণ প্রাণের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে সজীবতা লাভ করিয়াছে, তাই আপনি কাঁদিয়া প্রাণের উচ্ছ্বাস আমার প্রাণের ভিতরে ঢালিয়া দিতেছে। এখন বুঝিলাম জড়ে অজড়ে কি সূক্ষ্ম অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ! ইহাই ত পৌত্তলিকতা।

প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইল। আলো ও আসিয়াছিলাম, অন্ধকারে ফিরিলাম, হাসি প্রাণে আসিয়াছিলাম, বিষাদ মনে ফিরিলাম। বাটীতে সিদ্ধি মুখ করিয়া মৌলিক প্রথানুসারে যথাযথ প্রণাম নমস্কার আলিঙ্গন করিয়া হৃদ্যতা করিলাম।

এখন, বিশুদ্ধ নৈতিক! তুমি আমাকে কুসংস্কারক বলিয়া ঘৃণা করিতে পার, অনন্ত শক্তিকে শান্ত ও সীমাবদ্ধ করিয়াছি বলিয়া ক্রুদ্ধ হইতে পার, কিন্তু ভাই এস, আজ এই মধুর মিলনের দিন, তোমায় আমায় প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া 'শান্তের' বিশ্বব্যাপী 'অনন্তত্বের' শিক্ষা দেই। শ্রীদ

মৃত্যু।

শিশির-শীতলা, ভূরি পরিমলা,
সুবাস-সুলভা, সহাস মুখী,
প্রকৃতি-ললাম ফুল কুল রাণী
পত্রাবগুণ্ঠনে বদন ঢাকি,—
সুনীল আকাশে, তারা চেয়ে চেয়ে,
রজনীর কোলে মাথাটি রাখি,—
অই যে ঘুমায়ে,———ঘুমন্তে হাসিছে
পবন-হিল্লোলে হেলায়ে আঁখি ;—
হায় কি বিচিত্র এ বিধি বিধির,
তারো হাসি মাঝে,—সুখান্তরালে—
মরণের বীজ প্রচ্ছন্নে নিহিত !
হাসিছে,—অচিরে মরিবে বলে।

* * *

বসন্ত আগমে বনস্পতি শিরে
শ্যামল বিকচ উজ্জ্বল অতি
কত অগণিত পত্র উপজিত,—
নববাসাবৃত প্রকৃতি সতী !
সঙ্গে সঙ্গে নানা ফুলের সম্ভার,—
সুন্দর সুঠাম চারুভূষণ—
আনি ঋতুপতি দেন পরাইয়া,
গায় পিক অলি, নাচে খঞ্জন।
ক'দিনের তরে কিন্তু এ সুষমা ?
নিদাঘ-নিশ্বাসে শুকায় ফুল,
গায় না কোকিল, নীরব ভ্রমর,
শিশির-পরশে ঝরে মুকুল।

* * *

এ পরিবর্ত্তন নয়-কি মরণ ?
শাশ্বত সৃষ্টির অভিব্যক্তিবৎ
ষড়ঋতু ঘোরে কালচক্র পথে,
জন্মে, মরে,—তাই চলিছে জগৎ।

* * *

অই যে স্থবির শতবর্ষ বয়া,
স্তিমিত চৈতন্য, জরাজারিত,
অপগত স্মৃতি, বল বিরহিত,
পরমুখাপেক্ষী, শিশুর মত ;—

মরে নাই আজো—যে বলে, সে মূঢ়,—
মরিতে মরিতে এ দশা তার।
'কল্যের' মৃত্যুতে 'অদ্যের' জনম
'অদ্য' মরে' কল্য আসে আবার।

* * *

শত বর্ষ পূর্ব্বে ছিল এ স্থবির
হেন দন্তহীন অস্ফুটভাষী ;—
কিন্তু, তখন তাহার ও মুখ মণ্ডলে
খেলিত স্বর্গীয় সুমিষ্ট হাসি।

জননী উহার কতনা আদরে
চুম্বিতেন চারু নিটোল মুখে ;
আধ আধ বাণী অমৃত-সিঞ্চিত
শুনিয়া তুলিয়া নিতেন বুকে।
'শৈশব' মরিলে, 'কৈশোর' আসিলে,
কত খেলেছে সবয়া সনে।

'কৈশোর'—মরণে, নবীন যৌবনে,
কত নবভাব পুষেছে মনে।
কত না সুন্দরী রূপের মাধুরী
হেরে বিমোহিত হ'ত তখন,

কত রঙ্গ রসে, হাস্য পরিহাসে
কেটেছে সুখের গত-জীবন।
'যৌবন' মরিলে, প্রবীণে সাজিয়া,
বিতরেছে কত 'সদুপদেশ';
একে একে শেষে খসেছে দশন,—
পেকেছে, পড়েছে মাথার কেশ।
'প্রৌঢত্ব' মৃত্যুতে এ দশা বার্দ্ধক্যে,
তদন্তে শৈশব আসিবে আশু।
শুধু শেষের মৃত্যুকে মৃত্যু বলে লোকে,
কিন্তু, ভেদাভাব দেখে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু।
কায়া-বিনিময় শুধু মৃত্যু নয়,
দশান্তর প্রাপ্তি মৃত্যু লক্ষণ;—
দিনে দিনে দেহী, প্রতি পলে পলে,
পূর্ব্বভাব ত্যাজি,—হয় নূতন।
যথা আলো-ছায়া, অনল-অনিল,
জোছনা যামিনী,—চির দোসর,—
জীবন মরণে তেমনি মিলনে;—
না ম'লে, মরতা না লভে নর।
মরিতে মরিতে মিলন অমৃতে;
অমৃত লভিতে যে পথে গতি,
রেখেছেন তাহে দূরত্ব জানা'তে,
মৃত্যু-কাষ্ঠদণ্ড* জগতের পতি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল।

হিন্দুতীর্থ।

ওঁকারনাথ।

মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত নিমার অথবা খাণ্ডোয়া জেলার মধ্যে মান্দাতা নামক একটী স্থান আছে। ওঁকারনাথ সেই মান্দাতার নিকট নর্ম্মদা

*Mile-Post.

নদীর অপর পারে অবস্থিত। খাণ্ডোয়া হইতে ওঁকারনাথ যাইতে হইলে হোলকার ষ্টেট রেলওয়ে যাইয়া নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী খেঁড়িঘাট নামক একটী ষ্টেসনে নামিতে হয়। সেই ষ্টেসন হইতে ওঁকারনাথ ৭ মাইল। খেঁড়িঘাট হইতে ওঁকারনাথ যাইবার বেশ পাকা রাস্তা আছে, যাওয়া আসার জন্য গরুর গাড়ীও পাওয়া যায়।

খেঁড়িঘাটে নর্ম্মদা তীরে একটী বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী আছেন, তাঁহার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর হইবে। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় জানিলাম যে তিনি প্রায় ২৫ বৎসর হইল ঐ অঞ্চলে আছেন। ৩। ৪ বৎসর হইল তিনি খেঁড়িঘাটে নর্ম্মদার তীরে একটী ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিয়া সেখানে বাস করিতেছেন। সাধু সামন্ত বা অন্য কোন আগন্তুক তথায় উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে আহারাদি দিয়া সেবা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় নিজের আশ্রমে কোন প্রকার দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন নাই ও তাহার আবশ্যকতাও স্বীকার করেন না, প্রণবাদি মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারীজীর খুব দয়ালু প্রকৃতি, নানা প্রকার কঠিন পীড়ার ঔষধাদি জানেন এবং তদ্দ্বারা সে দেশের অনেক লোকের উপকার করিয়া থাকেন। একজন সেদেশীয় ধনী বণিককে কোন কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য করায় সেই বণিক তাঁহাকে বহু টাকা খরচ করিয়া এই সুন্দর আশ্রমটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মচারীজীর জন্মস্থান এই হুগলী জেলাতে, ব্রাহ্মণের সন্তান। নাম ধামাদি বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসায় কহিলেন যে এখন আর সে পরিচয় দিবার ইচ্ছা করি না।

এই ব্রহ্মচারীজী কহিলেন যে ওঁকার নামে ওঁকারনাথ নামক একটী মহাদেব আছেন কিন্তু সেই মহাদেবের নামানুসারে ওঁকারনাথের নাম ওঁকারনাথ হয় নাই, ওঁকারনাথ ঐ পাহাড়ের নাম। বাস্তবিক আমি ঐ পাহাড়ের চারি দিক ঘুরিয়া বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি যে পাহাড়টীর আকার ও গঠন কতকটা ওঁ এর মত।

এই ওঁ আকৃতি পাহাড়টীর দৈর্ঘ প্রায় দুই মাইল, প্রস্থে সিকি মাইল ও উচ্চ প্রায় ১০০০ হাজার ফিট হইবে। ইহার সম্মুখ দিয়া পূর্ব্ববাহিনী নর্ম্মদা নদী গম্ভীর শব্দ করিতে করিতে অতি খরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে এবং এই পাহাড়ের মস্তকদেশ হইতে নর্ম্মদার একটী শাখা

বহির্গত হইয়া (এই শাখাকে স্থানীয় অধিবাসীরা কাবেরী, কহে) পাহাড়টীকে বেষ্টন করিয়া আবার পাহাড়ের পাদদেশে মূল নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাতে পাহাড়টীকে একটী দ্বীপের ন্যায় দেখা যায়।

এই পাহাড়ের উপরে উঠিলে চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। সেই স্থানের চতুর্দ্দিকেই পাহাড়। নর্ম্মদা নদীর উভয় কূল আমাদের দেশের নদীর বাঁধের ন্যায়, নানা প্রকার বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ পাহাড় শ্রেণী প্রাচীরের মত মস্তক উন্নত করিয়া শোভা পাইতেছে। ইহাতে উক্ত স্থানের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সাধকের প্রাণে বিশেষ ভাবে প্রবেশ করিয়া সেই অনন্ত বিশ্ব নির্ম্মাতা মহান পুরুষকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই জন্যই বোধ হয় এই স্থান হিন্দু সাধকদিগের একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই পাহাড়ের পাদদেশে একটী ছোট সহরের মত বাজার আছে, সেই বাজারের মধ্যস্থলে ওঁকারনাথ নামক মহাদেবের মন্দির; এই মহাদেব দর্শনের জন্য নানা দেশ হইতে হিন্দুতীর্থ যাত্রীগণ আসিয়া মহাদেব দর্শন ও তাঁহার পূজাদি দিয়া থাকেন। এ দেশের লোকেরা শ্রাবণ মাসকে খুব পুণ্য মাস মনে করেন, সেই জন্য এই মাসে এখানে যাত্রীগণের অত্যন্ত ভীড় হইয়া থাকে। অধিক পুণ্য লাভের প্রত্যাশায় এই স্থানে অনেক সামন্ত শ্রাবণ মাস বাস করিয়া থাকেন।

এই ক্ষুদ্র বাজারের পূর্ব্বদিকে কিছু দূরে ঐ পাহাড়ের মধ্যদেশে কয়েকটী গুহা আছে তাহাতে কয়েকজন সাধু বাস করিয়া থাকেন। এই অল্প সংখ্যক সাধুদের এক এক জন এক সম্প্রদায় ভুক্ত, সকলের গুহাতেই দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে এবং প্রায় সকলেই গাঁজা ভাঙ্গাদি খাইয়া থাকেন।

এইরূপ একটী গুহাতে তথায় মৌনী বাবা বলিয়া খ্যাত আমার একটী শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম বন্ধু সাধু প্যারিলাল ঘোষ মহাশয় থাকেন। তিনি কোন প্রকার নেশাদি করেন না এবং তাঁহার গুহাতে কোন দেব দেবীরও মূর্ত্তি নাই। আমি তাঁহার গুহাতেই কয়েক সপ্তাহ ছিলাম।

প্যারিবাবু এই ওঁকারনাথ আসিবার পূর্ব্বে চিত্রকুটের একটী গুহাতে (১৷৷০) দেড় বৎসর ছিলেন, তাহার পর প্রায় (৩৷৷০) সাড়ে তিন বৎসর হইল

ওঁকারনাথে আসিয়াছেন। (এখানে বলা আবশ্যক যে ১ বৎসর ৪ মাস গত হইল অর্থাৎ গত বৎসর শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের কয়েক দিন পর্য্যন্ত আমি তাঁহার গুহাতে একত্রে ছিলাম) এই ওঁকারনাথে আসিয়া তিনি সাধনের কঠোরতা এতদূর বৃদ্ধি করিয়াছেন যে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য ও সাধন ভজন দেখিয়া আমার মহাত্মা বুদ্ধদেবের কথা স্মরণ হইত, বাস্তবিক তাঁহার বৈরাগ্য ও সাধন দেখিলে তাঁহাকে দ্বিতীয় বুদ্ধদেব বলিয়া বোধ হয়। তিনি বঙ্গ দেশের কোন মাইনর স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন, ইংরাজী ও বাঙ্গালা লেখা পড়া বেশ জানেন। তাঁহার স্ত্রী নাই কিন্তু একটী কন্যা আছে এবং ভ্রাতা ভগ্নি প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন অনেকেই আছেন। তিনি এই সকলের মায়া ও সাংসারিক সুখাভিলাষ তুচ্ছ করিয়া ভগবানকে পাইবার উদ্দেশে এই স্থানে কঠোর সাধনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার সাধনের নিয়ম এই,—তিনি ভোরে উঠিয়া শৌচাদি করিয়া একটী বিশেষ আসনে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হন, তাহার পর মধ্যাহ্ন সময়ে ১০। ১৫ মিনিটের জন্য একবার উঠিয়া স্নানাদি করিয়া আবার ধ্যানে নিমগ্ন হন। ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে উঠিয়া এক পোয়া আন্দাজ দুগ্ধ ও কিঞ্চিৎ বেলপত্র বাটা আহার করিয়া পুনরায় ঘণ্টা খানেক বাদে সাধনাতে নিযুক্ত হন। রাত্রে দুই তিন ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যান, কোন কোন দিন আরও কম নিদ্রা যান বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কঠোর সাধনাতে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু অতি সামান্য মাত্র দুগ্ধ পান করেন বলিয়া তাঁহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এত শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন যে দেখিলে একটী মাংসহীন কঙ্কালদেহ একখানি পাতলা চর্ম্মে আবৃত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে স্থানীয় অন্যান্য সাধুগণ অত্যন্ত দুঃখিত, তাঁহারা আমাকে কহিলেন যে "আহার না করিলে শরীর কখনও থাকিবে না, তুমি আহার করিবার জন্য মৌনী বাবাকে বিশেষ ভাবে বল ও গীতার বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাও।" বাস্তবিক আমিও প্যারি বাবুর শরীরের অবস্থা দেখিয়া আহার বৃদ্ধির জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি লিখিয়া বলিয়াছিলেন যে "ঈশ্বরের আদেশে বাধ্য হইয়া আমাকে আহার ত্যাগ করিতে হইয়াছে, আমি ইচ্ছা করিয়া

আহার ত্যাগ করি নাই, তিনি আদেশ করিলে পুনরায় আহার বৃদ্ধি করিব। আমি আসিবার সময় দেখিয়া আসিয়াছি তিনি দুগ্ধের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন। তিনি বাক্য বন্ধ করিয়া আছেন বলিয়া সেখানে তাঁহাকে মৌনী বাবা বলিয়া সকলে অভিহিত করেন। আমার সহিত তাঁহার লেখা লেখি দ্বারা সাধন ভজন সম্বন্ধীয় কিছু কিছু কথা হইত।

তিনি এখন যোগ সাধন করেন, কোন্ মানুষ গুরুর নিকট কোন দিন কোন উপদেশ লাভ করেন নাই। কিন্তু তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে যদিও তিনি এ পর্য্যন্ত কোন মানুষ গুরু স্বীকার করেন নাই বা সাধন ভজন সম্বন্ধীয় কোন কথা এ পর্য্যন্ত কোন মানুষকে জিজ্ঞাসা করেন নাই বটে, কিন্তু সূক্ষ্মদেহধারী আত্মাগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সাধনাদি সম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশাদি দিয়া থাকেন। প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছি যে মহাত্মা শঙ্কর অর্থাৎ মহাদেব তাঁহাকে বিশেষ ভাবে উপদেশাদি দেন। মহাদেবকে তিনি একজন খুব বড় যোগী পুরুষ মনে করেন ও মানবাত্মা যে শ্রেণীর আত্মা মহাদেব সে শ্রেণীর আত্মা নহেন কিন্তু মানবাত্মা হইতে উন্নত আর এক শ্রেণীর আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করেন।

তাঁহার সাধনাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় যে সমস্ত কথা আমাকে লিখিয়া জানাইতেন তাহা আমার নিকট আছে, পাঠকদিগের গোচরার্থ তাহার কোন কোন স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "কাহারও নিকট কোন দিন কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই, কেবল ভগবানের নিকট কাঁদিয়াছি, তিনি বাধ্য করিয়া আসন প্রাণায়াম মনসংযম করিয়া দিয়াছেন। অদ্য কয়েক দিন হইল দেখিতেছি আর নিদ্রার প্রয়োজন নাই। কারণ নিদ্রা গেলেই এমন এক প্রকার অনুভূতি হয় যাহাতে যোগের নাশ হয়। এক কথায় ভগবান জীবন্ত জাগ্রত, যে তাঁহার শিশু সন্তান হইতে পারে তাহার অন্তর বাহিরে কোন অভাব থাকে না।" আর এক স্থানে—"কি বলিব এই অহংকারের বিনাশ জন্য কি যাতনা না আমি পাইয়াছি। এইরূপ দিন গিয়াছে এই স্থানে পড়িয়া যাতনায় ছটফট করিয়াছি। * * * এক কথায় আমি একবার বিকলাঙ্গ হইয়া গিয়াছিলাম। সমস্ত কেরদানী ছাড়িয়া দিয়া যতই পিতার চরণেআত্মা সমর্পণ করিতে পিতা দিতেছেন ততই দিন দিন যেন পিতা আমাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর রাজ্যে উঠাইয়া

হ্ইতেছেন। কিন্তু শিশু হওয়া সহজ ব্যাপার নয়, তাঁহার অপার কৃপা ভিন্ন এই প্রকার হয় না। * * * এ সকল বলিবার সময় নাই। জাগ্রত জীবন্ত পিতার কথা, যদি কখন পিতার আদেশ গ্রহণ করিতে পারি প্রতিদ্বারে বলিব। এখন দয়াময়ের কৃপায় আমি, আমি আব ইহলোকবাসী নয় পরলোকবাসী। আমি পিতার চরণে ডুবিয়া রহিয়াছি।" আর একস্থানে "যেমন, চিত্ত এবং বুদ্ধিকে তোমরা জ্ঞান বলিয়া থাক, তাহা জ্ঞান নয়। জ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক সম্পত্তি। এই তিনের বিনাশ আছে জ্ঞানের কখন কোন অবস্থায় বিনাশ নাই। এই তিন জাতীয় গুণ। জ্ঞান ভগবানের অপার কৃপায় উৎপন্ন হয়।" ইত্যাদি, তাঁহার এই সমস্ত উক্তিতে চিন্তাশীল ও সাধনশীল পাঠকগণ তাঁহার ধর্ম্মজীবনের ও সাধন ভজনের গভীরতা কতদূর তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন।

প্যারি বাবুর বর্ত্তমানে পৃথিবীর সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, আমি এতদিন তাঁহার গুহাতে ছিলাম কিন্তু আমাকে আমাদের সমাজ সম্বন্ধে কি কলিকাতায়, কি তাঁহার ভ্রাতা ভগ্নি বা বন্ধু বান্ধব প্রভৃতির কাহারও কোন কথা কোন দিন জিজ্ঞাসাও করেন নাই। কেবল একমনে সর্ব্বদাই ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁহাব সহিত যে সাধন ভজন সম্বন্ধীয় কথা কহিতাম শেষে তাহাও তিনি ইচ্ছা করিতেন না। একদিন স্পষ্ট লিখিয়া দিলেন যে "ভাই! আমার সময় এখন বড় অমূল্য, এখন আমার এরূপ অবস্থা যে ধর্ম্মালোচনা বা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি করাকেও সময় নষ্ট বলিয়া বোধহয়, সুতরাং এখন এ সমস্ত কথা বলিবার সময় নাই, যদি ভগবান কখন দিন দেন, তবে তাঁহার করুণার কথা দ্বারে দ্বারে বলিব।"

এখানকার সকল লোকেই ইহাঁকে খুব বড় মহাপুরুষ বলিয়া মনে করেন। স্থানীয় গুহাবাসী সাধুরা আমাকে বলিয়াছেন যে "আমরা অনেক সাধু দেখিয়াছি কিন্তু এমন সাধনাতে নিমগ্ন কোন সাধুকে কখনও দেখি নাই।" সাধারণ লোকের ত কথাই নাই, তাহারা সকলে এই মৌনী বাবার দর্শন প্রত্যাশী হইয়া গুহা দ্বারে বসিয়া থাকে, সকালে সন্ধ্যায় যখন শৌচাদির জন্য মৌনী বাবা বহির্গত হন তখন তাহারা ইহাঁকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া আপনাদিগকে মহা পুণ্যবান মনে করে। বিশেষ একাদশীর

দিন বহু সংখ্যক লোক বেলা ৪টা হইতে ইহাঁর গুহা দ্বারে বসিয়া থাকে, সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ইনি বাহির হইলে ইহাঁকে দর্শন করিয়া যাইয়া জল গ্রহণ করিবে।

এখন একজন স্থানীয় শেঠ (মহাজন) মৌনী বাবার সেবাদি করিয়া থাকেন। মৌনী বাবার প্রতি এই শেঠের এতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তি যে এক দিন শেঠ কথায় কথায় আমাকে বলিয়াছিলেন যে "আমি মৌনীর জন্য নিজের জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারি।" এই শেঠের সংসারিক অবস্থা পূর্ব্বে অত্যন্ত খারাপ ছিল, ইনি মাসে মাসে মৌনী বাবাকে আহারাদি দ্বারায় তৃপ্ত করিতেন। ক্রমে ক্রমে এখন সেই শেঠের সাংসারিক অবস্থার এত উন্নতি হইয়াছে যে তিনি তথাকার লোকের মধ্যে একজন গন্য মান্য লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাস এবং সেই শেঠেরও বিশ্বাস যে মৌনী বাবার কৃপাতেই তাহার অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছে। এই শেঠ প্যারি বাবুর গুহাটীকে ১০০। ১৫০ টাকা খরচ করিয়া সুন্দর করিয়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং একজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন যে সে গুহাদি পরিষ্কার করে এবং দুগ্ধ ও বেলপত্র প্রভৃতি মৌনী বাবার আবশ্যকীয় সমস্ত আনিয়া দেয়।

আমি এই মৌনী বাবার গুহাতে পাঁচ সপ্তাহ ছিলাম। ঐ শেঠই আমাকে অযাচিত ভাবে প্রত্যহ বেলা ২। ৩ টার সময় উক্ত ব্রাহ্মণের দ্বারায় ডাল রুটী পাঠাইয়া দিতেন, আমি তাহাই পরম সুখে আহার করিতাম। আমি আর নিজের কি লিখিব, এক কথায় এখানে ভগবানের কৃপায় আমি আমার অভিপ্সিত বিষয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া, অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিতে বহির্গত হই। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল, পাঠকগণ হয়ত বিরক্ত হইতে পারেন সুতরাং অদ্য এই স্থানে ইতি। শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন।

সুধাময়ী।

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সুধাময়ীর দিনও চলিয়া যাইতেছে। দুঃখের দিনও চলিয়া যায় বটে, কিন্তু সকলকার দিন যেমন করিয়া চলিয়া যায়, দুঃখির দিন তেমন করিয়া

যায় না। তুমি কায শেষ করিবার সময় পাও না, দুঃখী সময় শেষ করিবার কায পায় না। তোমার মুহূর্ত্ত, পল, দণ্ড কখন আসে কখন যায়, তাহা তুমি জানিতেই পার না, কিন্তু দুঃখীর পল, দণ্ড, মুহূর্ত্ত তাহার চক্ষের মণির উপর দিয়া যাতায়াত করে, তাহাদের প্রতি পদক্ষেপে তাহার হৃদয়-পঞ্জর ভাঙ্গিয়া যায়। সময় যে অনন্ত, কালের গতি যে ভীষণ কালের কার্য্য যে সর্ব্ববিধ্বংশী, তাহা এ সংসারে যে দুঃখী, সেই কতক অনুভব করিতে পারে, যে সুখী সে কালের কোন পরিচয়ই রাখে না।

সুধাময়ীর দৈনিক কার্য্য বিশেষ কিছুই ছিল না। দক্ষিণপাড়ায় তাহাকে সংসারের সকল কার্য্যই করিতে হইত। তবে ক্ষুদ্র সংসারের ক্ষুদ্র কায। একজন পরিচারিকাও ছিল। আপন কার্য্য করিয়া সুধাময়ীব অবসর বিস্তর থাকিত। সে অবসর কালে সুধাময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত, এবং সে কার্য্যে পরিশ্রান্ত হইলে, তাহার শ্যামা পাখীটি লইয়া বসিত, কখন সাহিত্য আলোচনা করিত, কখনও বা বৃক্ষলতাদির পর্য্যবেক্ষণ করিত। আজ সুধার সে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কার্য্যও নাই, তাহার সে প্রিয় গ্রন্থগুলিও নাই, তাহার সাধের সে পাখীটিও নাই, স্বহস্ত রোপিত সে তরু, লতাও নাই। যে সুরম্য অট্টালিকায়, মনোরম উদ্যানে সুধা আজ বাস করিতেছে, তাহাতে আনন্দকর অনেক বস্তুই রহিয়াছে, কিন্তু যাহার আনন্দ-প্রস্রবণের মুখে পাষাণ চাপা পড়িয়াছে, সেই জানে যে সুধা আজ এই আনন্দ পুরীতেও কেন এত উদাসীনা। সুধাময়ী সর্ব্বদাই একাকিনী গৃহচুড়ে শূন্যদৃষ্টে বসিয়া থাকে।

প্রায় এক পক্ষ অতীত হইল সুধা পিতার কোন সমাচার পায় নাই, ললিতকুমারেরও কোন সংবাদ জ্ঞাত হয় নাই। ললিতের জন্য তাহার তত চিন্তা নাই, বৃদ্ধ পিতার জন্যই সুধা অধিকতর কাতর হইয়াছে। তাহার অভিভাবিকা ব্রাহ্মণ কন্যাকে, পরিচারিকাকে, ও তাহাকে সঙ্গে করিয়া মুরশিদাবাদ লইয়া যাইবার জন্য সকাতরে বারংবার অনুনয় করিয়াছে, কিন্তু কেহ সম্মত হয় নাই। তাহারাও সুধার প্রতি দিন দিন বীতস্পৃহ হইতেছে। সুধার সে বিষয়ে লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না। কিন্তু অন্য কেহ উপস্থিত থাকিলে ব্রাহ্মণ কন্যা ও পরিচারকের ভাবান্তর সহজেই লক্ষ্য করিত। সিদ্ধেশ্বরী তাহাদের যে পাথেয় দিয়াছিলেন, তাহা

দিন দিন স্বল্প হইয়া আসিতেছে। নিঃশেষ হইবার বিলম্ব অধিকও নাই। আর এক পক্ষ, কি দিন কুড়ি চলিবে, তাহার পর তাহারা নিঃসম্বল হইবে, তখন তাহারা সুধাকে লইয়া কি করিবে এ চিন্তা এখন সর্ব্বদাই তাহাদের মনে উদয় হইতেছে। ব্রাহ্মণকন্যা ও পরিচারক এখন প্রায় প্রতিদিন গোপনে সেই সেই বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহে। সুধা তাহা জানে না। ব্রাহ্মণকন্যা পরিচারককে একবার একবার সিদ্ধেশ্বরীর সন্ধানে দক্ষিণ পাড়ায় যাইতে বলে, পরিচারক বলে সে তথায় যাইলে আর সহজে আসিতে পারিবে না। তাহারও ঘরসংসার আছে। সে সপ্তগ্রামে আর অধিক দিন থাকিতে পারিবে না, সপ্তাহকালের মধ্যে যদি সিদ্ধেশ্বরী কোন উপায় না করেন, তবে সে চলিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণকন্যা বলেন, পরিচারক চলিয়া গেলে তিনিও চলিয়া যাইবেন। সুধার কি হইবে তাহা পরিচারক ভাবে না, কিন্তু ব্রাহ্মণকন্যা তাহা ভাবেন। একদিন দুইজনে এই বিষয় অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিল যে, সিদ্ধেশ্বরী নিশ্চয়ই দক্ষিণ পাড়ায় নাই, তিনি তথায় থাকিলে, অবশ্যই সুধার একটা কিছু উপায় করিতেন। হয় তাঁর কোন বিপদ ঘটিয়াছে, নয় তিনি স্থানান্তরে গিয়া কোন কার্য্যে আবদ্ধ আছেন। নয় তাঁহার কাল হইয়াছে। যদি শেষের অনুমানই সত্য হয়, তাহা হইলে সুধার পিতার নিকট যাওয়া ব্যতীত আর ত কোন উপায়ই নাই। কিন্তু কে লইয়া যাইবে, সম্বল কই? শেষে দুজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, পরিচারকের দক্ষিণ পাড়ায় যাওয়াই কর্ত্তব্য। যদি তথায় সুধার পিতার সন্ধান পায় ত ভালই, নতুবা গোপনে ললিতকুমারকে সুধার অবস্থার কথা জ্ঞাত করিবে। ললিত যদি সত্বর কোন উপায় না করে, তবে পরিচারক আর একবার আসিয়া ব্রাহ্মণকন্যাকে লইয়া যাইবে। সুধাকে সপ্তগ্রামের কোন গৃহস্থের বাটীতে পরিচারিকা স্বরূপ রাখিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণকন্যার কয়েকজন প্রতিবেশীর সহিত বিশেষ পরিচয়ও হইয়াছিল, সুধার সহিতও তাহাদের কতক পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু সুধার প্রকৃত পরিচয় কেহই অবগত নহেন।

এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া, পরিচারকের দক্ষিণ পাড়া যাইবার পূর্ব্বদিন ব্রাহ্মণকন্যা সুধাকে বলিল, "মুকুন্দ একবার দক্ষিণ পাড়া যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েচে, ওর ঘরসংসার আছে, কোন খপরই পায়নি, দুচারদিনের

জন্য যেতে চায়। তা যাক্, শীঘ্র আস্‌তে বোলে দিছি, অমনি তোমার বাবার সম্বাদ নিয়ে আস্‌বে। তা তুমি বাছা লিখ্‌তে পড়তে জান, চিটি পত্র যদি কিছু লিখ্‌তে চাও, ত লিখে দেও।” সুধাময়ীর হৃদয়ের অন্ধকারে সহসা আলোক ফুটিয়া উঠিল, বিষণ্ণ মুখ ঈষদ্ প্রফুল্ল হইল, আগ্রহের সহিত বলিল, “ওদের বাড়ী থেকে আমায় একটু কাগজ কলম কালী এনে দাও গো।” ব্রাহ্মণকন্যা উপাদান আনিয়া দিলেন। সুধাময়ী পত্র লিখিতে বসিলেন। পিতাকে লিখিলেনঃ—

বাবা, আমি সপ্তগ্রামে রাজা মণিমোহনের পতিত বাড়ীতে রহিয়াছি। সিদ্ধেশ্বরী আমায় এখানে পাঠাইয়াছেন। আপনি কোথায় জানি না, আপনার কাছে যাইবার জন্য আমার প্রাণ অস্থির হইতেছে। আমার সঙ্গের লোকেরা আমায় দক্ষিণ পাড়ায় যাইতে দিবে না, মুরসিদাবাদেও লইয়া যাইতে চাহে না। তাহারা আমার শত্রুতা কি মিত্রতা করিতেছে, তাহা আমি জানি না, আমার বোধ হয়, তাহারা আমার শত্রু নহে, আমাকে এখানে খুব যত্ন করিতেছে।

আপনার স্নেহের কন্যা,

সুধা।

পিতাকে পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে, ললিতকে একখানি পত্র লিখিতে ইচ্ছা হইল। আবার ভাবিল, “না, তাঁহাকে পত্র লিখিব না—আমার জন্য তাঁহাকে তাঁহার পিতার নিকট না জানি কত তিরস্কার কত লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার কত ক্লেশ হইয়াছে! তিনি এত দিনে অবশ্যই স্থির করিয়াছেন যে আমি গৃহদাহে ভস্ম হইয়াছি। আমার জন্য তাঁহার কষ্ট হইয়াছে বৈকি, কষ্ট খুবই পাইয়াছেন, হয় ত এখনো সে কষ্ট ভুলিতে পারেন নাই। হয় ত? তবে কি তিনি আমায় ভুলিয়া যাইবেন? সেই ত ভাল, তিনি আমায় ভুলিলেই ত তাঁর মঙ্গল। তা ত জানি, কিন্তু আমার প্রাণ কেঁদে ওঠে কেন? না, তিনি এ হতভাগিনীকে ভুলিয়া যান, আমিই তাঁর যত অনিষ্ঠ, যত অমঙ্গলের হেতু, আমার কথা আর তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবো না। কিন্তু আমার দশা কি হইবে? আমি যে তাঁকে দেখিতে না পাইলে বাঁচিব না। নাই বাঁচিলাম, কি এত সুখের জীবন! সুখের বৈকি, “তিনি আমার” এ সুখ যে আমার বুকে

ধরে না, এ সুখ রাখিবার স্থান যে আমি খুঁজিয়া পাই না। এত আপনার লোককে কি না দেখিয়া থাকা যায়! কি করিয়া তাঁহাকে দেখিব। বাবা আসিলে ত আমায় আর দক্ষিণপাড়ায় লইয়া যাইবেন না, সেখানে যাইবার আর উপায়ও নাই। তবে তাঁকে কেমন করিয়া দেখিব! নাই দেখিলাম, যেখানেই থাকি, তাঁর সংবাদ লইব, তিনি সুখ স্বচ্ছন্দে আছেন সেই কথা শুনিয়া জীবন ধারণ করিব। ইহার অধিক আশা করিবার আমি কে? তিনি আমায় পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আমার এই হাত তাঁর স্পর্শে পবিত্র হইয়াছে, আমার এই দেহ তাঁর প্রেমদৃষ্টিতে বিশুদ্ধ হইয়াছে, আমার নাম তাঁর স্নেহ সম্ভাষণে সার্থক হইয়াছে, তিনি তাঁহার অপার্থিব হৃদয়ে আমায় স্থান দিয়াছেন তাহাতেই আমার জীবন সফল হইয়াছে। আর কামনা কিসের, কিসের আর কামনা? ইহার অধিক সুখ নারী জীবনে আর কি আছে? দেখ্‌চি এ হৃদয়ের ছবি ত মুছিবে না, সেইখানে তাঁহাকে অনুক্ষণ ত দেখিতেছি। বাহিরের চক্ষু দিয়াই নাই দেখিলাম, প্রাণের চক্ষু দিয়া ত সদা সর্ব্বক্ষণ দেখিতেছি। কিন্তু আমাকে দেখিলে যে তিনি সুখী হইবেন—তাত বটে। তিনি যে বড় সুখী হইবেন। ছার আমি, আমাকে দেখিয়া তাঁর এত সুখ—আমি তাঁর সে সুখের বিঘ্ন করিতেছি। আমি কি তাঁর দেখিবার যোগ্য? আমি তাঁর দাসীর দাসী হইবার উপযুক্ত নহি, সেই আমাকে দেখে তিনি সুখী হবেন, আর আমি সেই সুখে বাধা দিতেছি! আমি কি নিষ্ঠুর!" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সুধাময়ী ললিত কুমারকে একখানি পত্র লেখাই স্থির করিলেন। কলম হাতে লইল—কি লিখিবে—কেমন করিয়া পত্র আরম্ভ করিবে—কি বলিয়া সম্বোধন করিবে—তাহাই ভাবিতে লাগিল। শেষে ভাবিল "ছি! আমি আবার তাঁকে লিখিব? আমি কি লিখিতে জানি যে তাঁকে পত্র লিখিব! তাঁর বিদ্যার গৌরবে দেশ পুরিয়া উঠিয়াছে—তাঁর কাছে আমার এ ছাই ভস্ম কোন্ মুখে পাঠাইব! না পত্র লিখিব না। মকুন্দ তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়া আমার কথা বলিবে, তাহা হইলেই তিনি যাহা ভাল বোঝেন তাই করিবেন।" আবার ভাবিল, তাঁকে ত পূর্ব্বে পত্র লিখিয়াছি, বাবার কাজের জন্য কতবার যে তাঁকে পত্র লিখিয়াছি, আজ কেন লজ্জা করি? আমার হাতের লেখা দেখিয়াও ত তিনি সুখী হইবেন, সে সুখে তাঁকে

বঞ্চিত করি কেন? আমার কাষে তাঁর সুখ হইবে ইহাতে নিজেকে ভাগ্যবতী না ভাবিয়া আবার সঙ্কুচিত হইতেছি, ধিক আমাকে!” সুধা আবার কলম তুলিয়া লইয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল।

দেব,

এ হতভাগিনীকে আর আপনার স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা হয় না। অভাগিনীর জন্য না জানি আপনাকে কত লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে হইয়াছে, কত ক্লেশই পাইয়াছেন। কিন্তু তবু মনে হয়, আমার জন্য বড় কাতর হইয়াছেন, তাই এ পত্র লিখিতেছি।

আমার এমনি অদৃষ্ট যে, যে মুখ দেখিলে আপনার সকল কষ্ট দূর হইত, সে মুখ আপনাকে একবারে দেখাইতে পারিতেছি না। দক্ষিণ পাড়ায় যাইবার আমার আর উপায় নাই। আমার গৃহদাহের পূর্ব্বে সিদ্ধেশ্বরী আমায় গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া আনিয়া ছিলেন, আমার সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আমায় সপ্তগ্রামের রাজা মণিমোহনের পরিত্যাক্ত বাটীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, আমি এখন সেই খানেই আছি। সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণকন্যা আর একজন পরিচারক আছে। সেই পরিচারক এই পত্রবাহক।

পিতার এখনো কোন সংবাদই পাই নাই। সে জন্য যেরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি তাহা আপনি সহজেই বুঝিবেন। আপনি যদি তাঁহার কোন সংবাদ পাইয়া থাকেন তবে আমাকে জানাইয়া প্রাণদান করিবেন। পিতার সংবাদ না পাইলে আমি এ ভাবে এখানে তিষ্ঠিতে পারিব না, আমার এ বিপদে উপদেশ দিবার উপযুক্ত লোকও কেহ নাই। আমার দশা কি হইবে।

আপনার দাসী,

সুধা।

সুধাময়ী পরিচারককে ডাকিয়া যেখানি পিতাকে দিতে হইবে দেখাইয়া দিল, অন্যখানি বাবুদের বাড়ীর বড় বাবুকে গোপনে দিতে বলিল। ভৃত্য চলিয়া গেলে সুধাময়ী ভূতল শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ললিত কুমারের কাছে তাহার হস্তাক্ষর যাইতেছে—সে যাইতে পারিল না, এই মনে হইতে লাগিল—আর সুধা কাঁদিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

মুরসিদাবাদ হইতে নিয়োগ পত্র আসিবার দুই এক দিবস পরেই ললিত কুমার স্থির করিলেন, সপ্তগ্রামে রাজা মণিমোহনের বাটীতেই অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবেন। তদ্বিষয়ে পিতার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

রত্নেশ্বর কহিলেন, আমার বিবেচনায় দক্ষিণ পাড়াতেই "অনাথ আশ্রম" স্থাপন করা কর্ত্তব্য। বাটী প্রস্তুত করিতে অর্থ ব্যয় হইবে সত্য, কিন্তু বিপুল ঐশ্বর্য্য—অর্থের অনাটন ত নাই। বিশেষত তুমি গৃহে থাকিয়াই সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিতে পারিবে। আর এক কথা, দক্ষিণ পাড়ায় সেইরূপ একটা অতীথশালা স্থাপিত হইলে, গ্রামেরও গৌরব খুব বৃদ্ধি হইবে, এবং তোমাদের আধিপত্য বিস্তারও প্রচুর হইবে। অতএব আমার পরামর্শ শুন, এইখানেই "অনাথ আশ্রম" স্থাপন কর।

ললিতকুমার কহিলেন বাবা, আপনি এরূপ অনুমতি করিবেন না। সুধার আপন বাসস্থান থাকিতে, ভিন্ন গ্রামে কেন তার কীর্ত্তি স্থাপিত হ'বে। সপ্তগ্রামে রাজা মণিমোহনের নাম লুপ্তপ্রায় হইতেছে,—সেখানে সুধাময়ীর অনাথ আশ্রম হইলে তাঁহার বংশের গৌরব রক্ষা হইবে। দক্ষিণ পাড়া সুধাময়ীর প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাতে দক্ষিণপাড়া সুধাময়ীর বদান্যতা লাভ করিবার উপযুক্ত স্থানও নহে। বোধ হয় নবাবও এ স্থান অনুমোদন করিবেন না।

রত্নেশ্বর। কেন, দক্ষিণপাড়া সুধার প্রতি কি অত্যাচার করিয়াছে? এখানে মাধব চট্টোপাধ্যায় যেরূপ অবস্থায় ছিল, যেরূপ কার্য্য করিত, তাহার উপযুক্ত ব্যবহারই দক্ষিণপাড়াবাসীরা তাহাদের প্রতি প্রদর্শন করিয়াছিল। দক্ষিণপাড়াবাসীরা ত আর অন্তর্য্যামী নহে, যে তাহারা বুঝিবে, সুধাময়ী রাজা মণিমোহনের কন্যা, আর মাধব তাঁহার মন্ত্রী। সে পরিচয় দিতে মাধবকে কে নিষেধ করিয়াছিল? সে পরিচয় পাইলে, আমিই ত তাহাদের মাথায় করিয়া রাখিতাম।

ললিত। বাবা, আপনার সহিত সে বিষয়ে তর্ক করা আমার উচিত নহে। আমি নিজের কথা বলিতেছি, দরিদ্র বলিয়া মানুষকে স্নেহ মায়া দয়ায় বঞ্চিত করিতে নাই, লোকে নীচ কি ভদ্র তাহা তাহাদের আচরণেই

বুঝা যায়। মাধব চট্টোপাধ্যায় ও সুধাময়ী উভয়ের আচরণেই এমন একটু মহত্ব দেখা যাইত, যে তাহা লক্ষ্য করিলেই, তাহাদের সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলিয়া বোধ হইত। সে যাহা হউক, এক্ষণে আপনি অনুমতি দেন, আমি সপ্তগ্রামে গিয়া অনাথ-আশ্রম স্থাপন করিয়া আসি।

রত্নেশ্বর। তুমি তবে, বাপ, মা, ভাই, ঘর দোর ছেড়ে সপ্তগ্রামেই বাস কর্‌তে চল্লে?

ললিত। সেখানে বাস করিব কেন? সম্প্রতি গিয়া আবশ্যকীয় বন্দোবস্ত করিয়া আসিব, পরে মধ্যে মধ্যে গিয়া তত্ত্বাবধারণ করিব।

রত্নেশ্বর। তবেই হইল, তুমি উহাদের ব্যাপার লইয়াই উন্মত্ত রহিলে কোন লাভ নাই, অথচ পরের ব্যাগার খাটিয়া সময় নষ্ট করিবে। তোমার নিজের উপার্জ্জন করিবার বয়স হইয়াছে, সে চিন্তা তুমি একবারও কর না। উপার্জ্জন করা দূরে থাক্, আমার যে বিষয় সম্পত্তি রহিয়াছে তাহাও যথেষ্ট—তাহার দিকে মনোযোগ করিলে, বিষয় আশয়ের উন্নতি হয়, সে দিকেও তোমার কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই। আমিও বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, আমি আর কতদিন খাটিতে পারিব? আমি গেলে এ বিষয় রক্ষা করিবে কে?

ললিত। মোহিত করিবে। মোহিত আপনার নিকট বৈষয়িক ব্যাপার অতি উত্তমরূপ শিখিয়াছে।

রত্নেশ্বর। মোহিত খাটিবে, বিষয় আশয় রক্ষা করিবে, আর তুমি পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খাইবে, আর বাবুগিরি করিবে, ক্যামন? মোহিত জমীদারীর অন্দি সন্দি সব বুঝিয়া লইয়াছে, তা জান? তুমি সে সব কিছুই শেখ নাই। ও মনে করিলে তোমায় সব ফাঁকি দিতে পারে, তা জান?

ললিত। সহোদর ভাই, যদি বিষয়ের জন্য ভাইকে ফাঁকি দেয় ত তেমন বিষয়ে আমার প্রয়োজন নাই।

রত্নেশ্বর। পেট্ চলিবে কি ক'রে?

ললিত বলিতে যাইতেছিলেন, যে সুধার অনাথ-আশ্রমে তাহার অন্ন জুটিবে, কিন্তু পিতার সমক্ষে সে কথা বলিতে পারিলেন না। বলিলেন—

আমার উদরান্ন আমি করিয়া লইব।

রত্নেশ্বর। তবু পৈতৃক বিষয় কর্ম্ম দেখিবে না? দেখ, ললিত তুমি

চিরদিনই আমার অবাধ্য। আমি তোমার প্রতি বড়ই অপ্রসন্ন। এখনও যদি, আমার কথা রাখ, তবে শোন, রাজা মণিমোহনের বিষয়াদির এক্ষণে ওয়ারিসন নাই, বলিতে গেলে তুমিই সে বিষয়ের সর্ব্বেসর্ব্বা। নবাব সরকারে উহার হিসাব কেতাব কিছুই দিতে হইবে না। মনে করিলে, কালে, সে সমস্ত বিষয়ই আমাদের সম্পত্তি করিয়া লইতে পারা যায়। তোমার সে বুদ্ধি নাই। এইখানে অনাথ আশ্রম কর, আমার পরামর্শ মত কাজ কর। পরে বুঝিবে কেন এরূপ করিতে বলিতেছি। মোহিত এ সকল বেশ বোঝে, তুমি না পার মোহিতকে তত্ত্বাবধারক ক'রে দেও।

ললিত পিতার কথা শুনিতে শুনিতে শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, পিতা, আমি আপনার এ কথা ভুলিয়া যাইব, মনে করিব আপনার মুখ হইতে এরূপ কথা কখন নির্গত হয় নাই। সুধাময়ীর সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও অতীথ সেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে ব্যয়িত হইবে না, ইহা আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এজন্য যদি আমায় আপনার বিরাগভাজন হইতে হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত রহিলাম।

রত্নেশ্বর। আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার বিষয়ের এক কপর্দ্দকও তোমায় দিব না। দুই এক দিনের মধ্যেই উইল করিব, আমার সমস্ত বিষয়াদি, এমন কি বাস্তু ভিটা পর্য্যন্ত সকলি মোহিতকে লিখিয়া দিব। দেখি, তোমার অহংকার চূর্ণ হয় কি না।

এই বলিয়া রত্নেশ্বর সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ললিতকুমার ক্ষণকাল অধোবদনে বসিয়া রহিলেন, শেষে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন কক্ষে গমন করিলেন। এবং খাজাঞ্জিকে ডাকিয়া সপ্তগ্রামে পাঠাইবার জন্য একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারী স্থির করিলেন। কর্ম্মচারী উপস্থিত হইলে তাহাকে বলিলে "আগামী কল্য টাকা কড়ি লোক জন লইয়া তুমি সপ্তগ্রামের রাজা মণিমোহনের বসত বাটীতে যাইবে। সে বাটী কি অবস্থায় আছে জানি না। যদি অন্য কেহ তথায় বাস করে, রাজা মণিমোহনের সম্পর্কীয় কেহ না হইলে, তাহাদের সে বাটী ত্যাগ করিতে বলিবে। রাজার সম্পর্কীয় কেহ হইলে, তাঁহার জন্য বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া দিবে। রাজা মণিমোহনের বাটীতে অনাথ আশ্রম হইবে। আমি গিয়া অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিব। এক্ষণে তুমি

আবশ্যকীয় আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখগে। বাড়ী পরিষ্কার করা, জঙ্গল সাফ করা ইত্যাদি যেন আমি যাইবার আগেই হইয়া যায়। আর এক কথা—কোন উপযুক্ত কারিকর দ্বারা একখান বড় শ্বেত প্রস্তর ফলকে "সুধাময়ীর আশ্রম" এই কয়টি কথা বড় বড় অক্ষরে লিখাইয়া রাখিও, কারিকর যেন উপস্থিত থাকে। আমি পৌঁছিলে তাহাকে বিদায় করা হইবে।

এই বলিয়া, ললিত কুমার সে কর্ম্মচারীকে যথেষ্ঠ অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে তিনি সপ্তাহের মধ্যে সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইবেন।

আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে কর্ম্মচারীর দিন দুই বিলম্ব হইবে জানিয়া, কর্ম্মচারী কয়েকজন নগ্‌দী নিযুক্ত করিয়া, পর দিন প্রত্যুষেই সপ্তগ্রামে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের প্রতি যেরূপ আদেশ দিলেন, তাহারাও যে সে আদেশের অতিরিক্ত কার্য্য করিল, তাহা পাঠক অবশ্যই বুঝিয়াছেন। সপ্তগ্রামে রাজা মণিমোহনের প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইয়াই, তাহারা লোকের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল, গাছ পালা কাটিতে লাগিল, লাফালাফি, চিৎকার বিষম গণ্ডগোল তুলিল। সেই দিন প্রত্যুষে সুধাময়ীর পরিচারক তাঁহার পত্র লইয়া দক্ষিণপাড়ায় গিয়াছে। সুধা শূন্যদৃষ্টে সাশ্রুনেত্রে প্রাসাদ চূড়ে বসিয়া ছিল। দূরে কোলাহল শুনিয়া সেই দিকে দৃষ্টি করিল। এমন সময় ব্রাহ্মণকন্যাও কোলাহল শুনিয়া সুধার নিকটে উপস্থিত হইল। উভয়েই শুনিল, কোলাহলকারীরা বলিতেছে, "রাজা মণিমোহনের বাটী দখল করিতে যাইতেছি।" পার্শ্বস্থ লোকেরা জিজ্ঞাসা করিতেছে "কে দখল করিতেছে।" নগ্‌দীরা বলিতেছে, "যাহার টাকা আছে সেই দখল করিতেছে, রত্নেশ্বর বাবু রত্নেশ্বর বাবু। আর কে? অত টাকা আর কার আছে?"

ব্রাহ্মণ কন্যা সজল নেত্রে সুধাময়ীর হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"আয় মা, এ বাড়ীতে আর থাকা নয়, উহারা আমাদের দেখিলেই উপদ্রব করিবে, এই বেলা পলাই চ।"

সুধাময়ী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিল। ব্রাহ্মণকন্যা তাহার হস্ত ধারণ করিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া রাজা মণিমোহনের প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইল। নিরাশ্রয়া সুধাময়ী আজ অকূল সমুদ্রে ভাসিলেন।

পূর্ণিমার মূল্য প্রাপ্তি।

সন ১৩০০ সাল।

বাবু রাখালদাস ভট্টাচার্য্য, হাওড়া।
,, জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ রায়, মাখালপুর।
,, ভূপতিচরণ চক্রবর্ত্তী, ভাগলপুর।
রাজা অফ ভোয়াল, ঢাকা।
বাবু রাখালচন্দ্র পালিত, মগুলাই।
,, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ফয়জাবাদ।
,, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সীতাকুণ্ড।
,, আবদুল করিম, চট্টগ্রাম।

ক্রমশঃ।

সন ১৩০১ সাল।

বাবু মোহিনীমোহন লাহিড়ী, কাঞ্চননগর।
,, রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায, জাহানাবাদ।
রাজা অফ ভোয়াল, ঢাকা।
বাবু জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ রায, মাখালপুর।
,, ভূপতিচর' চক্রবর্ত্তী, ভাগলপুর।
,, যোগেন্দ্রনা চট্টোপাধ্যায, ফয়জাবাদ।
, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সীতাকুণ্ড।
,, গিরীশচন্দ্র পাল, হুগলী।
,, উমেশচন্দ্র ঘোষ, সোণাটিকরি।
দীননাথ দাস, কাঞ্চননগর।
,, প্রসন্নকুমার ঘোষ মুরাদপুর।
,, হরকুমার রায়, শ্রীরামপুর।
বাবু কুঞ্জবিহারী সেন, হুগলী।
,, রবিন্দ্রনাথ সিংহ, কলিকাতা।
,, কৈলাসচন্দ্র বসু, কলিকাতা।
,, উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, কাচড়াপাড়া।
,, হেমাঙ্গচরণ বসু, যশোহর।
,, শশিভূষণ সেন, মগরা।
,, রাখালদাস ভট্টাচার্য্য, হাওড়া।
,, শিবচন্দ্র সোম, বীরভূম।
,, কালীকৃষ্ণ চৌধুরী, মৈমনসিং।
,, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, চাইবাসা।
,, যোগেন্দ্রনাথ ধর, ঢাকা।
,, ললিতমোহন দাস, মৈমনসিং।
,, রামগোপাল সিংহ, রসোরা।
,, তারকনাথ ঘোষ, চম্পানগর।
,, উমানাথ ঘোষাল, নীলকামারি।

ক্রমশঃ।

সীতাচরিত।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল প্রণীত।

মূল্য ।৷০ আনা

ডাকমাসুল——৴১০

১৮৯৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে পাঠ্য পুস্তকের তালিকা বাহির হইয়াছে তাহাতে এই পুস্তক মধ্যবৃত্ত বালিকা বিদ্যালয় সমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সংবাদ পত্র সমূহ কর্ত্তৃক বিশেষ প্রশংসিত।

অতি সরল ও পরিশুদ্ধ ভাষায় এই অপূর্ব্ব জীবন ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে স্থানে স্থানে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। পুস্তক খানি স্কুলের তালিকাভুক্ত হওয়ার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষে এ পুস্তকের ন্যায় পাঠ্য পুস্তক বাঙ্গালায় বিরল।

নব্যভারত।

এরূপ পুস্তক আমাদের দেশে অতীব বিরল।——সোমপ্রকাশ।

এই পুস্তক হুগলীতে গ্রন্থকারের নিকট ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

নির্ম্মলা।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল প্রণীত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

ডাক মাসুল ৵০ এক আনা।

এই পুস্তক খানি সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা ইহা পাঠ করিয়াছেন সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রকাশক—শ্রীহরিলাল পাল,

হুগলী।

[illegible] অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

২য় ভাগ—৯ম সংখ্যা। পৌষ—১৩০১।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সূচী।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

হুগলী,

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পৌষ—১৩০১।

এই সংখ্যার মূল্য /১০ দেড় আনা।

বিজ্ঞাপন।

'পূর্ণিমা প্রতি মাসে পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হয়। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়াছেন। যাহাতে ইহা স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন আছে। এই পত্রিকা যাহাতে সকলের সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন তজ্জন্য ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাস্থল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনার জন্য পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

বিজ্ঞাপন।

হুগলীর চকে সাবিত্রী যন্ত্র নামে একটী ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী বহু প্রকার নূতন অক্ষর আছে এবং কলিকাতার দরে পুস্তকাদি ছাপান হইতেছে। বিশেষ সুবিধা এই, গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে, প্রুফ সংশোধনের ভার রীতিমত লওয়া হইয়া থাকে। চিঠিপত্র চেক দাখিলা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জবওয়ার্ক সুলভ মূল্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাপান হইয়া থাকে। আমাকে লিখিলে বিশেষ বিবরণ সকলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল
ম্যানেজার।
হুগলী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

২য় ভাগ। | পৌষ, সন ১৩০১ সাল। | ৯ম সংখ্যা।

মধুনন্দী গীতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়—সাংখ্য যোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শত্রুকুল নিন্দা করি সামর্থ্য তোমার
কহিবে অবাচ্য! দুঃখ কিবা আছে আর? ৩৬
পৃথিবী ভুঞ্জিবে যদি জয়ী হও রণে,
অথবা কৌন্তেয় তুমি ভাবি দেখ মনে,
স্বর্গলাভ ধর্ম্মযুদ্ধে যায় যদি প্রাণ!
নিঃসন্দেহে ধনঞ্জয় ধর ধনুর্ব্বাণ। ৩৭
সুখ দুঃখ লাভালাভ জয় পরাজয়
সম ভাবি যুদ্ধ কর, নাহি পাপ ভয়। ৩৮
কহিনু যা' আত্মতত্ত্ব। করহে শ্রবণ
কর্ম্মযোগ, যাহে হবে বিমুক্ত বন্ধন। ৩৯
কর্ম্ম যোগারম্ভ ফল ফলিবে নিশ্চয়,
বিঘ্ন নাই, স্বল্প মাত্রে পরিত্রাণ হয়। ৪০
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হয় ত একান্ত,
অব্যবসায়ীর বুদ্ধি বহুধা অনন্ত। ৪১
হে পার্থ বেদার্থবাদে পরিতুষ্ট মন,

"অন্যতত্ত্ব আর নাই" বলে যেই জন,
স্বর্গ পরায়ণ মূঢ়, কামনার ভাগী,
জন্ম কর্ম্ম ফলপ্রদ ভোগৈশ্বর্য্য লাগি,
আপাততঃ রমণীয় বিষলতা মত
স্বর্গাদি ফলের কথা শুনি বিমোহিত
হয় যারা, তাহাদের শুন ধনঞ্জয়
কামনা চঞ্চলা বুদ্ধি সমাধি না পায়! ৪২, ৪৩, ৪৪,
সকাম সাধক যারা পায় কর্ম্মফল;
বেদের ব্যবস্থা এই—কামনা কেবল।
অর্জ্জুন, নিষ্কাম হও, সুখ দুঃখাদিতে
দ্বন্দহীন সমভাব। সর্ব্ব অবস্থাতে
সত্ত্ব গুণাশ্রিত হও; পাও নাই যাহা,
ব্যাকুল হ'য়না আর লভিবারে তাহা।
আছে যা, থাকুক তাহা;—না থাকে, কি হ'বে?
প্রমত্ত হ'য় না পার্থ কিছুতেই ভবে। ৪৫
বর্ষা জলে মাঠ ঘাট প্লাবিত যখন,
সামান্য গর্ত্তের জলে কিবা প্রয়োজন?—
সেইরূপ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজ্ঞানোদয়
হইলে, সমস্ত বেদ অকর্ম্মণ্য হয়। ৪৬
কর্ম্মে তব অধিকার, নহে কর্ম্মফলে;
ফলার্থী হ'য় না, কর্ম্ম কর সর্ব্বকালে। ৪৭
ছাড়িয়া কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি সিদ্ধি অসিদ্ধিতে
সমভাবে কর্ম্ম কর, থাকিয়া যোগেতে।
"সমত্ব"ই যোগ নামে উক্ত ধনঞ্জয়; ৪৮
এক বুদ্ধি কর্ম্মযোগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়।
জ্ঞানাশ্রয়ে কর্ম্মযোগ কর অনুষ্ঠান;
কিম্বা ঈশ্বরেতে দিয়া দেহ মন প্রাণ
বুদ্ধিযোগে রত হও; ফল কামী যারা
স্বার্থপর, এ সংসারে নীচ মতি তারা! ৪৯

পাপ পুণ্য ত্যাগ করে একনিষ্ঠ জন ;
কর্ম্ম কুশলতা যোগ, যোগে দেহ মন। ৫০
বুদ্ধিযুক্ত মনীষিরা ফল নাহি চান,—
জন্মবন্ধ মুক্ত হন, মোক্ষপদ পান। ৫১
তব বুদ্ধি মোহভ্রান্ত ছাড়িবে যখন,
শ্রোতব্য শ্রুতার্থে হবে বিরাগ তখন। ৫২
লৌকিক বৈদিক কথা শুনিতে শুনিতে
বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি ; পুনঃ ঈশ্বরেতে
অভ্যাসে হইবে স্থির ; এক নিষ্ঠমন
হইলে যোগের তত্ত্ব জানিবে তখন। ৫৩

অর্জ্জুন কহিলেনঃ—

হে কেশব, যোগস্থিত স্থিত প্রজ্ঞজন
কেমন, কহ তা শুনি ; কি তাঁর লক্ষণ ? ৫৪

ভগবান কহিলেনঃ—

আপনাতে পরিতুষ্ট যেজন আপনি,
সমস্ত কামনা ছাড়ি, স্থিতপ্রজ্ঞ তিনি। ৫৫
দুঃখেতে উদ্বেগ শূন্য, স্পৃহাশূন্য সুখে,
নীরাগ, স্থিতধী বলে নির্ভয় মুনিকে। ৫৬
সর্ব্বত্র মমতা শূন্য, শুভাশুভ গত
সমজ্ঞান যার, তাঁর বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত। ৫৭
ইন্দ্রিয়াকর্ষণে সদা ক্ষমাবান যিনি
কূর্ম্মের অঙ্গের মত, স্থির বুদ্ধি তিনি। ৫৮
ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নাই,—জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানে
অভিমানী অজ্ঞজন বিষয় গ্রহণে
কেবল নিবৃত্ত থাকে, ভোগ অভিলাষ
থাকে মনে গুপ্তভাবে না হয় বিনাশ !
কিন্তু সেই পরমাত্মা করিয়া দর্শন
ভোগ বাঞ্ছাশূন্য হয় স্থিত প্রজ্ঞ মন। ৫৯

যত্নশীল মোক্ষার্থীরে বল করি ধরি,
দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণ মন করে চুরি! ৬০
ইন্দ্রিয় সংযম করি মহাযোগী যত
অবস্থিত, তাঁহাদের প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ৬১
বিষয়ে ভাবনা যার আসক্ত সে হয়;
আসক্তিতে অচিরাৎ কামনা উদয়;
কামনাতে ক্রোধ জন্মে যেই বাধা পায়; ৬২
ক্রোধে মোহ; মোহে ভ্রম; ভ্রমে বুদ্ধি যায়;
বুদ্ধি নাশে তুল্য হয় জীবন মরণ! ৬৩
"সংযত ইন্দ্রিয়-ভোগ" শান্তির সদন। ৬৪
সর্ব্ব দুঃখ যায় হ'লে চিত্তপ্রসাদন;
স্থির বুদ্ধি হয় শীঘ্র সুপ্রসন্ন মন। ৬৫
জিতেন্দ্রিয় নহে যে, সে আত্ম বুদ্ধি হারা,
আত্মধ্যান শূন্য সেই; ধ্যান শূন্য যা'রা,
তাহাদের শান্তিলাভ আশা করা বৃথা!
শান্তিহীন হৃদয়ের সুখ আছে কোথা? ৬৬
সমুদ্রে তুফান তুলি প্রচণ্ড পবন
যেমতি ডুবায় তরী, সেইরূপ মন
যে দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের সাথে সাথে ধায়,
সে তা'রে সংসারনীরে অচিরে ডুবায়!! ৬৭
হেন সে ইন্দ্রিয় যাঁ'র হয় নিগৃহীত
সকল বিষয়ে, তাঁ'র প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ৬৮
সর্ব্বভূতে দেখে যাহা নিশার মতন,
জিতেন্দ্রিয় জন তাহে করে জাগরণ;
সর্ব্বভূতে যে বিষয়ে থাকে জাগরিত,
আত্মদর্শী মুনি তাহে থাকেন নিদ্রিত। ৬৯
পূর্ণকায় অর্ণবেতে বহুবারি ধায়,
হ্রাস বৃদ্ধি হীন কিন্তু সমুদ্রের কায়;
তেমতি কামনা যার প্রবেশে অন্তর,

কিন্তু অচঞ্চল ভাব থাকে নিরন্তর,
অন্তর্দ্দৃষ্টি স্থির যার সেই শান্তি পায় ;
সে শান্তি ভোগাভিলাষী পাইবে কোথায় ? ৭০
উপেক্ষিয়া কাম্য বস্তু, অহঙ্কার হীন,
নিস্পৃহ মমতাশূন্য যিনি চিরদিন,
কেবল প্রারব্ধ বশে ভোগাদিতে রত,
শান্তিসুখ লাভ তিনি করেন নিয়ত। ৭১
ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠা এই শুন পার্থ বীর,
ইহা লভি শুদ্ধ মন পুরুষ সুধীর
মোহ বন্ধ ছাড়ি পান পরব্রহ্মে লয়।
অন্তিমেও নিষ্ঠা হ'লে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। ৭২

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়—সাংখ্যযোগ। ক্রমশঃ।

দুইটী মুসলমান রমণী।*

নবাব কতলু খাঁর রাজবাটীতে সুপ্রশস্ত কক্ষ। কক্ষ—সুশোভিত "পাদস্পর্শ সুখজনক গালিচায় আবৃত," নীল পরদা শোভিত দ্বার বিশিষ্ট ও নানাবিধ "স্নিগ্ধ সৌগন্ধে আমোদিত"—নীরব। এই রাজ বাটীর রাজ অট্টালিকায় "রাজ রাজমোহিনী" আয়েসার সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ।

আর এক স্থান—দিল্লীর সম্রাটের বেগম মহল। অতিশয় সুরম্য কুঠীর। কুঠীর—সুন্দর শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত,—সুবর্ণ শামদানোপরি সুগন্ধ দীপ প্রজ্জলিত,—স্বর্ণ রৌপ্য-খচিত ও সুগন্ধে আমোদিত। বাদসাহের বেগম মহলের এই উজ্জ্বল কক্ষে ভুবন উজ্জ্বলকারিণী জেলেখার সহিত আমাদের পরিচয়ের আরম্ভ।

আয়েসা দয়াবতী, জ্ঞানগম্ভীরা, সুমধুর মাধুরীময়ী যুবতী, নিরাশ-প্রেমিকা। জেলেখা—"তম্বঙ্গী"—সুন্দরী, অসামান্যা "তেজস্কর ও গৌরব-বিস্ফারিত অবয়ব" বিশিষ্টা তরুণী-প্রেমতরঙ্গহৃদয়া।

---

* আয়েসা ও জেলেখা। বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী" ও রমেশচন্দ্রের "মাধবী কঙ্কণ"।

"আয়েসার সৌন্দর্য্য নবরবিকরফুল্ল জলনলিনীর ন্যায়, সুবিকাশিত, সুবাসিত রস পরিপূর্ণ, রৌদ্র প্রদীপ্ত, না সঙ্কুচিত না বিশুষ্ক, কোমল অথচ প্রোজ্জ্বল" জেলেখার সৌন্দর্য্য শীত কালের পূর্ব্বাহ্নিক সূর্য্যের ন্যায়, আরামপ্রদ, মাধুর্য্যময়, সুবিমল, সকলের প্রীতিদায়ক অথচ তেজপরিপূর্ণ-চক্ষু মেলিয়া সহসা দৃষ্টি করা যায় না, আবার চক্ষু ফিরাইতেও ইচ্ছা হয় না।

আয়েসার অবস্থা—নিদাঘকালীন সুপরিষ্কৃত গম্ভীর নিশীথের মলয়মারুৎ সেবিত মাধুর্য্যময়ি চন্দ্রালোকের ন্যায়।

জেলেখার অবস্থা—ঘোর নিস্তব্ধ, ভীতি উৎপাদক অথচ ঔজ্জ্বল্যময় শারদীয় গম্ভীর নৈশ জ্যোৎস্নার অনুরূপ।

আয়েসা—উড়িষ্যার নবাব পাঠান বংশীয় কতলু খাঁর কন্যা, নম্র ধীর ও শান্ত প্রকৃতির মুসলমান বালা।

জেলেখা—তাতারবাসী উচ্চবংশ সৈনিক পুরুষের তেজোময়ী দুহিতা, উগ্রস্বভাবা, সুললিত সুকুমার অবয়বা তাহার "দেওয়ানা"।

উভয় চরিত্রেরই মূল উপাদান প্রেম। এই প্রেম ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়াই ইহারা জগতের নিজ নিজ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে।

উভয়ের প্রেম কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের।

আয়েসার প্রেম—অতিশয় কোমলতাময়, হৃদয়স্নিগ্ধকারী, সুউজ্জ্বল। প্রেম পাত্রের সুখই রূপাময়ী আয়েসার এক মাত্র কামনা, প্রেমের জন্য তিনি শত্রুতনয়া স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে মূর্চ্ছাবস্থায় কারাগারে ক্রোড়ে করিয়া অশ্রুপাত করেন, আবার স্বীয় প্রেম পাত্রের সুখের জন্য তাঁহার গলে তাঁহার প্রেম পাত্রিকে উপহার দিয়াও তাঁহার সুখে কৃতার্থ হয়েন। প্রেমবলে আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার প্রাণেশ্বরের সুখেই নিজেকে সুখী করেন।

জেলেখার প্রেম—অতিশয় প্রখরতাময়, মাধ্যাহ্নিক সূর্য্যের ন্যায় সুউজ্জ্বল ও হৃদয়ে ভীতি উৎপাদক, প্রেম পাত্রের জন্য তিনি দেওয়ানা সাজিয়া ভৃত্য বেশেও পর্ব্বতে পর্ব্বতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেন আবার তাঁহারি ঔদাস্যে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীতে আশাহীন হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় তাঁহারই বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইতেও সঙ্কুচিত হয়েন না।

এই দুই রমণীই তাহাদের অসামান্য হৃদয়ভার ও অমানুষিক প্রেম লইয়া দুই জনকে আত্ম সমর্পণ করিল—তাঁহাদের নাম জগৎ সিংহ ও নরেন্দ্রনাথ।

এই দুই জনই অবশেষে তাহাদের হৃদয়ে কালকূট স্বরূপ হইল এবং এই বিষে উভয়েই জর্জ্জরীভূত হইলেন, তবে একজন বঙ্গদেশবাসীসুলভ সাহসুন্তা গুণে চির জর্জ্জরিত ভাবেও বৃন্তে সংলগ্ন রহিলেন, আর একজন স্বীয় উষ্ণ রক্তের তীব্র তাড়নার স্রোতে কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া অচিরেই বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িলেন।

আয়েসা রমণীরত্ন। আয়েসার সৃষ্টিকর্ত্তাই বলিয়াছেন "যেমন উদ্যান মধ্যে পদ্মফুল এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনি আয়েসা।" সত্যই দুর্গেশনন্দিনীর কাব্যোদ্যানে আয়েসা একটী পদ্মফুলের মতই শোভা পাইয়াছেন, কৃপাময়ীর সকরুণ দৃষ্টি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া গ্রন্থখানিকে আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। যে পরিচ্ছেদটীতে আয়েসার ছায়া পড়িয়াছে সেটীতেই যেন সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আয়েসার সহিত জগৎ সিংহের প্রথম দেখা আয়েসার পিতৃভবনে, নবাব কতলু খাঁর আবাস দুর্গে। যুদ্ধে আহত অবস্থায় জগৎ সিংহ এখানে আনীত, আয়েসা তাঁহার পরম দয়াময়ী শুশ্রূষাকারিণী। এই দেখাতেই আয়েসা তাহাকে তাঁহার প্রাণ মন সমর্পণ করিলেন; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখ এ ভাবে দেখিবেন না। আয়েসা নবাব কতলু খাঁর এক মাত্র আদরের কন্যা হইয়াও দেববালার ন্যায় তাহার পিতৃবৈরীর সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতেন, কেন থাকিতেন তাহার এ ভাব আসিল কোথা হইতে? আয়েসা চিরকালেই স্নেহ প্রবণ হৃদয়া, পরের সামান্য দুঃখও তাহার সহ্য হয় না, তাহার মন চির কোমলতাময়; উপযুক্ত পাত্র দেখিলেই তাহার এই কোমল মঙ্গলময় দয়া ভাবের উদয় হইত। জগৎ সিংহের প্রতি আয়েসার যে ভালবাসা তাহা এই বৃত্তিরই পরিণতি। উচ্চহৃদয়া স্নেহকোমলা আয়েসা যে তাহাকে এরূপ মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন তাহা কুমার জগৎসিংহও তখন জানিতে পারেন নাই। আয়েসা নিজ মুখেই বলিয়াছেন যে এ কথা তিনি প্রাণ থাকিতে প্রকাশ করিতেন না, চিরকাল মানসপটে জগৎ সিংহের মূর্ত্তি অঙ্কিত

করিয়া তাহার পূজা করিতেন কাহাকেও জানাইতেন না, কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় প্রকাশ হইয়া পড়িল। আয়েসা জগৎ সিংহকে কারাগার হইতে পলায়নের অনুরোধ করিলেন, জগৎ সিংহ কিন্তু স্বীকার করিলেন না। কথায় বার্ত্তায় অনেক রাত্রি হইল, আয়েসার স্বীয় কক্ষে প্রত্যাগমনের বিলম্ব ঘটিল; সন্ধান পাইয়া ওসমান সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হইলেন, কহিলেনঃ—

"নবাব পুত্রী; এ উত্তম!"

স্থির স্বরে আয়েসা উত্তর করিলেন "কি উত্তম ওসমান?"

ওসমান পূর্ব্ববৎ ভঙ্গিতে কহিলেন,—

"নিশীথে একাকিনী বন্দী সহবাস নবাব পুত্রীর পক্ষে উত্তম। বন্দীর জন্য নিশীথে কারাগারে অনিয়ম প্রবেশও উত্তম।"

গর্ব্বিত স্বরে আয়েসা কহিলেনঃ—

এ নিশীথে একাকিনী কারাগার মধ্যে আসিয়া এই বন্দীর সহিত আলাপ করা না করা আমার ইচ্ছা, আমার কর্ম্ম উত্তম কি অধম সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।"

ওসমান বিস্মিত ও ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন,—

"প্রয়োজন আছে কি না কাল প্রাতে নবাবের মুখে শুনিবে।"

আয়েসা পূর্ব্ববৎ কহিলেনঃ—

"যখন পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন আমি তখন তাহার উত্তর দিব। তোমার চিন্তা নাই।"

ওসমান পূর্ব্ববৎ ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন,—

"আর যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি?"

"ওসমান, যদি তুমিই জিজ্ঞাসা কর তবে আমার উত্তর এই যে বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।"

ওসমান নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

আয়েসা পুনরপি কহিতে লাগিলেন,—

"শুন ওসমান আবার বলি, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর, যাবজ্জীবন অন্য কেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। কাল যদি বধ্যভূমি ইহাঁর শোণিতে আর্দ্র হয়"—বলিতে বলিতে আয়েসা শিহরিয়া উঠিলেন—"তথাপি

দেখিবে হৃদয়-মন্দিরে ইহাঁর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্তকাল পর্য্যন্ত আরাধনা করিব। এই মুহূর্ত্তের পর হইতে যদি চিরন্তন ইহাঁর সহিত দেখা না হয়, কাল যদি ইনি মুক্তিলাভ করিয়া শত মহিলার মধ্যবর্ত্তী হন, আয়েসার নামে ধিক্কার করেন তথাপি আমি ইহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী দাসী রহিব।

আয়েসার চিত্রটী, আয়েসার নির্ম্মল প্রেমের ছবিটী, এই স্থানে বড় সুমধুর ভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, এজন্য আমরা এই স্থানটীর কতক অংশ উপরে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

আয়েসা এক প্রকার জানিতেন তাহাদের মিলন অসম্ভব, মিলনের আশাও তিনি বড় একটা করিতেন না। চিরদুঃখময় অনন্ত বিরহের মধ্যে যে একটী গভীর, গম্ভীর অথচ উৎকট সুখ আছে তাহার ধ্যানে জীবন পাত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইয়াছিল। অনেকে বলেন মিলনাশা বিহীন বিরহ ভালবাসার পথে কণ্টক স্বরূপ কিন্তু এ কথা সর্ব্বত্র স্বীকার্য্য নহে। চিরদুঃখিনী হিন্দুবিধবা হৃদয়পটে একটী মূর্ত্তি অঙ্কিত রাখিয়া চিরকাল এক গভীর স্মৃতিময় বিরহ সুখে কাল কাটাইয়া যায়। বাস্তবিক উভয়ের মধ্যে যদি এই স্মৃতি সংযোজন টুকু না থাকিত তাহা হইলে বিধবার ক্লেশ বোধ হয় আরও শতগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিত। স্বর্গলোকবাসী স্বামীর ইহলোকে মিলনাশা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও এই বিরহ বিধবার স্বামী প্রেমের পথে কণ্টক হইতে পারে না। এ ভালবাসার ভিত্তি নিজের নিজত্ব পরের করিয়া দেওয়া—"আমিত্ব ভুলিয়া অন্যের সহিত একত্ব সংস্থাপন। বিধবা জানে স্বামীকে আর পাইবে না, কিন্তু এই চিরবিরহের মধ্যে সে স্বামীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত তাহার ছায়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই অনন্ত বিরহের মধ্যেও এক গভীর মিলন সুখ অনুভব করিয়া থাকে।*

*বালিকা বিধবাদিগের প্রতি এ স্থানে লক্ষ্য করা হয় নাই। যাহারা স্বামীকে রীতিমত চিনিয়া বিধবা হইয়াছে তাহাদিগের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। প্র, লে।

আয়েসার প্রণয়ও এইরূপ মিলনাশা বর্জ্জিত ছিল। যখন তিনি জগৎ সিংহের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন তখন তিনি তাহার প্রেমের প্রতিদানের আশা ত্যাগের সহিত তাহার হৃদয়ের প্রেম আশা বিসর্জ্জন দিলেন না, পরন্তু ক্রমাগত প্রণয়পাত্রকে ধ্যান ও ভক্তির সামগ্রী করিয়া কেবল তাঁহার কল্পিত চরণে প্রেমাশ্রু উপহার দিতে থাকিলেন এবং এই স্বর্গীয় আনন্দ উৎফুল্লিতা হইয়া স্বর্গীয় দেববালার ন্যায় শুদ্ধচিত্তে তাহার রোপিত প্রণয় বৃক্ষে জল সেচন করিয়া তাহার পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন।

জেলেখায় প্রণয় ঠিক এ প্রকারের নয় কিন্তু সে প্রেম আরও হৃদয় উন্মত্তকারী আরও গভীর। এই প্রেমের জন্য তিনি তাহার দেওয়ানা সাজিয়া ভৃত্যবেশে রাজস্থানের পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। ভয়ানক বনস্থলী, গম্ভীর কন্দর সমূহ, বিভীষিকাময় রাজপুতানার দেব-মন্দির সকল, কোথায়ই যাইতে তিনি বাকি রাখেন নাই, ছায়ার ন্যায় সর্ব্বত্র তিনি নরেন্দ্রের অনুগামী হইয়াছেন।

রাজা জয় সিংহের শিবিরে আহত অবস্থায় নরেন্দ্র প্রথমে জেলেখার চক্ষুতে পড়েন। সেই দিন হইতেই অভাগিনী নিজ হৃদয় পরকে দান করিয়া জন্মের মত আত্ম সুখ বিসর্জ্জন দিলেন। আহত রোগীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি দিল্লীতে আসিলেন এবং একরূপ গোপনে নরেন্দ্রকে সম্রাটের বেগম মহলে পর্য্যন্ত লইয়া রাখিলেন। যে দুঃসাহসিক কার্য্যের নিশ্চিত পরিণাম—প্রাণদণ্ড, অভাগিনী নরেন্দ্রের জন্য তাহা করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না।

এখানে আসিয়াও পাপিষ্ঠ মসরুর জন্য তিনি স্থিরচিত্ত হইতে পারিলেন না। দহ্যমান নগরে অসমর্থ বৃদ্ধ পক্ষীকে লইয়া নিরুপায় পক্ষিণীর যে দশা ঘটে, নরেন্দ্রকে এখানে আনিয়া জেলেখারও সেই দশা ঘটিল।

তার পর জেলেখা বন্দী হইলেন। সকল যন্ত্রণা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন কিন্তু নরেন্দ্রকে না দেখিয়া তিনি কিছুতেই থাকিতে পারিতেন না। দ্বার রক্ষক ও মসরুরকে অনেক তোষামোদের পর তিনি নরেন্দ্রকে এক এক বার দেখিতে পাইতেন, কিন্তু বাক্যালাপ করিতে পাইতেন

না। আপন মহলে ফিরিয়া যাইতেন, যাইয়া সেই দেবকান্তির চিন্তা করিতেন।

নরেন্দ্রও এখানে কাহাকেও দেখিতে পাইতেন না, কেবল জেলেখার সকরুণ মুখ খানিই তাহার সেই বিস্তৃত ইন্দ্রালয় তুল্য পুরীতে এক মাত্র শান্তিপ্রদ ছিল। আয়েসাও ব্যাধির সময়ে জগৎ সিংহের সেবা করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু জেলেখার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্যও ঘটে নাই। সজল, উজ্জ্বল চক্ষু দুইটী আরও উজ্জ্বল করিয়া তিনি কেবল নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, আর অমনি পদ্মচক্ষু দুইটী ভাঙ্গিয়া আসিত। তাহার সেই গভীর প্রেম পূরিত হৃদয় কেবল মাত্র নরেন্দ্র প্রাপ্তির উপায়ই অন্বেষণ করিত। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ ভিন্ন তিনি এ কথা নরেন্দ্রের নিকটও প্রকাশ করেন নাই।

নরেন্দ্র যখন বন্দীভাবে বাদসাহের বেগম মহলে ব্যাধিতে অভিভূত থাকিতেন, তখন মসরু ও জেলেখা ভিন্ন আর কেহই তাহাকে দেখিতে আসিত না। তিনি মসরুর আচরণে ভীত ও জেলেখার ব্যবহারে বিস্মিত হইতেন। এ দেবী মূর্ত্তি কে? নরেন্দ্র কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। একদিন বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

"সুন্দরী আমার বোধ হইতেছে আমি কোন বিপদে পড়িয়াছি, আমার হৃৎকম্প হইতেছে—আমি অভাগা, জন্মাবধি অভাগা। আমাকে একটী কথা বলিয়া রক্ষা করুন, আমি কি নিরাপদে আছি।"

জেলেখা ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপিত করিয়া সহসা মুখ ফিরাইল, নরেন্দ্রের বোধ হইল যেন তিনি জেলেখার উজ্জ্বল চক্ষুতে জল দেখিতে পাইলেন, আর কোন প্রশ্ন করা বিফল বিবেচনায় নীরব হইয়া পড়িলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"হায় আমার মত কে অভাগা!"

অস্পষ্ট প্রতিধ্বনির মত একটী শব্দ শুনিতে পাইলেন, "জেলেখা অভাগিনী" এ কথা কি জেলেখা উচ্চারণ করিল? তাহা ত বোধ হয় না, জেলেখা ধীরপদ-সঞ্চারণে সেই ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। তবে কি নরেন্দ্রনাথের আপনার মুখোচ্চারিত কথার প্রতিধ্বনি হইল? "জেলেখা অভাগিনী!"

সত্যই জেলেখা অভাগিনী। তাহার গভীর প্রেমের তিনি একটুও

প্রতিদান পান নাই! কিন্তু আয়েসা যেরূপ জগৎ সিংহের হৃদয় অন্যের জানিয়াও তাহার প্রেমানুরাগ জলন্ত রাখিয়াছিলেন। সে হৃদয় আপনার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, জেলেখা সেরূপ পারিলেন না, যখন তিনি জানিলেন তাহার পৃথিবীর মধ্যে রম্য নিকেতন নরেন্দ্রের হৃদয় কন্দর তাহার নহে তখন তিনি ত্যক্ত বাঘিনীর ন্যায় একবার ভয়ানক হইয়া উঠিলেন। তাহার উষ্ণ রক্ত স্রোত তাহার প্রতি ধমনীতে থাকিল। কাল সর্পের ন্যায় হঠাৎ ক্রোধাবেশে তিনি নরেন্দ্রকে দংশন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু শেষে ক্রোধ কমিল। এইটুকু জেলেখার প্রেমের বিশেষত্ব। আয়েসা ধীর, শান্ত, সৌম্যমূর্ত্তি, প্রেমে সহজেই নমনীয়। জেলেখা স্বইচ্ছার বিপরীত কার্য্যে প্রচণ্ড, উগ্র, রুদ্রমূর্ত্তি কিন্তু সামান্য প্রেমেই একবারে দ্রবনীয়।

আয়েসার প্রেম—বঙ্গ বালার প্রেম।

জেলেখার প্রেম—তাতার দেওয়ানারি প্রেম।

নরেন্দ্র তাহার হইবে এই জেলেখার ইচ্ছা, তিনি মনে করিতেন নরেন্দ্র যে তাঁহার হইতে চাহেন না, এটা বড়ই অন্যায়। বাস্তবিক তিনি তাঁহার প্রেমের আবেগ বুঝিতেন—বিশ্বসংসারে তাহার হৃদয়ের সহিত তুলনা করিয়া বুঝিলেন—মনে করিতেন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম চক্রের তাহার সেই গভীর প্রবলতাময় প্রেমবর্ত্তের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া না চলাটা একটা মহা অন্যায়।

আয়েসা নিয়ন্তার কঠিন নিয়মে বাধ্য হইয়া তাহার প্রদত্ত ফল মাথা পাতিয়া লইয়াছেন কিন্তু জেলেখা আত্ম নির্ভরতার উপর দাঁড়াইয়া প্রেমের আবেগে স্ববিজয়ী হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যখন তিনি দেখিলেন নরেন্দ্রের হৃদয় তাঁহার নহে তখন তিনি তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়ান্তর অবলম্বন করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না, হায়! "জেলেখা অভাগিনী।"

ক্রমশঃ।

মৃত্যু ও মৃত্যু ভয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা গুণে চাকচিক্য, আমোদ প্রমোদ ভিন্ন লোকে প্রায় অন্য কিছু ভাল বাসে না। আজ কাল প্রজাপতি জীবনই লোকের প্রিয়। তাই রঙ্গভূমে হাস্যরসের ছড়াছড়ি, লোকের ঘর দ্বার চাকচিক্যশালী আড়ম্বর-পদার্থপূর্ণ এবং লোকে নাচিতে গাইতেই রত। তুলসী দাসের অথবা রামপ্রসাদের দুই চারিটা গান গাইলেই, শ্রোতৃবর্গের কেহ না কেহ বলিয়া থাকেন "গঙ্গাযাত্রা করা ছাড়, মজা ধর।" এই প্রবন্ধের শিরোভাগ প্রতি লক্ষ্য করিয়াই হয় ত অনেকেই "পূর্ণিমার" অন্য প্রবন্ধের অনুসরণ করিবেন।

মৃত্যু কি অদ্যাবধি কেহ ঠিক করিতে পারেন নাই। "আলো আধারী"র ন্যায় লোকের জীবন ও মৃত্যু জ্ঞান অপরিস্ফুট। ঐ টেবিলের উপর যে বাতিটি জ্বলিতেছে তাহা জীবনের এবং তথায় নির্ব্বাপিত যে অন্য একটি বাতি রহিয়াছে, তাহা মৃত্যুর প্রতিকৃতি। কিন্তু বস্তুতঃ জীবন কি, মৃত্যু কি, তাহা বলা সহজ নহে।

আর্য্য ভাষায় পঞ্চত্ব মৃত্যুর অপর নাম। মৃত্যুতে মানুষ পঞ্চত্ব কি না পঞ্চভূত প্রাপ্ত হয়। "পাঁচের" মিশ্রণে জীবন এবং মৃত্যুতে তাহার বিয়োগ অর্থাৎ সেই যোগের বিশ্লেষ হয়। মরণে পাঁচে পাঁচ মিশাইয়া যায়। মোটামুটি মৃত্যুর এই সংজ্ঞা মন্দ নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জীবন ও মৃত্যুর ভাবটি এইরূপে প্রকাশ করেন। ইংরাজের চিকিৎসা শাস্ত্র জীবন ও মৃত্যু এই প্রকার বর্ণন করিয়া থাকেনঃ—

"Life is the harmonious action of the cells and death their want of harmony and failure of the nervous system."

জীবদেহের ভৌতিক কোষ সকলের সমঞ্জসীভূত কার্য্যের নাম জীবন এবং তাহার অভাব এবং স্নায়ু মণ্ডলীর প্রয়োজনীয় কার্য্যের বিলোপকে মৃত্যু বলে। ইংরাজের চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে মস্তিষ্কের বিপর্য্যয়ে ফুস্‌ফুসের হৃদয়ের কার্য্য বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অল্প দিন হইল আমার একটি শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অনেকগুলিন স্বীয় বন্ধু এবং একজন এল, এম, এস,

উপাধিধারী ডাক্তার সহ এই ঘটনাটি কাশীতে প্রত্যক্ষ করেন। দুইটি শিষ্য সহ একটি হটযোগী তাঁহার কোন বন্ধুর ভবনে উপস্থিত হইলে তথায় তিনি এবং তাঁহার অন্যান্য সুহৃদ্ এবং উক্ত ডাক্তার সমবেত হন। যোগী প্রথমতঃ নিজ দক্ষিণাঙ্গ নিঃস্পন্দ পরে বামাঙ্গ ঐরূপ করেন। তৎপরে সমুদয় শরীর স্পন্দন রহিত করিয়া একবারে চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলে মৃতের ন্যায় শয়ন করেন। উক্ত ডাক্তার বাবু যোগীর হাত দেখিয়া বলেন, নাড়ি নাই; হৃদয়ে হৃদ্‌যন্ত্র সংযোগে অনেক ক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলেন, হৃদ্‌কার্য্য স্থগিত হইয়াছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস মাত্র হইতেছে না, আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র মত এই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। যোগী এই অবস্থায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকেন। পরে তাঁহার শিষ্যদ্বয় অনেক যত্ন করিয়া তাঁহার সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। অল্প দুগ্ধ পান করিয়া অনেক ক্ষণের পর যোগী সুস্থ হন। এই সঙ্গে পাঠক বিখ্যাত হরিদাসের কাহিনী স্মরণ করিবেন। হরিদাসকে গোর দিয়া গোরের উপরি ভাগ মাটি দিয়া পূর্ণ করা হইয়াছিল এবং গোরের উপরে যব গজাইয়াছিল। হরিদাস গোরের মধ্যে অনেক দিন থাকেন এবং পরে গোর খুঁড়িয়া তাঁহাকে বাহির করা হইলে তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কথা বার্ত্তা কন। হরিদাস ঘটিত এই অদ্ভুত ব্যাপারের সাক্ষী কয়েকটি সুখ্যাত ইংরাজ সৈনিক-পুরুষ। তাই আবার বলি, মৃত্যু কি, তাহা আমরা জানি না।

জগৎ অর্থে যাহা গমনশীল, যাহা পরিবর্ত্তনময় এবং যাহা নিত্য ও সৎ নহে। জগতে সংযোগ বিয়োগ নিয়ত ঘটিতেছে। জড়বাদীরা ঘটনার পশ্চাৎ যাইতে, তাহার অন্য ভাগে "উকি" মারিতে অসম্মত। আধ্যাত্ম-বাদীরা কেবল ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন। তাহাদের মতে প্রত্যক্ষ ঘটনাদির পশ্চাৎ কোন কিছু আছে, যাহার জন্য জাগতিক ঘটনার সংঘটন হইতেছে। এই "কোন কিছু" লইয়া দার্শনিকগণ আবহমান কাল ব্যস্ত। আত্মজ্ঞান লইয়া পণ্ডিত প্রবর হাক্সিলীর মানসও বিষম আলোড়িত। কিন্তু আজি পর্য্যন্তও এই "কোন কিছুর" কিছু স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। মৃত্যু কি? ইহার সদুত্তর অদ্যাবধি কেহ দিতে পারেন নাই। অদূরে ঐ যে একটি প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে তাহা জীবনময় অথবা একবারে মৃত তাহা কে বলিতে পারে?

আজ কাল ইউরোপীয়েরা প্রত্যক্ষ, উপস্থিত বিষয় লইয়াই প্রায় ব্যস্ত। মৃত্যু পথ দিয়া মানুষ কোন্ অপ্রত্যক্ষ স্থানে নীত হয় তাহার নিশ্চয় নাই। ইউরোপের ইংরাজ এক দিকে বীরপুরুষ হইলেও মৃত্যুকে ভয় করিয়া থাকেন। ওলাউঠা, বসন্ত, ডিপথিরিয়া রোগাক্রান্ত আত্মীয়ের সন্নিহিত হইতেও ইংরাজ কুণ্ঠিত। অদৃষ্টবাদী পরমাত্মবিশ্বাসী আর্য্যসুত ইংরাজের ন্যায় মৃত্যুভয় ভীত নহে। বিষম ইংরাজী নবিস দেশী ফিরাঙ্গী ভিন্ন হিন্দু ঐরূপ স্থলে আত্মীয়কে পরিত্যাগ করেন না, অন্যথা পক্ষে তাহার পার্শ্বে থাকিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হন। আমাদের শিশিরকুমার ঘোষ অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি বঙ্গসুত হয় ত একটি বাঘকে গুলি করিতে অগ্রসর হইবেন না, একটি বিষম অরাতির মস্তকচ্ছেদনে সঙ্কুচিত হইবেন, কিন্তু মৃত্যুমুখ দর্শনে ইহাদের ভীত হওনের সম্ভাবনা কম। ইঁহারা প্রকৃত শৌর্য্য বিশিষ্ট, বিশ্বাসী আর্য্য তনয়। কেবল প্রত্যক্ষ, উপস্থিত বিষয়েই ইঁহারা ব্যাপৃত নন। অস্ফুট ক্ষীণ স্বরে হরিসংকীর্ত্তনে যোগ দিয়া অনেক বৃদ্ধ হিন্দু গঙ্গাযাত্রা করেন। পূর্ব্বে আর্য্যনারীরা মঙ্গলধ্বনি করিয়া সহমৃতা হইতেন। প্রকৃত হিন্দুর বিশ্বাস জন্ম মৃত্যু নূতন বসন ধারণ এবং পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ মাত্র।

ঘনিষ্ঠতা, অভ্যাস দ্বারা শ্রদ্ধা ভয় কমিয়া যায়। (Familiarity breeds contempt.) বুনোরা ব্যাঘ্র ভল্লুক ভয় করে না, শবসাধনকারিদের ভূতের ভয় নাই। তুমি আমি আমরা যেরূপ আশঙ্কা করি, তারকেশ্বরের মাহান্তের বাবা তারকনাথকে সেরূপ ভয় করা সম্ভবপর নয়। দেবাদিদেব মহাদেব শঙ্কর মৃত্যু ও মৃত্যুচ্ছায়া পরিবৃত। শঙ্কর শ্মশানবাসী, চিতা-ভস্মধারী। তাঁহার ভূষণ কাল-সর্প এবং কণ্ঠে হলাহল। কাল স্বরূপিণী শ্যামামূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ারূঢ়া। মৃত্যুভয়হারী ব্রহ্মনাম শিবের কণ্ঠে ও গণ্ডে নিয়ত শব্দিত। মহাদেব মূঢ় মৃত্যু অভ্যস্ত এবং নিয়ত মৃত্যু সন্নিহিত। শঙ্কর তাই মৃত্যু বিবর্জ্জিত, তাই তাঁহার নাম মৃত্যুঞ্জয়। আর্য্যশাস্ত্র রূপকময়। রূপকাশ্রয়ে সেই শাস্ত্র মৃত্যুভয় এড়াইবার কি সুন্দর উপদেশই প্রদান করিতেছেন।

এই স্থানে এবং এ সম্বন্ধে আর্য্য পুরাণ শাস্ত্রের আর একটি কথার উল্লেখ করিব। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মহাজ্ঞানী পরম যোগী ভীষ্মদেব শরশয্যাগত।

তীক্ষ্ণ শীর্ষ শর সমূহ উপরি ভীষ্মের শরীর সংস্থিত। মৃত্যু ভীষ্মের সম্মুখস্থ। কিন্তু ভীষ্মদেব অবিচল চিত্ত, উদ্বেগ পরিশূন্য। অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবগণকে শান্তি-কথনে নিযুক্ত। মৃত্যু সম্মুখে দেখিয়া ও ভীষ্মের মৃত্যুভয়ে ভীত না হইবার কারণ কি? কারণ, যোগাভ্যাস, আজীবন মৃত্যুচিন্তা, মৃত্যুভয়হারী ভগবান চিন্তা। ভীষ্মদেব তাই মৃত্যুভয় শূন্য।

ঘোর বিষয়ীরই সমধিক মৃত্যুভয়। যে ধন ধান্য মাত্রের পূজা করে, দারা সুত মাত্রে যার প্রীতি প্রধাবিত, মৃত্যু তাহার পক্ষে অতি ভয়ানক। মৃত্যু হস্তে তিনি এই সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন, তাহার সকল সুখের শেষ হইবে, এই চিন্তায় তিনি মৃত্যুমুখ দর্শনে এককালে বিহ্বল এবং বিষম ব্যাকুল। সুখের ঘর দ্বার, পরিবার হইতে মৃত্যু তাহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে এই ভাবনায় তাহার প্রাণ শুকাইয়া যায়, প্রাণের যাতনা যার পর নাই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাই বলি, ঘোর বিষয়ীর বিষম মৃত্যুভয়। তাহার ভাগ্যে সুখ-মৃত্যু অসম্ভব।

এইক্ষণে একটি পরম জ্ঞানী, সন্ন্যাসীর বিষয় চিন্তা করা যাউক। ইনি বেদাদি অধ্যয়নে ব্রহ্মচর্য্য সাঙ্গ করিয়া, দার পরিগ্রহ ও সন্তান উৎপাদন পূর্ব্বক সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে যাত্রা করেন। পরিশেষে সন্ন্যাসী হন। সংসার বাসনা-শূন্য এবং পরব্রহ্মে একান্ত অনুরক্ত হওয়ায় অন্য সমস্ত তাঁহার পক্ষে-পর এবং পরমেশ্বর মাত্র তাঁহার আপন হইয়া পড়ে। মৃত্যু উপস্থিত হইলে সন্ন্যাসীর ভয় ভাবনা মাত্র উদয় হয় না। পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই তিনি "আমার" বলিতেন না। কোন প্রিয় বস্তু ছাড়িয়া তাঁহাকে লোকান্তরে যাইতে হইতেছে না। তবে তাঁহার ভয় ভাবনা কিসের? তিনি জানেন দেহ ধ্বংসশীল এবং মৃত্যুর অধীন। আজীবন তিনি মৃত্যু চিন্তা করিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন যে মৃত্যু তাঁহাকে অমৃততে লইয়া যাইবে। কাজেই পরম জ্ঞানী সন্ন্যাসীর পক্ষে মৃত্যু কোনরূপে ভয়াবহ নহে। বিদেশ হইতে স্বদেশ গমনের ন্যায় সন্ন্যাসী ইহলোক হইতে লোকান্তরে গমন করেন। "মলে বাঁচি" এ কথা কেবল সন্ন্যাসীর মুখেই সাজে।

মৃত্যু একান্ত ভয়াবহ হইলেও অনেক সময়ে অনেক স্থলে শুভ সাধন করিয়া থাকে। খ্যাতনামা জনৈক ইংরাজ গ্রন্থকার বলিয়াছেন,

Sorrow is a privilege শোক দুঃখ এক প্রকার সৌভাগ্য। শোক দুঃখ, আপদ বিপদ্, জরা মৃত্যু মানুষের দুর্বৃত্ততা, ধৃষ্টতা এবং অহঙ্কারাদি চূর্ণ করিয়া তাহাকে বিনয়ী এবং প্রশমিত করিয়া থাকে এবং ধর্ম্ম এবং যথাযথ পথে রক্ষা করে। অতি সঙ্গত রূপে কুন্তীদেবী ভগবান বাসুদেবের নিকট বিপদ্ মাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেবী বলিয়াছিলেন "হে ভগবন্ বিপদে তোমার শরণ লইতে আমরা বাধ্য হইব। নিয়ত বিপৎপাতে আমরা প্রতিনিয়ত তোমার শরণাগত থাকিব।" দাবাগ্নির ন্যায় নিপোলিয়ান বনাপার্টি মানবমণ্ডলীর সর্ব্বনাশ করিতে থাকেন। ওয়াটারলুর যুদ্ধে তাঁহার অধঃপতন হয় এবং তৎপরে তিনি ধর্ম্ম, পরকাল চিন্তায় ব্যাপৃত এবং কথঞ্চিৎ প্রশমিত হন।

আর্য্য ভাষায় মৃত্যুর আর একটী নাম শমন। শমন অর্থে যাহা শান্ত অথবা প্রশমিত করে। যৌবনে দুর্বৃত্ত, উদ্ধত থাকিলেও লোকে বার্দ্ধক্যে শান্ত, বিনয়ী এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া থাকে। বার্দ্ধক্যে কেশ শ্বেত হয়, দাঁত পড়িয়া যায় এবং চক্ষু কর্ণের শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। এই সমস্তে যমের মৃত্যুর সমাগম অনুসূচিত হয় এবং যমের অদূরে আগমন দৃষ্টে মানুষ সংযত, শান্ত হইয়া থাকে। সংস্কৃতে যম অর্থে যাহা সংযত করে। অহঙ্কারপূর্ণ, উচ্ছৃঙ্খলতাময় জগতে মৃত্যুর, যমের আবশ্যকতা আছে।

আর্য্য মুনি ঋষিরা গ্রহণী জনিত মৃত্যু ইচ্ছা করিতেন। গ্রহণী রোগে দৈহিক শক্তির এবং যন্ত্র সমূহের অল্পে অল্পে হ্রাস এবং বিকলতা হইয়াও ঘটিয়া থাকে। বালক যেমন মাতৃ-ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়ে, গ্রহণী-রোগীও তদ্রূপ ইহলোক হইতে আস্তে আস্তে অপসৃত হয়। অন্যান্য পীড়ার প্রথম প্রথম যন্ত্রণাদি হইলেও শেষ অবস্থায় রোগীর বেশী যন্ত্রণা না হইবারই সম্ভাবনা। নিদানকালে স্নায়ু সকলের শক্তির ও কার্য্যের বিলোপে ক্লেশানুভব না হইতে পারে।

"হরি ভজ, কি হর ভজ, মোর্‌তে জানলে হয়।" এই বাক্যটির গভীর অর্থ আছে। যে সুখে স্বচ্ছন্দে, নির্ভয়ে মরিতে পারে সেইই মহান্। হিন্দু সোরসার করিয়া গঙ্গা তীরে যাইয়া মরে। তাহার মৃত্যু দেখিয়া লোকে বুঝিতে পারে, ব্যক্তিটা কিরূপ ছিল। আমরা ইহ সংসারে আপন কার্য্য, কর্ত্তব্য করিয়া থাকি এবং কালে কাল মুখে পতিত হই। "প্রভো!

সাধ্যমত আমি স্বকার্য্য ও তোমার সেবা করিতে আলস্য করি নাই, তব পদে আত্ম সমর্পণ করিলাম।” এই কথা বলিয়া যে ভবলীলাস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে, সেই প্রকৃত পুরুষ।

মৃত্যু-শয্যাপার্শ্বে দারা সুতকে রোদন করিতে দেখিয়া কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “আমি চিরদিন ইহ সংসারে থাকিব, বোধ হয়, তোমরা এরূপ কথন মনে কর নাই, তবে কান্না কেন ?” এনিও যে সে লোক নন।

ফুল বাবুরা ঘোর বিলাসীরা যাহাই বলুন, সময়ে সময়ে শ্মশানভূমে গমনে লাভ আছে। প্রজ্বলিত শবচিতা গম্ভীর শব্দে অনেক সদুপদেশ দিয়া থাকে।

শ্রীদীননাথ ধর।

১লা জানুয়ারি—১৮৯৫।

আর একটি বৎসর গত হইল। গলায় গাঁদার মালা এবং খৃষ্টমাস কেক্ (পিটা) দিয়া ইংরাজ পুরাতন সন ১৮৯৪ শালকে বিদায় করিয়াছেন। ১৮৯৪ শাল চলিয়া গিয়াছে। শাল কি কাল—কোথা গেল ? জলে যেমন জলবিম্ব মিশায় কাল কি তেমনি কোন কিছুতে মিশাইল ? কেহ কেহ বলেন, কাল অনন্তকালে মিশাইয়া যায়। জিজ্ঞাসা করি, অনন্ত কালটা কি ? পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিমে অনন্ত জলরাশি রহিয়াছে। তাহাতে তরঙ্গ উঠিয়া আবার তাহাতেই মিশাইয়া যায়। মহাসমুদ্রের ন্যায় অনন্তকাল কি কোথায় অবস্থিত ?

মনুষ্যভাষায় কালাংশ বৎসরকে নূতন পুরাতন বলা হইয়া থাকে। অদ্য ১লা জানুয়ারি ১৮৯৫ সাল—ইনি নূতন সন। ৩১শে ডিসেম্বরের রাত্রি ১২টার পর ইনিই আবার পুরাতন, বুড়ো হবেন, এই সনের তখন শণ—দাড়ি হবে। কালের আবার নূতন পুরাতন কি ? কাল ধরিয়াই ত অন্য সমস্ত নূতন পুরাতন। ইহার আদি অন্ত কি তাহা মানব বুদ্ধির অগম্য। “অনন্ত কাল” আমাদের পক্ষে বাক্য মাত্র, নরবুদ্ধির গোচর নয়।

কালে সকলই নষ্ট হয়, কালকে তাই সর্ব্বসংহর্ত্তা বলে। শুধু তাই

কেন? কাল ত জনয়িতাও। বাপই ত আবার ছেলে। ক্ষয়েই বৃদ্ধি, বিনাশেতেই ত জন্ম। সংহার মূর্ত্তি কালীর পদতলে শিব, সংহারমূলে মঙ্গল। কথাটি গভীর অর্থযুক্ত। কাস্তেতে ধান কাটে। কালও সব কাটে। তাই ইংরাজী ভাষায় এইরূপ একটি বাক্য আছে sickle of time কালরূপী কাস্তে। কিন্তু কাস্তে যেমন ধান কাটে, সেইরূপ লাঙ্গলেও ধান জন্মায়। কালও জনয়িতা। তবে ploughshare of time কাল-লাঙ্গল, ইংরাজ এ প্রকার কোন বাক্যের সৃষ্টি করেন নাই কেন? আমরা যতদূর দেখ্‌ছি ইংরাজ "একচোকো"।

শুনা যায় সাপে স্বীয় বাচ্ছা খাইয়া থাকে। কালের স্বভাবও সেইরূপ। কালও জীবজন্তু উৎপাদন করিয়া উদরসাৎ করে। মাকড়ের মত মহাকালও বমন এবং বমিত পদার্থ ভক্ষণে রত। সাপের বিষে লোক মরে এবং বাঁচে। কার্য্যগতিকে বিষ সুধা ও গরল। সময় ভাঙ্গে ও গড়ে, রাখে ও মারে। কাল সর্প, এ বাক্যটি, বেশ সঙ্গত। হিন্দুর কথাটা ত প্রায়ই সঙ্গত। তবে হিন্দু আজকাল সঙ্গতিহীন, দীন, এবং খেতে না পেয়ে ক্ষীণ।

১৮৯৪ সালে আমাদের দেশে দুইটি দিক্‌পালের পতন হইয়াছে, ভূদেব মুখোপাধ্যায় অথবা প্রমুখ এবং বঙ্কিমচন্দ্র অথবা সাহিত্য কেন্দ্র। আর য়ুরোপে রুষিয়ার মহীপাল এবং বিজ্ঞানহাল টিণ্ডাল কালকীলাল মগ্ন হইয়াছেন। কার্পাস হইতে সূত্র হইয়া থাকে। ১৮৯৪ সালের শেষে কার্পাস-করের (Cotton-duty) সূত্রপাত হইয়াছে। ইহাতে ভারতের পাতে ভাত পড়িবে কি তাহার শিল্পের সম্পাত হইবে তাহা আপাত বলা দুষ্কর।

কাল নাকাল ও আসান দেয়। বর্ষায় ভিজিয়ে মারে কিন্তু বসন্তে মন প্রাণ শীতল করে। যৌবনে যে দাঁত খাদ্য চর্ব্বণে সুখ প্রদান করে, বার্দ্ধক্যবশে কফযোগে তাহা যাতনা দিয়া থাকে। যে কাল লক্ষহীরা'র লাবণ্য ও মোহিনী শক্তির বিকাশ করিয়াছিল সেই কালই কালে তাহার জীবনের প্রদোষে তাহাকে বিশ্রী হাড়গড় ভাঙ্গা "দ" করে।

কালের কীর্ত্তি কিম্ভূতকিমাকার, লীলা বোঝা ভার। কাল জলকে স্থল এবং স্থলকে জল করিয়া থাকে। কালবলে বালুকা বিন্দু পর্ব্বত এবং

পর্ব্বত বালুকাবিন্দুতে পরিণত হয়। কাল তোমার ধন আমাকে এবং আমার ধন তোমায় দেয়। ভরতের ভারত ইংরাজকে দিয়াছেন এবং রণজিতের কহিনুর মহারাজ্ঞী করে সমর্পণ করিয়াছেন।

শ্রীদীননাথ ধর।

প্রফুল্ল।

(উপন্যাস)

গ্রামের মুখুর্য্যেরা বেশ ধনী লোক। কর্ত্তা কলিকাতায় হউসে কর্ম্ম করিয়া বেশ দশ টাকা উপায় করেন। জমি বাগানও কিছু আছে। কর্ত্তার মাতা এখনও জীবিত আছেন। বৃদ্ধা দিন রাত্রই হরি নামের মালা লইয়া বসিয়া থাকে। প্রফুল্ল বলিয়া কর্ত্তার একটী মাত্র পুত্র সন্তান। সে বৃদ্ধার মালাজপায় বড়ই বিরক্ত, ঠাকুব মা রূপ কথা না বলিয়া কেনইবা সুতা গাঁথা কাঠের বড়ি লইয়া রাত্র দিনই বিড় বিড় করিয়া বকে বালক তাহা বুঝি'তে পারে না, তাহার তাহা সহ্য হয় না। আমাদের গল্প এই প্রফুল্লকে লইয়া। সুতরাং প্রফুল্ল চন্দ্রের গত জীবনের একটু ইতিহাস পাঠককে বলিতে হইতেছে।

প্রফুল্লকুমারের মাতার যখন বিশ বৎসর বয়ক্রম তখন তিনি মুখুর্য্যেদের সুখের সংসারে আশা ভরসার মূর্ত্তির স্বরূপ ভূমিষ্ঠ হন। প্রফুল্ল জন্মিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধা বধুর বয়োবৃদ্ধি হইয়াছে, এখনও সন্তানাদি হইল না দেখিয়া বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। গৃহে যাগ্ যজ্ঞ করান, বধুকে সঙ্গে লইয়া হংসেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী, পাঁচুঠাকুর প্রভৃতি দেবতার পূজা দেওন ও বধুকে ঔষধ ধারণ করান ইত্যাদি বিবিধ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দেবতার অনুগ্রহেই হউক অথবা প্রকৃতির নিয়মানুসারেই হউক কিয়ৎ দিন পরেই বৃদ্ধার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, বধু একটী পুত্র সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করিলেন। পিতা মাতার যত্নে ও ঠাকুর মাতার আদরে নবজাত শিশু দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িয়া উঠিল। চিক্কণ ঈষদ্ দীর্ঘ কেশ গুচ্ছের মাঝে কমল শিশুমুখ খানিতে যখন মৃদু হাস্যের লহরী তুলিয়া বালক মাতার ক্রোড় হইতে ঠাকুর মাতার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িত তখন বধু ও শশ্রূ

ঠাকুরাণী যে স্বর্গীয় উল্লাস অনুভব করিত তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ঠাকুরমাতা শিশুর ফুল্ল আনন দেখিয়া অন্নপ্রাসনে প্রফুল্ল নাম রাখিলেন।

মা, ঠাকুরমার ও দাস দাসীর ক্রোড়ে ফিরিয়া প্রফুল্ল বাড়িয়া ক্রমে পঞ্চম বর্ষের হইল। মুখুর্য্যে মহাশয় সন্তানের হাতে খড়ি দিয়া পাঠশালায় পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন। বেত্রদণ্ড পরিশোভিত গ্রাম্য গুরুমহাশয়কে দেখিয়াই বালক ছুটিয়া ঠাকুরমার ক্রোড়াশ্রয় গ্রহণ করিল। ঠাকুরমাতা যত্নের পৌত্রকে উৎপীড়ক গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় পাঠাইতে স্বীকৃত হইলেন না। প্রফুল্লকে সুতরাং গুরু মহাশয়ের যষ্টি সুখ অনুভব করিতে হইল না।

প্রফুল্লচন্দ্রের গত জীবনের সব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতে গেলে আমাদের গল্প বড় বাড়িয়া উঠিবে।

স্বচ্ছন্দ সংসারে এক মাত্র সন্তানের যে সকল লক্ষণ হয় বাল্যকালে প্রফুল্লের তাহার অনেক গুলীন্ ছিল। প্রফুল্ল আদুরে, আবদারে, ক্রোধী, অভিমানী প্রভুত্বপ্রিয় ছিল বটে, কিন্তু সে কখন দুরন্ত ছিল না; দুষ্টামি কাহাকে বলিত তাহা সে জানিত না। কেবল দুষ্টামির মধ্যে এই ছিল যে ঠাকুরমা যখন তখন গল্প না বলিলে বৃদ্ধার হরিনামের ঝুলি গায় মালা অস্থানে কুস্থানে লুকাইয়া রাখিত, আর বুড়িকে রাগাইত। কিন্তু তথাপিও বার্দ্ধক্যে ও শিশুত্বের বেশ গাঢ় প্রণয় ছিল।

প্রফুল্ল যখন দ্বাদশ বৎসরের তখন হঠাৎ একদিন বাড়ীতে নহবৎ বাজিতে লাগিল। অনেক আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া মুখুর্য্যেদের বাটী পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তৃতীয় দিবসে রাজপোষাকে শোভিত হইয়া চতুর্দ্দোলে প্রফুল্ল বিবাহ করিতে গেল। বৃদ্ধা কাঠের মালা গুনিয়া ঠিক করিয়া ছিল যে ইহ সংসারে তাহার দিনও 'গুণতির' মধ্যে আসিয়াছে। অতএব ইতিমধ্যেই পৌত্রবধুর মঙ্গলময় মুখখানি না দেখিলে মরণে ত শান্তি হইবে না। তাহার আদরের প্রফুল্লের বধুকে ক্রোড়ে না লইলে কি বৃদ্ধা মরিয়া সুখ পাইবে? বৃদ্ধার আদেশেও গৃহিণীর উৎপীড়নে মুখুর্য্যে মহাশয় সন্তানের বিবাহ দিতে বাধ্য হইলেন।

যথা সময়ে বাজনা বাজাইয়া প্রফুল্ল বিবাহ করিয়া আসিল। একটী পঞ্চম বৎসরের দিব্য ফুটফুটে মেয়ে দাসীর ক্রোড়ে বসিয়া ফ্যাল ফ্যাল

করিয়া চাহিতে চাহিতে পাল্কী সমেৎ অন্দরে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা হরি-নামের মালা ফেলিয়া পৌত্র ও পৌত্রবধুকে একে একে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করত মস্তকস্থিত কেশ সমষ্টির হিসাব ধরিয়া নবদম্পতীর পরমায়ু সম্বন্ধে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিবাহ হইয়া গেলে নবোঢ়া যে ক'দিন শ্বশুরালয়ে ছিল, বৃদ্ধার ক্রোড়ে বেড়াইত, আর খেলাঘরে বসিয়া বালক পতির সহিত জুজুর ও পরীর গল্প শুনিত।

মুখুর্য্যে মহাশয় সাংসারিক লোক। তিনি দেখিলেন মাতার নিকট রাখিয়া দিলে তাহার পুত্রের বিদ্যাদি সম্বন্ধে গুরুতর আশঙ্কার কারণ আছে। তিনি প্রফুল্লকে পর বৎসরে কলিকাতায় লইয়া গিয়া স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

এইটুকু প্রফুল্লর গত জিবনী। তার পর আরও ষষ্ঠ সপ্ত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা ঠাকুরমাতা হরিনামের ঝুলি ফেলিয়া ইহসংসারে হইতে বিদায় লইয়াছেন। প্রফুল্ল ও বালকত্বের সীমা ছাড়াইয়া যৌবনের আদি রেখায় উপনীত হইয়াছে। আরও কত কি ঘটনা, সংঘটিত হইয়াছে, তাহার সবিশেষ বিবরণ আমাদের জানা নাই। তবে আমরা শুনিয়াছি যে ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে যে ক্ষুদ্র বালিকাটী মুখুর্য্যেদের বাটীতে আসিয়া গৃহআলো করিয়াছিল সেও বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং গোপনে গোপনে নাকি প্রফুল্লকে পত্রের উত্তরও লিখিতে শিখিয়াছে।

* * * *

শীতের পর ফাল্গুন মাসে প্রথম যেদিন স্নিগ্ধ দক্ষিণ মলয় প্রবাহিত হয়, সেই দিন যেমন সর্ব্বশরীর এক সুখতরঙ্গে উৎফুল্লিত হইয়া উঠে, মানুষ প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিয়া সেইরূপ উৎফুল্লিত হইয়া উঠে। বিবাহের পর প্রফুল্ল একবার মাত্র শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল, সেও অনেক দিন। ইহা ব্যতীত পত্নীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আর কখনও হয় নাই। বাটীতে পরস্পরে তত্ত্বাদি হইত বটে কিন্তু বালকের তাহাতে কোন সম্বন্ধই ছিল না। সে কলিকাতায় পড়িত, বেড়াইত, খেলাইয়া সময় অতিবাহিত করিত। দাম্পত্যপ্রেমের কোন কথাই তাহার মনে উদিত হইত না। কিন্তু এই সরল বালকত্ব ক'য় দিনের জন্য। যৌবনের প্রথমভাগেই প্রফুল্লের বিকাশোন্মুখ হৃদয়বৃত্তি প্রেমপ্রবণ হইয়া উঠিল। নিদ্রা ত্যাগ করিয়া

প্রফুল্ল যেন কোন সুখ রাজ্যে জাগরিত হইল। যে কবিতা প্রফুল্ল অগ্রে বুঝিতে পারিত না তাহার অর্থ এখন যেন সলিলের ন্যায় স্বচ্ছ বোধ হইতে লাগিল,যে কাব্যে তাহার ঘৃণা ছিল এখন তাহা আদরের হইল। কবিরা কোকিলের স্বরের মিষ্টতায় মোহিত হয়, পদ্মের পার্শ্বে মধুকরের গুণ-গুণানিতে কবিত্ব উপলব্ধি করে, চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় উত্তাপিত হয় এই সকলের জন্য প্রফুল্ল কবিদিগকে পাগল বলিয়া উপহাস করিত। কিন্তু এখন দেখিল কোকিলের স্বর অপেক্ষা এ জগতে এত মিষ্ট বুঝি আর কিছু নাই। পদ্মের পার্শ্বে মধুকর অপেক্ষা কাব্যময় চিত্র বুঝি আর অঙ্কিত হইতে পারে না। চন্দ্রের জ্যোতি অপেক্ষা দগ্ধকারি রশ্মি আর বুঝি বিজ্ঞানে নাই। সে যে এতদিন এই সহজ কথাগুলিন বুঝে নাই তাহাতে সে আপনার বুদ্ধির প্রতি আশ্চর্য্য হইত।

একদিন পর্ব্বোপলক্ষে আফিস স্কুল বন্ধ হইয়াছে, মুখুর্য্যে মহাশয় প্রফুল্লকে কলিকাতায় রাখিয়া বাটী গিয়াছেন। দশটার সময় হরকরা আসিয়া প্রফুল্লকে একখানি পত্র দিল। প্রফুল্ল দ্রুত গৃহে প্রবেশ করিয়া হর্ষান্বিত বদনে পত্র খানির আবরণ ছিড়িয়া ফেলিল, খুলিয়া পড়িলঃ—

স্বামিন্, আপনার পত্র পাইয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিতা হইয়াছি, তাহা এই ক্ষুদ্র লিপিতে বলিতে পারি না। আপনার মধুমাখা হরপগুলিন যত বারই পড়ি, তত বারই নূতন আনন্দ পাই। আপনি আমাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কিন্তু এ পোড়ার মুখিকে দেখিয়া কি আপনার পরিতৃপ্তি হইবে। আমি আপনার শ্রীচরণ দেখিবার জন্য চাতকিনীর ন্যায় উৎকণ্ঠিত আছি। জগদীশ্বর যে আমাদের কবে মিলন করাইবেন তাহা তিনিই জানেন। আমি ভাল আছি, আপনি কেমন আছেন লিখিবেন। পত্রের উত্তর শীঘ্র দিবেন, দেখিবেন যেন দেরি করিবেন না, পত্রই এ দাসীর সম্বল। ইতি

আপনারই একান্ত অনুগতা,

বসন্ত কুমারী।

পাঠক! ইহার উপর আর কিছু কি বলিতে হইবে? প্রফুল্ল পত্র খানি যে কতবার পাঠ করিল, কতবার চুম্বন করিল তাহা আমরা গনণা

করিয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু এমন সময় কি কাহারও হয় নাই? তবে বেশী কথার প্রয়োজন কি?

কৃপণের ঐশ্চর্য্যের মতন প্রফুল্ল অতি সংগোপনে যেথানে আরও কতকগুলি লুক্কায়িত ছিল সেই খানে এই পত্র থানি রাথিয়া দিল। পরে দ্রুতপদে কিয়ৎক্ষণ ইতঃস্তত পদচারণ করিল। একবারে পিতৃগৃহে প্রবেশ করিল, পিতা বাটী গিয়াছেন জানিলেও প্রফুল্ল তাঁহার বস্ত্র অনুসন্ধান করিল দেখিল বস্ত্র নাই, পাদুকা অনুসন্ধান করিল দেখিল পাদুকা নাই, শর্য্যা শূন্য রহিয়াছে। পুনরায় কিয়ৎকাল ইতঃস্তত ভ্রমণ করিল। প্রফুল্লের মস্তিষ্ক হর্ষমদে বিঘূর্ণিত হইয়াছিল, তাহাব প্রত্যেক ধমনী দিয়া উল্লাসস্রোত তীব্রবেগে চালনা হইতে ছিল। "জগদীশ্বর যে আমাদের কবে মিলন করাইবেন তাহা তিনিই জানেন।" প্রফুল্ল এই কথাগুলিন আলোচনা করিতেছিল আর তাহার হৃদয় উল্লাসে বিকম্পিত হইতেছিল।

তদবস্থায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল। সহসা প্রফুল্ল নিজ ট্রাঙ্ক খুলিয়া বস্ত্রাদি বাহির করিল। সৌগন্ধ দ্রব্যের শিশি খুলিয়া সেই সকল বস্ত্রাদিতে সিঞ্চন করিল।

সে দিবস আহার করিতে বেলা হইল। আহার করিয়া একটু বিশ্রামান্তব বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া প্রফুল্ল বাসা হইতে বাহির হইল। যাইবার সময় ভৃত্যকে বলিয়া গেল যে তাহার অদ্য অন্য স্থানে নিমন্ত্রণ আছে, কল্য প্রাতেও নিমন্ত্রণ আছে। মনে মনে ভাবিল বাবারও দু'দিন আফিস বন্ধ।

(২)

প্রফুল্লের শ্বশুরালয় রেল সন্নিকটস্থ গ্রামে। সুতরাং কলিকাতা হইতে দুই ঘণ্টার মধ্যেই প্রফুল্ল সেই গ্রামে আসিয়া পহুঁছিল। কিন্তু এখন একটা বিষম গোল বাধিল। পত্র পড়িয়া শোণিতেব যে উষ্ণতা হইয়াছিল যাহার প্রভাবে সকল দিক্ ভাবিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা ছিল না, এখন সে উষ্ণতা ত আর তত্তোধিক নাই। এখন মানসিক বৃত্তি প্রাকৃতিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছে সুতরাং সেই সকল রম্য কল্পনার উত্তেজনা এখন মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিতেছে না। এই শান্ত অবস্থায় প্রফুল্লের আর পূর্ব্বের সাহস নাই। এখন সেই সাহসের স্থানে দারুণ লজ্জা

জুটিয়াছে। শ্বশুরের গ্রামে আসিয়াছে, কিন্তু শ্বশুরালয় আদৌ জানা নাই। নিতান্ত বাল্যকালে একবার মাত্র প্রফুল্ল তথায় আসিয়াছিল, কিন্তু এখন ত কিছুই পরিচিত বোধ হয় না। অযাচিত হইয়া শ্বশুরালয়ে প্রথম গমন, শ্বশুরালয়ও অপরিচিত! প্রফুল্ল লজ্জায় ঘৃণায় এতটুকু হইয়া গেল; মনে করিল এখান হ'তে প্রত্যাগমন করি। কিন্তু প্রাণের ভিতর হইতে উত্তর হইল, 'ছি! তাও কি হয়!' প্রফুল্লের আর চরণ উঠিল না। কি বিষম দায়! মানুষ কি কখন এমন দায়ে পড়ে গা?

মনে মনে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া লজ্জাকে জোর করিয়া তাড়াইয়া প্রফুল্ল সাহস ভরে অগ্রসর হইল—পথে ছোট বালক বালিকা দেখিয়া শ্বশুর বাটীর সন্ধান করিয়া যাইতে লাগিল। এক স্থানে একটী গলির মাথায় কতকগুলি বালক বালিকা ক্রীড়া করিতেছিল। একটী বালিকা—সে বড় সুন্দরী—"বুড়ি" হইয়া বসিয়া আছে, তার অপর বালক ও বালিকাগুলি ছুটাছুটি করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতেছে। প্রফুল্ল একটু শ্রান্ত হইয়াছিল, সেইখানে দাঁড়াইয়া শিশুদের ক্রীড়া দেখিতে লাগিল। একটি বালক যেমন ছুটিয়া "বুড়িকে" ছুঁইতে আসিবে অমনি প্রফুল্লের গাত্রে 'ধাক্কা' লাগিয়া পড়িয়া গেল। আঘাত যত না লাগুক 'বুড়িকে' যে সে ছুঁইতে পারিল না বালকের তাহাই ক্রোধ—উঠিয়া প্রফুল্লের গাত্রে ধুলা নিক্ষেপ করিয়া কটু বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল এবং তাহা সমাপ্ত হইলে "দাঁড়াও না মাকে বলে দিই গে, কোথা হতে এক ছোড়া এসে আমাকে ফেলে দিয়ে মেরেচে" এই সুর তুলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহাভিমুখে ছুটিয়া গেল।

এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনায় প্রফুল্ল একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল, মনে ভাবিল এসে কি ঝকমারিরই কার্য্য করিয়াছি। কিন্তু তখন উপায়ান্তর। প্রফুল্ল সাত পাঁচ ভাবিয়া সেই বালিকাকে শ্বশুর বাটীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। কথাটী শুনিয়া বালিকা প্রশ্নকারীর মুখের প্রতি দুইটী বড় বড় চক্ষু স্থাপন করিয়া ক্ষণেক চাহিয়া রহিল। তার পরে বলিল "ঐখানে, আমার সঙ্গে এস" এই বলিয়া যেদিকে সেই বালক ছুটীয়া গিয়াছিল বালিকা সেই দিকে চলিল। প্রফুল্ল বালিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কম্পিত হৃদয়ে যাইতে লাগিল।

পশ্চাৎ হইতে খেলিদের মধ্যে একজন ডাকিল,—"বসন্ত আর খেল্‌বিনে ভাই?"

"না ভাই, এখন বাড়ী যাই।"

বসন্ত!—নাম শুনিয়া প্রফুল্লের হৃদ্‌পিণ্ড দপ্‌ করিয়া উঠিল। শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। ধমনী দিয়া রক্ত উষ্ণ প্রবাহিত হইল। বালিকা একটী বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া—প্রফুল্ল এতক্ষণে বাটী চিনিতে পারিয়াছে—ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "এই বাড়ী। তুমি কি চাও?"

প্রফুল্লের মুখে বাক্য নাই। সে তখন ভাবিতেছিল এই কি সেই? সেই অনেক দিনের কথার মত, আবছায়ার মতন যে দুইটা চক্ষু মনে পড়িতেছে সেই দুইটা চক্ষু এই দুইটা চক্ষুর মতন নয় কি? সেই ভঙ্গিমার সহিত এই ভঙ্গিমার কি কিছু মিল নাই? এমন সময়ে বালিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাও?"

প্রফুল্ল কি উত্তর করিবে কিছুই খুঁজিয়া পাইল না, কেবল চাহিয়া রহিল। এমন সময়ে বাটীর ভিতর হইতে একজন স্ত্রীলোক বাহিরে আসিল। সে এই বাড়ীর পুরাতন দাসী, কুটুম্ব বাড়ীতে তত্ত্বতাবাস উপলক্ষে তাহার বিশেষ গতিবিধি আছে। সেই দাসী প্রফুল্লকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল, ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"ও বসন্ত! ও যে তোর বর লো! কোথা হ'তে ধরে নিয়ে এলি? এস, এস, জামাই বাবু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি কনের সহিত আলাপ করিতে হয়?"

বর! বালিকা এক দৌড়ে একেবারে বাটির ভিতর গিয়া গৃহে কবাট বন্ধ করিয়া লুকাইল। যে বালকটী পড়িয়া গিয়াছিল সে দুষ্ট আগন্তুককে শাসন করিবার জন্ম এই দাসীকে ডাকিয়া আনিতেছিল। প্রফুল্লকে নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বালক দাসীকে বলিল—"ঐ! ঐ ছোঁড়া আমাকে ফেলে দিয়েচে।" ভুতর মা বালকের মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"ছি! ছোঁড়া বলিতে নাই, উনি যে তোমার বোনাই।" বালক ক্রুদ্ধ হইয়া জোর করিয়া বলিল 'ও আমার বোনাই নয়, বসন্দির বোনাই।'

শ্যালক বাবুর সহিত প্রফুল্লের এইরূপ প্রথম পরিচয় হইল।

(৩)

রাত্রে যথাকালে প্রফুল্ল শয্যাগৃহে নীত হইল। বাহির হইতে দ্বার বন্ধ হইল। গৃহে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল। পালঙ্কে শয্যার এক প্রান্তে আপাদ মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া একটী ক্ষুদ্রকায়া মূর্ত্তি শয়ন করিয়াছিল।

প্রফুল্ল সেই পালঙ্কে বসিল। দুইটী হৃদয়ের এই প্রথম মিলনের রজনী কি কবিত্বাময়! এই মিলনের সুখের বেদনা কি গভীর, কি মর্ম্মস্পর্শী! প্রফুল্লের জীবনের এই মুহূর্ত্ত কি অর্থপূর্ণ? ইহা কি আর বুঝাইতে হইবে?

যে এতদূর সাহস করিয়াছে সে এখন আর পশ্চাদ্‌পদ হইবে কেন! প্রফুল্ল পালঙ্কে উঠিয়া বসিল, ধীরে ধীরে হস্ত প্রসারণ করিয়া শায়িতা মূর্ত্তির গাত্রে দিয়া ঢাকিল—বসন!

অমনি খিল্‌খিল্‌ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে হাস্যের ধ্বনি উঠিল। যে শয়ন করিয়াছিল সে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল "কেমন বোনাই! তোমায় ঠকিয়েছি?" প্রফুল্ল চাহিয়া দেখে এ যে সেই শ্যালক বাবু। তখন পালঙ্কের নিম্ন হইতে আরও দুই চারিজন গুপ্তচর বাহির হইয়া হাসিতে যোগ দিল। প্রফুল্ল ভারি অপ্রতিভ হইল।

তামাসা সমাপ্ত হইল। তখন অলঙ্কারপরিশোভিতা সুতরাং বিবিধ বাদ্যকারিণী বস্ত্রাবৃতা একটী বালিকাকে পাঁচ জনে সেই গৃহে প্রবেশ করাইয়া দিয়া বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

প্রফুল্ল পালঙ্কে বসিয়া। বসন্তকুমারী বস্ত্রাবৃতা হইয়া শয্যার অপর প্রান্তে শয়না। কোন বাক্যালাপের স্বর ত শ্রুত হইতেছে না? এত আগ্রহের এত উৎসাহের পর এমন নির্জ্জীবতা কেন ঘটে? প্রফুল্ল যে কেন কথা কহিতেছিল না তাহা বলিতে পারি। সে ভাবিতে ছিল আমি এতটা করিয়াছি, যে সামান্য টুকু বাকি আছে, তাহা কেন বসন্ত করিবে না। আমি এত লঞ্ছনা ভুগিয়া আসিয়াছি আমি কেন প্রথমে সম্ভাষণের আদর পাইব না? যে মিলনের জন্য জগদীশ্বরকে দায়ী করিতেছে সে কেন প্রথমে মিলন জাচিবে না? বিজ্ঞ পাঠক! তুমি ইহাকে 'ছেলেমানুষি' বলিয়া হাঁসিতে পার? কিন্তু প্রফুল্ল ত ছেলেমানুষই! আর সেই নবস্বামী-সমাগতা বালিকা যে কি ভাবিতে ছিল তাহা আমি বলিতে পারি না। ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে কত বড় ভাব থাকে তাহা আমি কখনই ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই।

তা যাইহাই হউক, ধৈর্য্যে রমণীকে কেহ কখন পরাজিত করিতে পারে নাই। বালিকা যেমন শয়ন করিয়াছিল তেমনই রহিল। এদিকে প্রফুল্লের

আবেগ পূর্ণ হৃদয়ে অশান্তি হইতে লাগিল। বালকের একবার বড়ই অভিমান হইল।—সে অভিমান কত ক্ষণের ? আর একবার ক্রোধ হইল—সে ক্রোধও কতক্ষণের। অভিমান গেল, ক্রোধ গেল ; এবার লজ্জা আসিল, কিন্তু তাহাও কি থাকে গা ?

তথন প্রফুল্ল বলিল—"ছি ! বসন্ত ! এত কষ্ট করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিলাম, তুমি একটী কথাও কহিলে না ?

বালিকা কোন উত্তরই করে না।

প্রফুল্ল আবার বলিল—"তুমিই ত আমাকে আসিতে লিখিয়াছিলে।"

এবারও কোন উত্তর আসিল না।

"তুমি যদি না কথা কও তবে আমি বাহিরে যাই ?" এই বলিয়া প্রফুল্ল উঠিল, পাদুকা পরিধান করিতে লাগিল। কিন্তু তথনও কেহ তাহাকে ত যাইতে বারণ করিল না ! এমন বিষম দায়ে পাঠক কথন পড়িয়াছেন কি ? কাজেই প্রফুল্ল পুনরায় বসিল। পত্নীর হস্ত ধরিয়া বলিল—"বসন কথাটী কবে না কি ? তোমার মুখের দুটী কথা শুনিবার জন্য এতদূর আসিয়াছি তাহা কি শুনাইবে না। আমার কি অপরাধ হইয়াছে বল ?"

কে উত্তর করিবে ! বালিকা হস্ত টানিয়া লইয়া বস্ত্র মধ্যে লুকাইত করিল। টানিবার সময় অলঙ্কারের ঘর্ষণে প্রফুল্লের হস্ত ক্ষত হইয়া গেল। স্বামীকে সোণার আচড় খাওয়াইতে বঙ্গ বামাদের এত অভিলাষ কেন তাহা বুঝিতে পারি না ! নতুবা সজারু সাজিয়া শয্যায় শয়নে কি প্রয়োজন ?

এবারও প্রফুল্ল নিষ্ফল মনোরথ হইল। তথন বালক প্রফুল্ল (বিজ্ঞও কি করিত না) আরএকটী উপায় অবলম্বন করিল। প্রফুল্ল পত্নীর নবপ্রেম-বিকাশিকা পত্রিকাগুলি সঙ্গে আনিয়াছিল। এক এক থানি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

প্রথম থানি—স্বামীমুখ দর্শনে বালিকা যে কতদূর উৎসুক ইহাতে কেবল সেই সকল প্রণয় কথা।

দ্বিতীয় থানি—শীর্ষে এই দুই ছত্র কবিতা—

শিশিরে কি ফুটে ফুল বিনা বরিষণে।
চিঠিতে কি ভুলে মন বিনা দরশনে ॥

প্রফুল্ল পত্র পড়িতে লাগিল।" বালিকা বস্ত্র আরও টানিয়া গাত্র আবরিত করিল। ইহাতে বেচারি স্বামীর একটু আশা বাড়িল।

তৃতীয় খানি—ইহার শেষে একটী গান, তাহার প্রথম দুই ছত্র এই—

ভালবাসার কথা প্রভু আর মুখে তুলনা
তোমার প্রেমের দৌড় সবই গেছে জানা।

প্রফুল্ল যেমন ঐ দুই ছত্র পাঠ করিয়াছে, অমনি বালিকা তীব্রবেগে প্রফুল্লের হস্ত হইতে পত্রখানি ছিনাইয়া লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া পালঙ্কের নিম্নে নিক্ষেপ করিল।

প্রফুল্ল বুঝিল বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। বলিল—"আমার চিঠি কেন ছিড়িলে ?"

কোন উত্তরই নাই।

"তবে আমি ফের চিঠি পড়ি" এই বলিয়া প্রফুল্ল আর এক খানি পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিল—"জগদীশ্বরই জানেন আমাদের কবে মিলন হইবে।"

প্রফুল্ল সাবধানে এই পত্র খানি পড়িতেছিল, সুতরাং বসন্তকুমারী যখন সহসা পত্রখানি ছিনাইয়া লইতে উঠিল তখন প্রফুল্ল পত্রখানি সরাইয়া ফেলিল। বালিকা পরাজিত হইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—ও সব বুঝি আমি লিখেছি ?

বাঁধ ত ভাঙ্গিয়াছিল এবার জল ঝাপাইয়া পড়িল, প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল—"তুমি নও ত কে লিখিয়াছে ?"

বালিকা (সেইরূপ স্বরে)—"আমার গরজ পড়ে গেছে ? ও বাড়ীর বউ লিখেচে ?"

প্রফুল্ল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—একি তোমার হাতের লেখা নয় ?

বালিকা (সেই স্বরে)—"ঐ সব বউয়ের লেখা। আমি লিখতে জানি না কি।"

হরি! হরি! স্বর্গের মাঝে প্রফুল্লের যে রম্য কল্পনাকুঠির নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা ঝুপ্‌ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল! যে প্রেমপত্রিকাগুলিন লইয়া বালক তাহার আশার কুঞ্জ তৈয়ার করিতেছিল তাহা জাল হইয়া গেল ? প্রফুল্ল কি কাঁদিবে গা ?

তার পর প্রফুল্ল দুই চারিটী কথা কহিল বসন্ত কোনটায় উত্তর দিল না, কোনটায় একটী ক্ষুদ্র হুঁ করিয়া সারিয়া দিতে লাগিল।

তাহাতেও বালকের কিছু সুখ ছিল। সেই সুখের মাঝে কিন্তু তাহার হৃদয় একতন্ত্রছিন্ন বীণার স্বরের ন্যায় যে সর্ব্বদাই খ্যাৎ খ্যাৎ করিতেছিল তাহা আর কেহ কি বুঝিলেন ? শ্রীদঃ

সাধন।

সারা দিন থাকি দূরে　　　দেখা হলে তার পরে
কথাটী কহিতে যদি আগে হয় ভুল।
সহসা নয়ন কোলে　　　মুক্তাফল আসি ঝোলে
মুখানি শুখায় যেন নিদাঘের ফুল॥
মেঘ ঢাকা চাঁদ প্রায়　　　হাসিটী লুকায় তায়
অভিমান বিষভরে হয় সে আকুল।
উপাদানে মুখ রাখি　　　করে চাপে ছুটী আঁখি—
নীরব নয়ন ধারা করে গো ব্যাকুল॥
মরম ভেদিয়ে ব্যথা　　　সে বুঝি পেয়েছে তথা
অনাদর ছল বুঝি মানিনীরে দহে।
তাই সে করেছে মান　　　রমার অমোঘ বান
দারুণ প্রহার তার হৃদে নাহি সহে॥
সযতনে অতি ধীরে　　　ভুজপাশে বাঁধি তারে
মুখানি তুলিয়া লই মুখানি উপর।
আদর মাখান স্বরে　　　সাধি তারে মিষ্ট করে
হাসি হাসি চুমি চুমি (ও) প্রেমের আকর॥
আদরে চুমিতে উঠে　　　প্রেমভরা হাসি ফুটে
হাসিতে হাসিতে মিলে অপূর্ব্ব মিলন।
রবির কিরণ মাখি　　　উজলিছে যেন শাখী
ধৌত করে যায় যবে বরিষা বর্ষণ॥
ভাঙ্গিলে প্রণয় মান　　　পুলকে পুরিত প্রাণ
দৃঢ়তর হয়ে যায় প্রেমের বাঁধন।
কবি কহে　রসজ্ঞ যে জন হবে　　　কুসুমে পীযুষ পাবে
জীবনের করে ব্রত রমণী সাধন॥

শ্রীহেম

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। শ্রীশ্রী চৈতন্য দেব ও প্রেমধর্ম্ম। শ্রীযুক্ত চন্দ্রবিনোদ পাল চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। এই পুস্তক খানি পড়িয়া আমরা যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইলাম। গ্রন্থকারের রচনাশক্তি প্রশংসিত। তিনি ভক্তির উচ্ছ্বাসে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উপাদেয় হইয়াছে।

২। সত্য সঙ্গীত। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত ব্রহ্মদাস কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। ধর্ম্ম সঙ্গীত দেশে যতই সমাদৃত হয় ততই দেশের মঙ্গল। আমরা পুস্তক খানি পড়িয়া সুখী হইয়াছি।

৩। পুরোহিত। মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত। এই মাসিক পত্র খানি অতি উপযুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। আমরা যে কয়েক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা পড়িয়া সুখী হইয়াছি। পুরোহিত যেরূপ দক্ষতার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে সমাদর করা সকলের কর্ত্তব্য।

৪। জ্যোতিঃ। মাসিক পত্র ও সমালোচন। সম্পাদকের নাম নাই, তবে বিখ্যাত লেখকগণের প্রবন্ধ ইহাতে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। জ্যোতির প্রথম বিকাশ দেখিয়া আমাদের আশা হইতেছে যে ইহা স্থায়ী হইলে বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

৫। সৎসঙ্গ। মাসিক পত্র ও সমালোচন। এই মাসিক পত্র খানি বহরমপুর, গোরাবাজার হইতে শ্রীযুক্ত সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। সাতকড়ি বাবুর এই উদ্যম অতীব প্রশংসনীয়। স্থানীয় লোকের বিশেষ কর্ত্তব্য, যাহাতে এই মাসিক পত্র খানি স্থায়ী হইয়া বহরমপুরের গৌরব বৃদ্ধি হয়। যেরূপ ভাবে সৎসঙ্গ পরিচালিত হইতেছে তাহাতে ইহা স্থায়ী হইলে আমরা সুখী হইব।

৬। ইন্দুমতী। সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত যশোদালাল তালুকদার প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা। ইন্দুমতী সম্বন্ধে বঙ্গের খ্যাত নামা লেখক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলিয়াছেন "যশোদার প্রতি আমার

বেশ একটু স্নেহ আছে। স্নেহের চক্ষে সকলই ভাল—সুতরাং ইন্দুমতীও ভাল লাগিয়াছে। আর ইন্দুমতীকে ভালবাসি তাহার কবিত্বময়ী বেশ ভূষা ও লালিত্যময়ী ভক্তির জন্য। তবে যশোদার বয়োবৃদ্ধির সহিত জ্ঞান ও গু গুণপনার বৃদ্ধি হইলে, যে তাহার উপন্যাস আরও ভাল হইবে তাহা অবশ্য না বলিলেও চলে। কালে যে সেইরূপই হইবে এমন আশাও করি ও আশীর্ব্বাদ করি।" পুস্তক খানি কিরূপ হইয়াছে, উপরোক্ত কথার দ্বারা পাঠক তাহার অনেকটা আভাস পাইবেন। আমরা অধিক কিছু বলিতে চাহি না। দুই এক স্থলে যে ভ্রান্তি রহিয়াছে তাহা দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধিত হইবে এরূপ আশা করি।

৭। ঠগী-কাহিনী প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য দুই খণ্ড একত্র ১৷৷০ টাকা। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত। প্রিয়নাথ বসু দারোগার দপ্তর লিখিয়া প্রবিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার ঠগী-কাহিনী অতীব মধুর হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে বড়ই আনন্দ হয়। বঙ্গীয় পাঠক সমাজে এই পুস্তক যে আদৃত হইবে তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

পূর্ণিমার মূল্য প্রাপ্তি।

সন ১৩০০ সাল।

ম্যাকলক সাহেব, ধর্ম্মপুর। | রাজা সুরেন্দ্রদেব রায়, বাঁশবেড়িয়া।

ক্রমশঃ।

সন ১৩০১ সাল।

বাবু মোহিনীমোহন দত্ত, পিরোজপুর।
,, অশ্বিনীকুমার গুহ, দিনাজপুর।
,, প্রমোদাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদ।
,, বৈকণ্ঠনাথ রায়, নড়াল।
,, শ্রীকান্ত সিংহ, জামালপুর।
,, পুলিনচন্দ্র রায়, কলিকাতা।
,, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া।
,, করুণানিধান সিংহ, বর্দ্ধমান।
,, জানকীনাথ মজুমদার, নদিয়া।
,, জিতেন্দ্রনাথ কর, মহানাদ।
,, অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য আরা।
,, রাজেন্দ্রলাল ঘোষ, ত্রিপুরা।
,, নগেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, মান্দাড়া।
,, শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া।
,, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবুগঞ্জ।
,, ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, বেনারস।
,, নাগেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা।
,, অক্ষয়কৃষ্ণ ঘোষ, হাজারিবাগ।
,, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বেনারস সিটি।
,, ঘনশ্যাম বিশ্বাস, লক্ষ্ণৌ।

বাবু শ্রীশচন্দ্র মল্লিক, বাঁকুড়া।
,, যুগলকিশোর মিশ্র, কলিকাতা।
,, গিরিশচন্দ্র দত্ত, চন্দননগর।
,, প্রসন্নকুমার মিত্র, সিমলা।
,, শরৎচন্দ্র দত্ত, বাগনান।
,, গোপালচন্দ্র গোস্বামী, বেনারস সিটি।
,, প্রসন্নকুমার দাস, মহিষাদল।
,, রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, খুলনা।
,, সারদাচরণ গণ, খুলনা।
,, আশুতোষ ঘোষ, যশোহর।
,, গিরীশচন্দ্র মিত্র, মেদিনীপুর।
,, শশিভূষণ বসু, মজিলপুর।
,, চন্দ্রকুমার বসু, নওয়াখালি।
,, এন, কে, বসু, নওয়াখালি।
,, যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক, মথুরা সিটি।
,, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেওঘর।
,, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হুগলী।
রাজা সুরেন্দ্রদেব রায়, বাঁশবেড়িয়া।
বাবু শশিভূষণ দাস, মহিষাদল।
,, শরৎচন্দ্র ঘোষ, ভবানীপুর।
,, নাগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মগরা।
মহারাজা অফ দিনাজপুর, দিনাজপুর।

ক্রমশঃ।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় ভাগ। } মাঘ, সন ১৩০১ সাল। { ১০ম সংখ্যা।

মধুময়ী গীতা।

তৃতীয় অধ্যায়—কর্ম্মযোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অর্জ্জুন কহিলেনঃ—

হে কেশব, বুঝিলাম তব অভিপ্রায় ;-
কর্ম্ম হ'তে বুদ্ধি যোগ শ্রেষ্ঠ যদি হয়,
কেন তবে মোরে কৃষ্ণ ছাড়ি বুদ্ধিযোগ,
হিংসাত্মক যুদ্ধ-কর্ম্মে করিছ নিয়োগ ? ১
কভু কর্ম্ম, কভু জ্ঞান প্রশংসা তোমার,
বিবিধ বচনে বুদ্ধি মোহিত আমার ;
সব(ই) জান তুমি, মোর কি শ্রেয় এখন,—
সংক্ষেপে একটি কথা কহ জনার্দ্দন। ২

শ্রীভগবান কহিলেনঃ—

অনঘ, দ্বিবিধ নিষ্ঠা ইহলোকে হয়,
ইতিপূর্ব্বে যাহা আমি কহিনু তোমায়।—
জ্ঞানযোগে লভে মোক্ষ যত সাংখ্যগণ,
কর্ম্মযোগে যোগিগণ মোক্ষপরায়ণ। ৩
কর্ম্মে হয় চিত্ত শুদ্ধি, তাহে জ্ঞানোদয় ;
কেবল সন্ন্যাসে সিদ্ধি কভু নাহি হয়। ৪

কর্ম্ম ছাড়ি ক্ষণকাল থাকা নাহি যায়,
স্বাভাবিক গুণে কর্ম্ম আপনি করায়। ৫
ইন্দ্রিয় চাপিয়া রাখি, বিষয় স্মরণ
যেই করে, বিমূঢ়াত্মা কপটী সেজন। ৬
মনের শাসন করি কামশূন্য যিনি,
কিন্তু কর্ম্মে রত সদা, প্রশংসিত তিনি। ৭

অবশ্য কর্ত্তব্য যাহা করিয়া তা চল,
কর্ম্ম ত্যাগ হ'তে পার্থ কর্ম্ম করা ভাল।
সর্ব্ব কর্ম্ম শূন্য হ'লে ক্রমে দিন দিন,
জীবিকা নির্ব্বাহ হ'য়া হইবে কঠিন। ৮

কর্ম্ম কি? তা শুন, মাত্র ঈশ প্রীতিতরে
কর যাহা, তাই কর্ম্ম। হায় এ সংসারে
অন্য যাহা কর তাহা কেবল বন্ধন!
কৌন্তেয়, নিষ্কাম কর্ম্ম কর অনুক্ষণ। ৯

যজ্ঞ সহ প্রজাসৃষ্টি করি প্রজাপতি,
কহিলেন—যজ্ঞে প্রজা বৃদ্ধি হবে অতি;
ঈশপ্রীতি লাগি যজ্ঞ হইবে মহীতে,
প্রজার অভিষ্টলাভ হইবে তাহাতে। ১০

কহিলেন প্রজাপতি,—যজ্ঞে প্রজাগণ
দেব সংবর্দ্ধন কর, আর দেবগণ—
করুন প্রজার হিত দিয়া বৃষ্টিজল,
পরস্পর বৃদ্ধি হবে পরম মঙ্গল। ১১

দেবদত্ত যাহা তাহা দেবগণে দান
না করিলে হয় সে ত তস্কর সমান। ১২
যজ্ঞ শেষ-ভোজী সাধু পাপমুক্ত হন;
নিজার্থে পাক ভোজন করে পাপিগণ। ১৩
অন্নহ'তে সমুৎপন্ন ভূত সমুদয়;
অন্ন জন্মে বৃষ্টি হ'তে; যজ্ঞে বৃষ্টি হয়; ১৪

কর্ম্মে যজ্ঞ ; বেদে কর্ম্ম ; বেদ ব্রহ্ম হ'তে ;—
সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম তাই আছেন যজ্ঞেতে। ১৫
এই চক্রে আবর্ত্তন না করে যে জন,
স্বেচ্ছাচারী পাপময় বৃথা সে জীবন !
আত্মানন্দে প্রীত যেবা, পরিতৃপ্ত হয়,
তাহার কর্ত্তব্য কিছু নাই সুনিশ্চয় ; ১৭
ইহলোকে নাই তার পাপ পুণ্য-ভার ;
মোক্ষার্থে আশ্রয়নীয় কেহ নাই তার। ১৮
নিষ্কাম অন্তরে কর কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
ফলাসক্তিশূন্য যাঁ'রা তাঁ'রা মোক্ষ পান। ১৯
জনকাদি ঋষি যত কর্ম্মযোগ করি,
করিলেন জ্ঞান লাভ। লোকধর্ম্ম'পরি ২০
দৃষ্টি রাখি কর্ম্ম করা উচিত তোমার,
শ্রেষ্ঠানুকরণে দেখ চলিছে সংসার। ২১
কি অভাব আছে মোর ? কর্ত্তব্যও নাই ;
কিন্তু দেখ রত আমি কর্ম্মেতে সদাই। ২২
আমি যদি না দেখাই কর্ম্মশীলতার
পরিচয়, কর্ম্মহীন হইবে সংসার। ২৩
কর্ম্মলোপে ধর্ম্মলোপ, লোক নষ্ট হবে ;
বর্ণসঙ্করেতে ম্লান হ'বে প্রজা সবে। ২৪
অজ্ঞানীর কর্ম্ম যথা অনাসক্ত জন
স্বধর্ম্মে রাখিতে লোকে করেন তেমন। ২৫
"কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানীর কর্ম্ম যে নিষ্ফল,"—
হেন বলি উচ্ছৃঙ্খল মানব মণ্ডল,
করিবে না কভু পার্থ। জ্ঞানিগণ ভবে
আপনি করিয়া কর্ম্ম শিক্ষা দেন সবে। ২৬
প্রকৃতির গুণ যত—ইন্দ্রিয় সকল
সর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদন করিছে কেবল ;

অহঙ্কারে বিমূঢ়াত্মা মায়ামুগ্ধ নর
"আমি কর্ত্তা" বলি যুদ্ধ করে নিরন্তর ! ২৭
গুণ হ'তে কর্ম্ম হ'তে আত্মার বিভাগ –
তত্ত্ব জানি মহাবাহো, যত মহাভাগ
"ইন্দ্রিয় বিষয়ে রত, আমি কিছু নই"
ধ্রুব জানি হয়েছেন অহঙ্কার জয়ী। ২৮
ইন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত মুগ্ধমতি যার,
বিচলিত চিত্ত কভু করিবে না তার। ২৯
সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পিয়া আমার উপর,
নিষ্কাম অন্তরে যুদ্ধ কর ধনুর্দ্ধর। ৩০
মম বাক্যে শ্রদ্ধাবান দোষ দৃষ্টিহীন
যেই জন অনুষ্ঠান করে চিরদিন
এই মত, মুক্ত হন কর্ম্মবন্ধ হ'তে ; ৩১
যে না করে সে বিমূঢ় নষ্ট হয় তা'তে। ৩২
প্রকৃতির অনুগত প্রাণী জ্ঞানিগণ, –
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা অসাধ্য সাধন ! ৩৩
প্রতি ইন্দ্রিয়ের পার্থ স্বভাব বিশেষ –
"অনুকূলে অনুরাগ প্রতিকূলে দ্বেষ" ;
তা'তে কভু বশীভূত হ'বেনা নিশ্চয়,
মুমুক্ষুর প্রতিপক্ষ সে অবস্থা দ্বয়। ৩৪
দেখ পার্থ, সুসম্পন্ন পরধর্ম্ম হ'তে
অঙ্গহীন স্বীয় ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এ জগতে।
কহি পুনঃ ধনঞ্জয়, জানিবে নিশ্চয়
স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মে ভয়। ৩৫ *

অর্জ্জুন কহিলেনঃ –

অনিচ্ছায় কহ কৃষ্ণ কেবা পুরুষেরে
বলে ধরি পাপ-পথে নিয়োজিত করে ? ৩৬

*স্বধর্ম্ম = আত্মার ধর্ম্ম, প্রাণায়ামাদি।
পরধর্ম্ম = আত্মা ভিন্ন অপরের, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য।

শ্রীভগবান কহিলেনঃ—

সেই ত দুষ্পূরণীয় রজোজাত কাম
আর ক্রোধ, পথে বৈরী যেতে মোক্ষধাম। ৩৭
জরায়ুতে গর্ভাবৃত, বহ্নি যথা ধূমে,
ধূলিতে দর্পণ,—তথা জ্ঞানাচ্ছন্ন কামে। ৩৮
কৌন্তেয়, অপূরণীয় কামাগ্নি অন্তরে—
জ্ঞানীদের চিরশত্রু—জ্ঞানাচ্ছন্ন করে। ৩৯
মনো বুদ্ধি ইন্দ্রিয়েতে কাম অধিষ্ঠান,
মানবে মোহিত করে আবরিয়া জ্ঞান। ৪০
প্রথমে ভরতর্ষভ, ইন্দ্রিয় সকল
সংযত করিয়া, পরে এই মহাবল
আত্মজ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান, সর্ব্বনাশকারী,
বধকর মহাপাপ কাম চির অরি। ৪১
দেহ হ'তে শ্রেষ্ঠ পার্থ ইন্দ্রিয় সকল;
ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ মন; বুদ্ধিই কেবল
মনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু বুদ্ধি হ'তে
শ্রেষ্ঠ যিনি আত্মা তিনি, জান ভাল মতে। ৪২
হেনরূপে মহাবাহো আত্মাকে জানিয়া,
এক বুদ্ধি দ্বারা মন নিশ্চয় করিয়া,
কামরূপ মহাশত্রু কর পরাজয়!—
কর্ম্মযোগ গূঢ়তত্ত্ব কহিনু তোমায়। ৪৩

ইতি তৃতীয় অধ্যায়—কর্ম্মযোগ।

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।

জৈনদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

জৈনদিগের উৎপত্তি যে কোন সময় হইতে আরম্ভ হয় ভারত ইতিহাসে সে বিষয়ে কিছু স্থির মীমাংসা নাই। বিখ্যাত লেখকগণ যাহা অনুমান করিয়া গিয়াছেন তাহাতে এই মাত্র জানা যায় যে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ কিম্বা ৭ম শতাব্দী হইতে ১০ম শতাব্দীর মধ্যে ইহাদিগের অভ্যুত্থান হয়। কেহ কেহ বলেন জৈন তীর্থাঙ্কুর ধার্ম্মিকপ্রবর মহাবীর বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আদি শিক্ষক ছিলেন। বহু তর্ক বিতর্কের পর কেহ কেহ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, যে বৌদ্ধেরা বলে "মহামুনি গৌতমের পূর্ব্বে ২৪ জন বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন এবং তৎকালীন ২৪ জন জৈন তীর্থাঙ্কুরও থাকেন।" এই সকল মীমাংসা করিয়াও কিন্তু কিছুই বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয় নাই, কারণ জৈন ধর্ম্মের ইতিবেত্তাদিগের বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য নহে, যেহেতু তাহাদিগের স্বভাব বশতঃ তাহার স্বধর্ম্মের বৃত্তান্ত বহুলরূপে ব্যাখা করিয়া গিয়াছে; ফলতঃ তাহাদিগের উপর নির্ভর করিয়া কিছু স্থির মীমাংসা হইতে পারে না। তবে কল্যানী বংশোদ্ভূত চালুক্যের লিপি দৃষ্টান্তে যাহা পাওয়া যায় এবং যাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে খৃঃ ৪৮৫ হইতে ৫৯০ শতাব্দীর মধ্যে যখন পলকেশী নামক রাজা রাজত্ব করেন সেই সময় হইতে জৈনেরা প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকে। কিন্তু ইহাদিগের উৎপত্তি যে কোন সময় হইতে হয় তাহা একাল পর্য্যন্ত কিছুই স্থির হয় নাই, কিন্তু গভীর গবেষণা দ্বারা এই মাত্র বুঝা যায় যে ইহারা বৌদ্ধদিগের সমসাময়িক এবং বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এবং বৌদ্ধদিগের সহিত যে ইহাদিগের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ১ম বুদ্ধ ও মহাবীর উভয়েই ইক্ষাকু বংশোদ্ভূত, উভয়েরই এক জনক, বুদ্ধের যশোধারা নাম্নী পত্নী ছিল মহাবীরেরও পত্নীর নাম যশোদা ছিল। বিহারের অন্তর্গত পাউয়া গ্রামে ৫২৭ খৃঃ মহাবীরের মৃত্যু হয় এবং ইহার অত্যল্প দিবস পরে ৫৪৩ খৃঃ উক্ত গ্রামের সন্নিকটে বুদ্ধেরও মৃত্যু হয়। অতএব ইহাদিগের সম্পর্ক সর্ব্ব বিষয়ে যে এত নৈকট্য তাহাতে ইহারা

যে এক ধর্ম্ম হইতে দুইটি সম্প্রদায় হইয়াছে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অদ্যকার এই প্রবন্ধে তাহা যথাসাধ্য দেখাইতে ক্রটী করিব না।

জৈনদিগের সাধারণ নাম শ্রাবক। জৈন ও বোদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদিগের শিক্ষককে ঈশ্বরের ন্যায় পূজা ও মান্য করিয়া থাকে, এবং তাহার কল্পিত প্রতিমূর্ত্তি মন্দিরে স্থাপনা করিয়া রাখে। "অহিংসা পরমঃ ধর্ম্ম" দুই সম্প্রদায়েই প্রচলিত এবং তাহা বিশেষরূপে পালন করিয়া থাকে। কোন বিষয় বিশেষরূপে অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ করিতে উভয় দলই অত্যন্ত নিপুণ, ইহাদিগের বিষয় এইরূপ দেখা যায় যে, যে সকল শিক্ষক বা সাধু ব্যক্তি অল্পায়ু কিম্বা গঠন প্রণালী খর্ব্ব তাহাদিগকে অত্যন্ত মান্য করিত। এক্ষণে জৈন ও বৌদ্ধদিগকে তুল্য করিয়া এই বুঝা যায় যে জৈনেরা কেবল বৌদ্ধদিগের নিয়ম প্রণালী ও সংস্কার সকল বহুলরূপে অলঙ্কৃত করিয়াছে মাত্র।

দুইটি অবস্থার স্থায়িত্ব লইয়া জৈন দর্শন শাস্ত্র আরম্ভ হয় তাহাদের একটি এই যে সমস্ত পদার্থ বা মনুষ্যকে তাহারা জীব ও অন্যান্য বিষয়কে অজীব বা জড় বলিয়া আখ্যায়িত করে, অর্থাৎ যে সমস্ত জ্ঞান রহিত, জীবাংশের প্রতিকূল এবং অন্য সমস্ত বিষয়ের দ্বারা সংযুক্ত হয় তাহাই অজীব; অতএব এই সকল পদার্থ এক একটি সমষ্টিগত সূক্ষ্ম পরমাণু মাত্র; এতদুভয়ই অসৃজিত ও অমর, যদিও তাহারা ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন প্রকার মানবের অবস্থায় উপগত হইয়া থাকে। এইরূপে এই বুঝা যায় যে জীবন অপরিবর্ত্তনশীল নিশ্চিত পদার্থ এবং প্রারব্ধ বশতঃ ক্রমান্বয়ে নিম্নতম সোপান হইতে অতি উচ্চতম সোপান পর্য্যন্ত—যাবৎ না মোক্ষে অর্থাৎ শেষ নির্ব্বাণে উপগত হয়, তাবৎ এক হইতে অপর অপর হইতে অন্যপর এইরূপে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। ইহাদিগের মোক্ষ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা বড় সুন্দররূপে প্রকাশিত যথাঃ- একটী পক্ষীকে পিঞ্জর হইতে ছাড়িয়া দিলে পক্ষীটী যেমন জলে নিমজ্জিত হইয়া বহু দিনার্জ্জিত ক্লেদ সকল বিধৌত করিয়া ফেলে এবং উঠিয়া আতপ তাপে তাহার পক্ষ সকল শুষ্ক করিয়া শূন্যে উড়িয়া যায় আর কখন সেখানে প্রত্যাগমন করে না, সেইরূপ এই অন্তরস্থিত আত্মা বহুকালাবদ্ধ হইয়া যখন সুকৃতি ফলে হৃদপিঞ্জর হইতে মুক্ত হয় তখন ঐরূপে মূল পদার্থে গিয়া মিশিয়া যায় আর তথায় প্রত্যাগমন করে না।

"জৈনদিগের কর্ম্ম দ্বিপ্রকার, যথা ঘাতি ও অঘাতি কর্ম্ম; যে কর্ম্ম মুক্তির বিঘ্নকর তাহাই ঘাতি কর্ম্ম। এই ঘাতি কর্ম্ম আবার চারি প্রকারে বিভক্ত যথা জ্ঞানাবরণীয় দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় ও আন্তর্য্য। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যাহার মুক্তি হয় না তাহাই জ্ঞানাবরনীয়, আর্হত দর্শন অধ্যয়নাদি দ্বারা যাহার মুক্তি হয় না তাহাই দর্শনাবরণীয়, কোনটী মুক্তির প্রকৃত কারণ এই বিষয়ের অনবধারণকে মোহনীয় ও মোক্ষ পথের প্রবৃত্তির বিঘ্ন করাকে আন্তর্য্য কর্ম্ম বলে। অঘাতি কর্ম্মও চারি প্রকার যথা বেদনীয়, নামিক, গোত্রিক ও আয়ুষ্ক। ঈশ্বরতত্ত্ব আমার জ্ঞাতব্য এই অভিমানকে বেদনীয়, আমি অমুক নাম বিশিষ্ট রূপ অভিমানকে নামিক, অমুক বংশে আমার জন্ম, এই অভিমানকে গোত্রীয় ও শরীর রক্ষার জন্য যে কর্ম্ম করা যায় তাহাকে আয়ুষ্ক কর্ম্ম বলে। উক্ত কয়েক প্রকার কর্ম্ম মুক্তির কোনরূপে বিঘ্নকারী হয় না বলিয়া ইহাকে অঘাতি কর্ম্ম বলে।"

জ্ঞান দ্বারা কোন বস্তুকে বিশেষরূপে জানা কিম্বা গভীর গবেষণা দ্বারা, দার্শনিক ও শাস্ত্রবিৎদিগের শিক্ষা প্রণালী আলোচনা দ্বারা ও তৎক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা বন্ধন হইতে আত্মার মুক্তিলাভ করা যায়, ইহা বৌদ্ধদিগের এমন কি সমস্ত ভারতবাসীদিগের ধর্ম্ম ও শিক্ষা প্রণালী। বৈষশিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা যে, পদার্থ সকল সূক্ষ্ম পরমাণুর সমষ্টিতে গঠিত। এই শিক্ষা ও জ্ঞান বহু পূর্ব্বে জৈনদিগের সাধু কণদ কর্ত্তৃক বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনেরা প্রাণীবধে অপক্ষপাতী, ইহারা এমন কি বৃষ্টির সময়, অন্ধকারে বা অনাবৃত স্থানে পান ভোজন করে না; পাছে কোন কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করিয়া ফেলে। পানীয় জল তিনবার বস্ত্রপূত করিয়া লয়। প্রতিকূল বাতাসে ইহারা ভ্রমণ করে না পাছে কোন কীট তাহাদের বক্ষঃস্থলে পড়িয়া আঘাত প্রাপ্ত হয়। প্রার্থনার সময় ইহাদের মুখে একখানি করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র আবরণ স্বরূপ থাকে।

জৈনেরা সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। ১ম দিগম্বর, ২য় শ্বেতাম্বর। দিগম্বর বা নির্গ্রন্থি যাহারা সংসারের সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত। শ্বেতাম্বর ইহারা শ্বেত বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া থাকে। এই সকল তারতম্য কেবল মাত্র যতিদিগের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়, সাধারণের নিষিদ্ধ।

এক্ষণে হিন্দুদিগের সহিত ইহাদিগের কতদূর সৌসাদৃশ্য তাহা দেখা যাউক! প্রথমতঃ ইহারা ব্রাহ্মণের চতুর্ব্বিধ বর্ণ সম্বন্ধে এবং ব্রাহ্মণেরা যেরূপ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইত্যাদিকে আপনাদিগের সেবার্থে গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা তাহারা স্বীকার করে এবং তদ্রূপ করিয়া থাকে; কেবল মাত্র ইহাদের ধর্ম্মে জাতিভেদ প্রথা নাই। জৈনদিগের মন্দিরে দেবতা সকলের পূজা ও ক্রিয়া কলাপ হিন্দু ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা হইয়া থাকে, ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ কেবল যতিদিগের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাহাদের আপনার কোন পুরোহিত নাই। জৈনেরা শঙ্করের ১০টি প্রধান ক্রিয়া কয়টি বিশেষরূপে লক্ষ করে এবং কতকগুলি, হিন্দু ব্রাহ্মণদিগের, গার্হস্থ্য দেব দেবীকে পূজা করে।*

জৈনদিগের পর্ব্ব সকলের মধ্যে পর্য্যুসন পর্ব্বই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এই সময়ে তাহারা তাহাদের গুরুর নিকট জ্ঞান ও অজ্ঞান জনিত দোষ সকল স্বীকার করে এবং পর্ব্বারম্ভের পূর্ব্বে একবার করিয়া বৎসরের এই সকল দোষ স্বীকার করিয়া পূর্ব্বকৃত দোষ হইতে মুক্ত হয় এবং উক্ত কারণে নানা প্রকার দ্রব্য আহরণ ও তদ্দারা সকলকে পরিতৃপ্তরূপে ভোজনাদি করাইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।

উক্ত পর্ব্ব ব্যতীত ইহারা কয়েকটি হিন্দু পর্ব্বও লক্ষ করিয়া থাকে যথা—বসন্তপঞ্চমী, অক্ষয় তৃতীয়া, ঘটস্থাপনা ইত্যাদি। ইহারা হিন্দুদের দেবীর স্থায়িত্ব স্বীকার করে এবং আপন ধর্ম্মের মত হিন্দু-পূজা-পদ্ধতির মান্য করিয়া থাকে। ইহাদের মন্দিরাভ্যন্তরে, শক্র, সরস্বতী দেবী ভবানী, হনুমান, ভৈরব ও গণেশ এই সকলের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়। অতএব পর্য্যালোচনা করিয়া এই দেখা যায় যে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ও উভয়ের আচার ব্যবহারের সহিত ইহাদের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে এবং অনেক স্থলে যে উভয় ধর্ম্মের মতাবলম্বী হইয়া কর্ম্ম করে তদ্বিষয় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

---

*Statistical Account (W. W. Hunter.)

রাজগির বা রাজগৃহ।

ভারতবর্ষের অনেক স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। চট্টগ্রাম জেলায়, বীরভূম জেলায় ও পাটনা জেলায় কতকগু'ল উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। আমরা পাটনা জেলার উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিতে গিয়াছিলাম তাহা আজ বর্ণনা করিব। ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের উষ্ণ প্রস্রবণ নামক প্রবন্ধে পাটনা জেলার অন্তর্গত রাজগিব বা রাজগৃহের উষ্ণ প্রস্রবণের কথা উল্লেখ আছে মাত্র, তথাকার উষ্ণ প্রস্রবণের বিশেষ বিবরণ বা তথায় যাইবার পথের বিষয় কিছুই উল্লেখ নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ষ্টেসন বর্কতিয়ারপুর হইতেই রাজগৃহ যাইবার সুবিধা। উক্ত ষ্টেসন হইতে রাজগৃহ ৩২ মাইল পথ, তন্মধ্যে প্রথম ১৮ মাইল বেশ পাকা রাস্তা আছে ও ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যায় শেষ ১৪ মাইল পথ কাঁচা রাস্তা ও ঘোড়ার গাড়ি চলে না, গো-যান বা পাল্কী অথবা ডুলির দ্বারা যাইতে হয়।

বর্কতিযারপুর হইতে রাজগৃহ যাইতে হইলে বেহারের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। বেহার একটি সবডিভিসান। এখানে অনেক লোকের বাস আছে ও ইহা পঞ্চানন নামক একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত।

বর্কতিযারপুর ষ্টেসন হইতে পশ্চিম মুখে ক্রোশ খানেক যাইলে কাল মেঘের মত রাজগৃহের পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। বেহারেও একটী পাহাড় আছে, তাহাতে গাছ পালা কিছুই নাই ; কেবল প্রস্তরময়।

বেহার হইতে রাজগৃহ ৭ ক্রোশ দূর। পথে দুইটি মাত্র বড় গ্রাম দেখিলাম একটী ১ ক্রোশ ও অপরটী ৫ ক্রোশ দূরে। ইহা ছাড়া কেবল মাঠ ধূ ধূ করিতেছে একটিও পর্ণকুটীর দেখিতে পাইলাম না। পথে চোর ডাকাতের ভয়ও আছে শুনিলাম। আমাদের বেহারারা রাত্রিতে আমাদিগকে লইয়া যাইতে সাহস করিল না। যে গ্রাম দুইটীর কথা বলিয়াছি তাহার প্রথমটীর নাম দ্বীপনগর ও দ্বিতীয়টীর নাম সীলাও। গ্রাম দুইটী বেশ বড় অনেক লোক জনের বাস আছে। সীলাও হইতে রাজগৃহ দুই ক্রোশ পথ ; এখানে ডাকঘর ও থানা আছে। আমাদের পত্রাদি সীলাও

হইতেই বিলি হইত। সীলাওয়ে অনেকে স্ত্রীলোকদিগের চুড়ি তৈয়ার করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এখানকার খাজা (মিষ্টান্ন) অতিশয় সুখাদ্য ও সীলাও এই নিমিত্ত বেহার অঞ্চলে বিখ্যাত।

রাজগৃহে ১৫০ ঘর পাণ্ডার বাস আছে। পাণ্ডারা উপাধ্যায়, কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ এ ছাড়া গোয়ালারই বাস অধিক। রাজগৃহ মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত হাউসেনাবাদ গ্রামের নবাবের জমিদারী। নবাব সাহেব প্রজাদের নিকট বাসগৃহের তলস্থ জমির কোন কর লয়েন না তবে তাঁহার আবশ্যক হইলে বিনা বেতনে কার্য্য করিতে হয়। আমরা যেদিন ফিরিয়া আসিব তাহার পূর্ব্ব দিন পাল্কির বেহারাদের অগ্রিম কিছু মূল্য দিয়া আমাদিগকে বেহার লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম ও কহিয়া দিলাম যে কল্য প্রত্যূষে তোমরা যান লইয়া আসিও। পর দিবস বেলা ৭টা বাজিল কিন্তু বেহারারা আসিল না দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম ও অনুসন্ধানে জানিলাম যে নবাব সাহেবের পুত্রের বিবাহোপলক্ষে বেহারার আবশ্যক ও রাজগির গ্রামের যাবতীয় বেহারাদের অন্যত্র যাইতে নিষেধ করা হইয়াছে। অনন্যোপায় হইয়া আমরা নবাব সাহেবের কর্ম্মচারীর শরণাপন্ন হইলাম ও তাঁহার কৃপায় আমরা নিরাপদে বেহারে পৌঁছিয়াছিলাম।

রাজগৃহ গ্রামটী অতিশয় অপরিষ্কার তাহার কারণ এখানে অনেক গো, মহিষ আছে। প্রাতঃকালে শত শত গো মহিষ পাহাড়ে চরিতে যায় ও সন্ধ্যাকালে সেই সকল গ্রামে ফিরিয়া আসে। ফসলের সময় গো মহিষ ভেড়া ও ছাগল পালে পালে দিবা রাত্র পাহাড়েই থাকে ফসল কাটা হইলেই তাহারা গ্রামে ফিরিয়া আসে।

রাজগির গ্রাম হইতে পাহাড় প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ হইবে। দুর্গন্ধপূর্ণ রাজগিরের বসতি মধ্য দিয়াই পাহাড়ে যাইবার রাস্তা গিয়াছে। বসতি পার হইয়াই সম্মুখে ক্ষুদ্র পাহাড়ের মত একটা উঁচু মৃত্তিকার ঢিপি দেখা গেল, তাহার উপরে গিয়া দেখিলাম যে পুরাতন ইটের কাঁড়ি রহিয়াছে উহা বস্তুতঃ পাহাড় নহে প্রাচীন কালের কোন রাজার গড় ছিল।

মৃত্তিকার ঢিপি পার হইয়াই রাজগির পাহাড়ের সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। পর্ব্বতের উপরিভাগে ও নিম্নতলে অনেকগুলি মন্দির দেখিতে পাওয়া গেল। আমরা পাহাড়ের মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে পশ্চিম

দিকে একটি আম্র বাগানের মধ্যে অতি সুন্দর একটী গৃহে প্রবেশ করিলাম ও দেখিলাম আমাদের কয়েকটি বন্ধু সেখানে পূর্ব্বেই পৌছিয়াছেন। স্থানটি অতিশয় রমণীয়; অদূরে সরস্বতী নাম্নী একটি ক্ষুদ্র নদী কুলুকুলু শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। নদীতে মাছ অপর্য্যাপ্ত। সেখানকার ভদ্র জাতিতে কেহ মাছ খায় না সেই নিমিত্ত নদীতে বড় একটা মাছ ধরা হয় না; কখন কখন ইতর লোকে মাছ ধরে।

রাজগিরে পৌছিযাই আমরা সকলে উষ্ণ প্রসবণ দেখিতে যাইলাম। সরস্বতী নদী পার হইযা পাহাড়ের নিম্নতলে পৌছিলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম যে কিছু উপরে কয়েকটী মন্দির আছে তাহাতে উঠিবার জন্য সুন্দর সিঁড়ি রহিয়াছে। ৪০ ধাপ উঠিবাব পর একটি সমতল স্থানে পৌছিলাম ও সেখানে দুইটি প্রধান উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিতে পাইলাম।

রাজগৃহে উষ্ণ প্রস্রবণগুলিকে কুণ্ড কহে। কুণ্ডগুলি ছোট পুষ্করিণীর ন্যায়। প্রথমে আমবা সপ্তধারা কুণ্ডে নামিলাম। দেখিলাম পাহাড় হইতে ৭টি ধারা ঐ কুণ্ডে পড়িতেছে। কুণ্ডটিব চারি পাড় প্রস্তর দিয়া বাঁধান। উহা ৬০ হাত দীর্ঘে ও ১২ হাত প্রস্থে। কুণ্ডে জল সামান্যই আছে এক হাঁটুব অধিক হইবে না কিন্তু অতিশয গরম।

সাতটি ধারা সাত জন ঋষির নামে সংকল্প করা আছে যথা,—গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জামদগ্ন্য, দুর্ব্বাসা, পরাশর ও বশিষ্ঠ। এই সাতটি ধারার মধ্যে বিশ্বামিত্র ও জামদগ্ন্য ধারা অতিশয় প্রবল অপর অপরগুলি তত প্রবল নহে। সব ধারাগুলি হইতেই গরম জল পড়িতেছে কিন্তু গরম কোনটায কিছু অধিক ও কোনটায় কিছু কম। এই কুণ্ডের এক পার্শ্বে একটি গুহা আছে তাহাতে ঐ সাতটি ঋষির প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আছে।

রাজগৃহে পাঁচটি পাহাড় আছে কিন্তু বৈভার ও বিপুল বলিয়া যে দুইটি পাহাড় আছে তাহার নিম্ন তলেই অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। উষ্ণ প্রস্রবণগুলি সরস্বতী নদীর উভয় কূলে। বৈভার পাহাড়ের নিম্নে সাতটি এবং বিপুল পাহাড়ের তলদেশে ছয়টি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। কুণ্ডগুলির জলের উষ্ণতা ৭৪ ডিগ্রি ফ্যারানহাইট হইতে ১১০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত। সূর্য্য কুণ্ড বলিয়া একটি

কুণ্ডের জল ১০৩ ডিগ্রি উষ্ণ কিন্তু আশ্চর্য্য যে তাহাতে ভেক সকল খেলা করিতেছে। আর অন্য কোন গরম জলের কুণ্ডে ভেক দেখিতে পাই নাই।

রাজগৃহে আমরা সর্ব্বসমেত বিংশতিটি কুণ্ড দেখিযাছিলাম তন্মধ্যে ১৩টি উষ্ণ জলের ও ৭টি শীতল জলের। ১৩টি উষ্ণ জলের কুণ্ডগুলির নাম যথা—ব্রহ্মকুণ্ড, সপ্তধাবা, কাশিধাবা, অনন্তঋষি, গঙ্গা-যমুনা, ব্যাস, মার্কণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, সোমকুণ্ড, গণেশ, রামকুণ্ড, সিংরি ঋখি। এই কুণ্ডগুলির মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ডের জল সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ, ইহাতে কোন ধারা নাই। নিম্ন হইতে জল উঠিয়া কুণ্ডকে পরিপূর্ণ কবিতেছে ও অতিরিক্ত জল বাহির হইয়া যাইতেছে। তৎপবে সপ্তধারাকুণ্ড। রামকুণ্ডে বড় আশ্চর্য্য দেখা গেল তাহাতে দুইটি ধারা পাশাপাশি বহিতেছে তন্মধ্যে একটীব জল উষ্ণ ও অপরটীব জল শীতল।

অপবাপর কুণ্ড হইতে অর্দ্ধ পোযা দূরে বিপুল পর্ব্বতের তলদেশে সিংরিঋখিকুণ্ড অবস্থিত। ইহার জল অতি সামান্য গরম ৯৭ ডিগ্রির উপর হইবে না কিন্তু ইহাব গুণ অতি শীতল এক দিন স্নান করিলে সর্দ্দি বোধ হয়। ইহা এক্ষণে মুসলমানগণের অধিকারে আছে ও এক্ষণে ইহা মুকদুমকুণ্ড বলিয়া খ্যাত। মুকদুমকুণ্ড নাম হইল কেন? তাহার কারণ অনুসন্ধান করিযা জানিলাম যে আনুমানিক হিজরি ৭১৫ অব্দে মুকদম সা সেখ সরিফ উদ্দিন আহম্মদ নামক একটি মুসলমান রাজগৃহে বাস কবিতেন। তিনি অতিশয় ধর্ম্মশীল ও শুদ্ধচেতা ছিলেন। তাঁহাকে হিন্দু মুসলমান সকলেই সমভাবে ভক্তি করিত। তিনি সর্ব্বদাই এ কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস কবিতেন ও অনেকানেক মুসলমান স্ত্রী পুরুষ তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ লইতে আসিত ও ঐ কুণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে পাকশাক করিয়া খাইত ও কুণ্ডে স্নান করিত এইরূপে ক্রমশঃ ঐ কুণ্ডটি মুসলমানদের অধিকৃত হইয়াছে ও উহা ফকির মুকদম সার নামানুসারে মুকদম কুণ্ড বলিয়া থাকে। ঐ কুণ্ডের পার্শ্বে সুন্দর মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে ও সময়ে সময়ে দেশ দেশান্তর হইতে মুসলমানগণ আসিয়া সমবেত হয়। ঐ কুণ্ডের সন্নিকটে একটি অতি সঙ্কীর্ণ গুহা দেখিলাম তাহা অতিশয় অন্ধকার। শুনিলাম ঐ গুহার মধ্যে ফকির মুকদম সা

৪০ দিন অনাহারে থাকিয়া ভগবানের উপাসনা করিয়াছিলেন। রাজগৃহের ১২ মাইল দক্ষিণে গয়া জেলার অন্তর্গত "তপোবন" নামক স্থানে ৪টি গরম জলের প্রস্রবণ আছে। স্থানটি অতিশয় জঙ্গলপূর্ণ ও পথে হিংস্রক জন্তুর ভয় আছে। মকর সংক্রান্তির দিন বৎসর বৎসর এখানে একটী মেলা হয় সে সময় দেশ দেশান্তর হইতে বিস্তর লোক আসে ও এমন নিবিড় জঙ্গল আনন্দের ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হয়।

রাজগৃহের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে "অগ্নিধারা" নামক আর একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে তাহার জল "ব্রহ্মকুণ্ড" হইতেও উষ্ণ।এখানে বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিবস একটী মেলা হয়।

রাজগৃহের বিবরণ পৌরাণিক ইতিহাসেও পাওয়া যায়। ইহার পাঁচটী পাহাড়ের উপত্যকায় মগধরাজ জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। জরাসন্ধের জন্ম বৃত্তান্ত অতিশয় অদ্ভুত। তিনি মগধের একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার পিতা বৃহদ্রথ রাজা কাশী রাজের যমজ কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করিয়া ছিলেন ও তাঁহাদের সহিত নির্জ্জনে এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তোমাদের উভয়ের প্রতিই আমি সমান অনুরক্ত থাকিব, কদাচ বৈষম্যাচরণ করিব না। ঐ রাজা পত্নীদ্বয়ের সহিত সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু অনেক যজ্ঞ হোম করিয়াও বংশধর একটি পুত্র সন্তান হইল না দেখিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। একদা যজ্ঞকৌসিক নামক এক মুনি যদৃচ্ছাক্রমে আগমন পূর্ব্বক এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট আছেন, শ্রবণ করিয়া রাজা বৃহদ্রথ তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া মুনিজন সমুচিত অনেক উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রদান দ্বারা মুনিবরকে পরিতুষ্ট করিলেন। ঋষিবর যজ্ঞকৌশিকরাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটি আম্র ফল প্রদান করিলেন ও কহিলেন তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর। রাজা স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া পত্নীদ্বয়কে ঐ এক ফল প্রদান করিলেন। তাঁহারাও উভয়ে ঐ ফল অংশ করিয়া ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর উভয় পত্নীই গর্ভবতী হইলেন ও দশ মাস পূর্ণ হইলে ঐ দুই রাজমহিষী দুই খণ্ড শরীর প্রসব করিলেন এবং উহাদের প্রত্যেকের এক চক্ষু, এক বাহু, এক চরণ, অৰ্দ্ধ মুখ, অৰ্দ্ধ উদর অবলোকন করিয়া উভয়ে ভয়ে কম্পিত

হইতে লাগিলেন। ভগ্নীদ্বয় তখন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর পরামর্শ পূর্ব্বক ঐ জীবিত শরীরখণ্ডদ্বয় অতি দুঃখে পরিত্যাগ করিলেন। উহাঁদিগের দুই জন ধাত্রী ঐ শরীরখণ্ডদ্বয় সুন্দররূপে আবৃত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া আসিল।

তদনন্তর মাংস-শোণিত-ভোজিনী "জরা" নামে একজন রাক্ষসী পথে দেহখণ্ডদ্বয় দেখিয়া তাহা গ্রহণ করিল ও সহজে বহন করিবার আশয়ে যেমন দেহখণ্ডদ্বয় একত্র করিল অমনি অর্দ্ধ কলেবর যুগল পরস্পর সংযোজিত হইয়া বীরকুমার হইল। রাক্ষসী রাজকুমারকে নষ্ট না করিয়া রাজাকে উহা প্রদান করিল। রাজা "জরা রাক্ষসী ইহাকে সন্ধি অর্থাৎ সংযোজিত করিয়াছে অতএব ইহার নাম জরাসন্ধ হউক।" এইরূপ স্থির করিয়া বালকের নাম করণ করিলেন।

বৃহদ্রথ রাজা বনগমন করিলে প্রবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ রাজা মগধ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন ও অবশেষে ভীম সেন কর্ত্তৃক সংগ্রামে নিহত হন। রাজগৃহের পাঁচ পাহাড়ের উপত্যকায় যেখানে মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ রাজার রাজধানী ছিল এক্ষণে তাহা হিংস্রক জন্তু পূর্ণ নির্জ্জন বন হইয়াছে। স্থানটী এত জঙ্গলময় যে দিবসেও আমাদের মনে ব্যাঘ্র ভল্লুকের ভয় হইয়াছিল। জরাসন্ধ রাজার মল্লভূমির এখনও স্পষ্ট চিহ্ন রহিয়াছে। রাজগৃহের লোকেরা তাহাকে "রঙ্গভূম" কহে ও অনেকে সেখান হইতে মৃত্তিকা লইয়া আসে ও গাত্রে লেপন করে। সেখানকার প্রবাদ এই যে ঐ মৃত্তিকা অঙ্গে লেপন করিলে শরীর বলিষ্ঠ হয়। রঙ্গভূমের মৃত্তিকা দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে বিশেষ যত্ন সহকারে ঐ মৃত্তিকা তৈয়ার হইয়াছিল, মৃত্তিকাতে একটি কাঁকর কি বালি নাই। রঙ্গভূম রাজগৃহ হইতে এক ক্রোশ দূরে। রঙ্গভূম যাইবার পথে একটি গুহা দেখিলাম তাহাকে সেখানকার লোকে "সোনভাণ্ডার" কহে। সেখানে জনপ্রবাদ আছে যে "সোনভাণ্ডার"ই জরাসন্ধ প্রভৃতি মগধরাজগণের ধনাগার ছিল। গুহাটী বেশ প্রশস্ত ও চারিদিকের ভিত্তি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

রাজগৃহের পাহাড়গুলির উপর অনেকগুলি জৈনদিগের মন্দির আছে। জৈনেরা মাঘ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত দলে দলে রাজগৃহে আসে ও পাঁচটী পাহাড়ের মন্দিরগুলি দর্শন করিয়া বেড়ায়। আমরা অনেকগুলি

মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। মন্দিরগুলির মধ্যে জৈনদের প্রস্তর নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি সকল রহিয়াছে। পাহাড়গুলি এত উচ্চ ও উপরে উঠিবার রাস্তা এত মন্দ যে আমরা ডুলি না হইলে উপরে উঠিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করিতাম কিন্তু সেখানকার বেহারাদের এতদূর সামর্থ্য যে দুই দুই জনে আমাদের এক এক জনকে ডুলি চড়াইয়া অনায়াসে স্কন্ধে করিয়া পাহাড়ের উপরিভাগে লইয়া গেল। রাজগৃহের বেহারারা মাঘ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত জৈনদের পাঁচটি পাহাড়ে ডুলি করিয়া উঠাইয়া ও বৎসরের বাকি সময় চাষ আবাদ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

বৈভার পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে একটি ভগ্ন শিবমন্দির আছে তাহার চতুর্দ্দিকে নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে। আমরা জঙ্গল ভেদ করিয়া মন্দিরের ভিতরে যাইয়া দেখিলাম যে শিবলিঙ্গ এখনও রহিয়াছেন কিন্তু তাঁহার দৈনিক পূজা কে করে? কোন হিন্দুভক্ত দৈবাৎ পাহাড়ের উপর যাইলে ঐ ভগ্ন মন্দিরে শিবপূজা করিয়া আসে। মন্দিরটি প্রস্তর নির্ম্মিত বলিয়া এখনও দণ্ডায়মান আছে নচেৎ কোন্‌কালে ভূমিসাৎ হইয়া যাইত। রাজগৃহের জল বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় হিতকর। বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার মধ্যে ওরূপ স্বাস্থ্যকর স্থান আর নাই। রাজগৃহ যদি রেলের ধারে হইত তাহা হইলে মধুপুর ও বৈদ্যনাথের এত গৌরব থাকিত না। সপ্তধারা কুণ্ডের জল অজীর্ণ রোগের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। ইহার জল বেহারের ধনাঢ্য লোক ও রাজপুরুষেরা পান করেন। রাজগৃহের বৈভার পর্ব্বতের কুণ্ডগুলির পার্শ্বে কয়েকটি শিবমন্দির আছে ও তাহার নিকটেই যাত্রীদিগের থাকিবার নিমিত্ত প্রস্তর নির্ম্মিত একটি সুন্দর অট্টালিকা আছে। এই বাড়ীটী বেহার নিবাসী জমিদার বৈদ্যনাথ সিং নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। বিদেশীয় লোক জন এখানে বিনা অনুমতিতে আশ্রয় পাইতে পারে। এখানে সময়ে সময়ে অনেক সাধু লোকের সমাগম হয়।

শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

ডেলিগেটের ডালি।

আর্য্যদর্শন বান্ধবের জীবন জোয়ার যখন থমথমে তখন আমরা বসন্তে নিদাঘে শরতের শারদীয়া আগমনী পাঠ করিতাম! পুর্ণিমার সে কলঙ্ক নাই। সে কলঙ্ক কেনই বা হইবে? মাঘের উত্তরায়ণে পৌষের পিষ্টকের জের বাঙ্গালায় সর্ব্ববাদী সম্মত, আর আমি যখন ৭ই পৌষ পুরা ত্র্যহস্পর্শে বড়দিন মাথায় করিয়া প্রবাস পন্থায় পদক্ষেপ করি। পাঠক পাঠিকা না হয় শুক্‌না গাঁদার মালা ছড়াটা ফেলিয়া দিবেন।

আমার এক স্বর্গীয় বন্ধু গাহিয়াছিলেন—

"ধীরে, ধীরে কর পার
আমরা বাঙ্গালী জাতি না জানি সাঁতার
(অথবা পাঠান্তর) নাহি ষ্টীমার।"

শিবাদহ হইতে ডায়মণ্ডহারবার অভিমুখে লৌহপথে লৌহতুরঙ্গ যতই প্রধাবিত হইতে লাগিল, ততই, স্পিরিটুয়ালিষ্টের মুক্তাত্মার ন্যায়, কর্ণকুহরে কে যেন ঐ গান ঘন ঘন গাহিতে লাগিল। সামান্য হাঁচি টিক্‌টিকী না মানিলেই হিন্দুর আচার পিনালকোড অনুসারে রাসভ শ্রেণীতে পরিগণিত হইতে হয়—ত্র্যহস্পর্শের কথা দূরে থাকুক। হাতে হাতে ফল। পূর্ব্ব সঙ্কেতানুসারে ডায়মণ্ডহারবারে অভিসারে গমন করিয়াছিনু—বিপ্রলব্ধার ন্যায় ফিরিতে হইল

গৃহ ছাড়ি ঘন বন, করিলাম আরোহণ
সিন্ধু তরিনু ধরি ভেলা
হরি হরি মরি মরি উহু উহু হরি হরি
তবু নহে হরি সনে মেলা
পর দুখ পর শ্রম পর জনে জানে কম
অপরূপ থল জল খেলা।

যখন ডায়মণ্ডহারবারে খাঁড়ি পার হইয়া—সিন্ধু তরিনু ধরি ভেলা—টেলিগ্রাফ আফিসেও "হাজারা" জাহাজের শ্বেতাঙ্গমুখেও কোন সংবাদ পাইলাম না তখন বাস্তবিকই আতঙ্ক হইল। তখন অনন্যোপায় হইয়া

বন্ধুসহ (শিবাদহে একজন সঙ্গী মিলিয়াছিল) ফিরিয়া কলিকাতায় বাবুঘাটে অতি প্রত্যুষে পঁহুছিলাম সম্মুখে দেখিলাম একখানা ষ্টীমার তাড়িতালোকে উদ্ভাসিত। একখানা ডিঙ্গি করিয়া তাহারই উপর উপনীত হইলাম। সংবাদ পাইলাম যে সে জাহাজ খানা রেঙ্গুন মেল কিন্তু তাহারই অনতিদূরে "কারাগোলা" জাহাজ আছে। সেই খানি "বাবু" লইয়া মান্দ্রাজ যাইবে। তখন নিমেষের মধ্যে—নিমেষ বই কি—দেখিলাম কারাগোলার পাশে ডিঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আমি "ডেলিগেট" "ডেলিগেট" শব্দে তারস্বরে ডাকিতেছি। কারাগোলা তখন ছাড়ে ছাড়ে। আবার নিমেষের মধ্যে, পরস্পর সম্ভাষণ,—সোপান ক্ষেপণ—জাহাজ আরোহণ--উপর ডেকে দণ্ডায়মান।

তখন,

দেখিয়া তাহার মুখ অতুল হইল সুখ
পাসরিনু যত দুঃখ আছিল যে ভয় হে
যত কাল জীয়া বই তাহা ছাড়া যেন নই
নিতান্ত করিয়া কই মনে বয় হে।

বলিতে হইবে কি, আমি "ডেলিগেট" হইয়া মান্দ্রাজে কংগ্রেসে যাইতেছি?

তখন ভাসিলাম। কারাগোলা সবাষ্প-চীৎকারে নগরবাসী ও জাহ্নবী-হৃদয়বাসীকে কি কথা কহিল। অমনি পোষ্টাফিসের গুম্বজ, হাইকোর্টের চূড়া, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ আর জাহাজের গুণবৃক্ষাবলী বাগবাজার অভিমুখে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। জাহাজ এখন হারবার মাষ্টার কর্তৃক চালিত। জাহাজের নিয়ম এই যে, জাহাজ কলিকাতা বন্দর হইতে ছাড়িলে প্রথমে গার্ডেনরীচ অর্থাৎ মেটেবুরুজ পর্য্যন্ত জাহাজ বন্দরাধিপতিগণের (পোর্টকমিশনার্স) কর্ম্মচারী হারবার মাষ্টারের অধীনে থাকে। তথা হইতে সাগর সঙ্গম পর্য্যন্ত (যাহাকে ইংরাজীতে স্যাণ্ড হেড্‌স্ বলে) জাহাজ পাইলটের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। তৎপরে কালাপানিতে অর্থাৎ সমুদ্রে পড়িলে জাহাজের কাপ্তেন জাহাজ চালাইয়া থাকেন। আমরা ভাগীরথীর উভয় তট বাইনোকিউলার সাহায্যে দর্শন করিতে করিতে ও নানাবিধ কথা প্রসঙ্গে সন্ধ্যার প্রাক্কালে সাগর সঙ্গমে উপনীত হইলাম। জাহাজ একখানি ক্ষুদ্র নগর বিশেষ; সমুদ্র যাত্রার প্রয়োজনোপযোগী যাহা চাহিবেন প্রায় তাহাই প্রাপ্ত হইবেন। জাহাজে আহারাদির সুব্যবস্থা

ছিল—হিন্দু মতে ও অহিন্দু মতে। অহিন্দুর পার্থিব সুখ চিরকাল, জাহাজে আরও বেশী। "পক্ষ মাংস মৃগ মাংস সেবা রুচি হয়, আজ্ঞা কর কোন্ মাংস আনি মহাশয়"—এ কথা যুক্ত করে শ্বেতশ্মশ্রু গলিত-দশন "বয়" (boy) যেন সর্ব্বদাই বলিতেছে। আহার বিহার ব্যবহারে যাঁহাদের সাহেবী আনা রকম ষোল আনা অভ্যাস নাই তাঁহাদের যাতনা দেখিয়া ষ্টীমারীয় হস্ত (hands) সমস্তের অধর প্রান্তে ক্ষণে ক্ষণে বিজলী বিকাশের ন্যায় ঈষৎ হাসি প্রকটিত হইত। বেহায়া ব্যক্তিবৃন্দ সেই হাসি মঞ্জুর করিয়া লইয়া ও তাহাতে যোগদান করিয়া কেবল মাত্র স্বকীয় ধৃষ্টতার পরিচায়ক হইতেন মাত্র। উদ্ভিজ্জভোজীরা কেবল মাত্র ডিম্ব আহার করিতেন। জাহাজে অপর প্যাসেঞ্জার ছিল না কেবল ডেলিগেট বৃন্দ—তাঁহাদের মধ্যে অনেকে গণ্য মান্য ধন্য বদান্য; বন্য ভ্রাতাও যে তন্মধ্যে ছিলেন না ইহা নিঃসংশয়ে কে বলিতে পারে? আসিতে আসিতে আমরা এক স্থানে "হাজারা" জাহাজ (যাহাতে প্রথমে ডায়মণ্ডহারবর হইতে আমাদের মান্দ্রাজ যাইবার কথা হয়) চড়ায় বালিতে লাগিয়া বসিয়াছে দেখিয়া আসিয়াছি। আমরা সাগর সঙ্গমে উপনীত হইলাম।

যাঁহারা হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন তাঁহাদের জন্য আমার অত্যন্ত দুঃখ হয়। কেহ যেন মনে করিবেন না আমি রহস্য করিতেছি। তাঁহারা ভাল ভাল প্রমাণ থাকিতে তাহার ব্যবহার করেন না। এই যে হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা, এই সন্ধ্যার মধ্যে এমন প্রমাণ আছে যে হিন্দুরা পূর্ব্বে সমুদ্রযাত্রা করিতেন। অনেকেই জানেন সন্ধ্যা বেদ হইতে লওয়া। তাহা ছাড়া এখন হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের সময় গীতাযুগ। গীতাতে এমন কথা আছে যাহাতে ঐরূপ সমুদ্রযাত্রার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া সুদূর সাগরসঙ্গম হইতে যিনি "তমালী-তালী বনরাজি লীলা" দেখিয়া দেখিয়া ক্রমে "ধরা নিবদ্ধ কলঙ্ক রেখেব" দেখিয়াছেন তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে কালিদাস সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। ততদূরে—সমুদ্র বক্ষ হইতে স্থলভাগ স্বচক্ষে না দর্শন করিলে, ধরা নিবদ্ধ কলঙ্ক রেখেব এ কথা, কেবল মাত্র কল্পনার সাহায্যে লেখা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব প্রমাণ হইল প্রাচীন হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রা করিতেন ও আমরাও সচ্ছন্দে সমুদ্র পথে যাইতে পারি।

সাগর সঙ্গমের জল দেখিবার বটে। এই কর্দ্দমময়ী আবিল জাহ্নবী বারি এক দিকে—এই অপর দিকে, মসীর ন্যায় নীল-কৃষ্ণ (কোথাও কোথাও সূর্য্য কিরণে সবুজও দেখায়) স্বচ্ছ পয়োনিধি—আর মধ্যস্থলে হর গৌরী মিলন! ভাঁটার টানে ভাগীরথীর বারি সমুদ্র মধ্যে অনেক ক্রোশ চলিয়া যায় আবার জোয়ারের সময় সমুদ্র বারি নদীর জলকে মোহানা মধ্যে ঠেলিয়া দেয়—সেও ও অনেক ক্রোশ। সুতরাং উপযুক্ত সময়ে এই জল-মিলন দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। দৃশ্য অতীব নয়ন আনন্দ দায়ক। বলা বাহুল্য, যাঁহারা ৺গঙ্গাসাগর তীর্থ দর্শন করিতে যাত্রা করেন তাঁহাদের ভাগ্যে এ জল দর্শনের আদৌ কোন সম্ভাবনা নাই।

এই স্থলে তিন খানি জাহাজ পথের দক্ষিণ বাম উভয় পার্শ্বে আনু-মানিক ৭ মাইল অন্তর নঙ্গর করিয়া সর্ব্বদাই আছে। পাঠক পাঠিকা পথ ভ্রম ক্রমে লিখি নাই। জাহাজ যাইবার বাস্তবিকই পথ আছে। আমাদের চর্ম্মচক্ষে যখন জাহাজ নদীর মধ্যে বা মোহানায় থাকে তখনই উভয় পার্শ্বের রং বিরংএর বয়া দেখিয়া বুঝিতে পারি। সমুদ্রের উপর বুঝিতে পারি না। এই পথ ছাড়া বিপথে যাইবার যো নাই—কি জানি, যদি চড়া; চোরাবালি বা শৈল থাকে—তাই মধ্যে মধ্যে জাহাজে জাহাজে টক্কর লাগিবার কথা শুনা যায়। যে তিন খানি জাহাজের কথা বলিতে-ছিলাম উহাদের নাম অপর গ্যাস্‌পার, মিডিল গ্যাস্‌পার, আর লোয়ার গ্যাস্‌পার। তিন খানির রং আলাদা। উহার উপর আলোক-স্তম্ভ আছে। এই জন্য উহাকে Channel Light-house বলিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া জাহাজ সকল আপনাদের গন্তব্য পথ অবধারণ করে। এই জাহাজে রীতিমত একটি আফিস আছে, ডাক্তার আছে, পাইলট আছে ইত্যাদি। সমুদ্রগামী জাহাজের পাইলট নামিয়া এই গ্যাস্‌পারে থাকে, আবার পোতগামী জাহাজের উপর আরোহণ করিয়া ফিরিয়া আইসে। জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিবে কি না তাহার পরীক্ষা এই স্থলে হয়। যদি জাহাজে কাহারও ওলাউঠা বা বসন্ত হয় তবে এই খানে জাহাজকে গতিশক্তি হীন হইয়া থাকিতে হয়। ইংরাজিতে এই সকল নিয়মকে কোয়ারিণ টাইন বলে।

প্রথম দিন আমাদের নব অনুরাগের আশায় ভস্ম পতিত হইল—

সূর্য্যাস্ত দেখিতে পাইলাম না। এংলো-ইণ্ডিয়ান মেঘ সকল আসিয়া সূর্য্যদেবকে নিবিড় আবরণে আচ্ছাদিত করিল। পরে কিন্তু প্রাণ ভরিয়া উদয় অস্ত দুই-ই দেখিয়াছিলাম।

জাহাজের উপর, কেবল উপর নীচে করিয়া, আর জাগরণ নিদ্রায় বা নিদ্রা জাগরণে সময়ক্ষেপ করিতাম। না, অপলাপ করিয়াছি। বাঙ্গালির অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে যে গ্রাবু তাহা কোথায় যাইবে? সাগর বক্ষে একবার শতরঞ্চ সুখ সাগরেও সাঁতার না দিলে চলিবে কেন? তাহা ছাড়া দেশী বিলাতী নৃত্য গীত ছিল। অধ্যাপনা, গবেষণা, কল্পনা, জল্পনা, সারিকথা বক্তৃতা, হিসাব নিকাশ সকলই ছিল। থাকিবে না কেন? আমরা তখন কি?——

"অমরবৃন্দ কম্পিত যার ভুজ বলে"

কাপ্তেন পেক্‌হাম আমাদিগকে জাহাজ চালান শিখাইয়া ছিলেন ও ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কল কারখানা দেখাইয়া দেন। বড়দিনে রামপাল সিংহ উহাঁদিগকে ভোজ দিয়াছিলেন। উহাঁরাও নৃত্য গীতে আমাদিগকে তুষ্ট করেন। রাজা রাম পালের বিশ্বাস চতুরঙ্গ ক্রীড়ায় তিনি অদ্বিতীয়; কিন্তু, রেভঃ চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেনের হস্তে তাঁহার গরিমার লঘিমা-প্রাপ্তি হইয়াছিল। পণ্ডিতবর ("বর" শ্রেষ্ঠার্থে, বিষ্ঠার্থে নয়; যথা, গো-বর) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের কাব্যে আজাহাজ সমস্ত প্রাণীর প্রাণকে মায় Flying fish অর্থাৎ উড়নশীল মৎস্যকেও কুক্ষিগত হইতে হইয়াছিল। জাহাজের উপর রবিবারে রেভঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সার্ম্মণ দিয়াছিলেন। জাহাজের উপর কংগ্রেসের ও প্রবিনিসিয়াল কন্‌ফারেন্সের ভাবী উন্নতির জন্য ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিবার সভাও হইয়াছিল। ব্যভিচার দোষে পতিত মান্দ্রাজী নর্টন সাহেবকে জাহান্নমে দিবার সংকল্পও হইয়াছিল। পুঁথী বাড়িয়া যাইতেছে। শনিবার প্রাতে (২২শে ডিসেম্বর। ৯৪) কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিলাম। মঙ্গলবার শেষ রাত্রিতে মান্দ্রাজ হাইকোর্টের চূড়ার উপর যে আলোক-স্তম্ভ আছে তাহার আলোক দেখিতে পাইলাম।

অনরেবল চারু চন্দ্র মিত্রের কার্য্য কুশলতা দেখিয়া অনেক সাহেব চমৎকৃত হইয়াছেন। ডেলিগেট সম্প্রদায়কে ও ডেলিগেটের সংগের

সম্প্রদায়কে তিনি যেরূপ শৃঙ্খলাময়ী নীতি অনুসারে প্রণালী পূর্ব্বক তীরে আনয়ন করেন তাহা বাস্তবিকই একরূপ অসম্ভব। পূর্ব্বে মান্দ্রাজে জাহাজ হইতে নামিতে বিশেষ কষ্ট হইত—এতই তুফান। এক্ষণে হয় না। কারণ মান্দ্রাজের সুমুখের সমুদ্র খানিকটা পাথরের প্রাচীরের বেড়া দিয়া কাল্পনিক পোতাশ্রয় রচনা করা হইয়াছে। উহাকে বকিংহাম পিয়ার কহে। বকিংহাম সাহেব মান্দ্রাজের একজন গবর্ণর ছিলেন। জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়া এইক্ষণে এই উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। মান্দ্রাজের কুলীরা বড় চোর। জাহাজ আসিলেই তাহারা দলবদ্ধ হইয়া জাহাজে আসিয়া উঠে ও মালামাল চুরি করিয়া পলায়ন করে। এই জন্য আমাদিগকে অত্যন্ত সাবধান হইতে হইয়াছিল ও চারু বাবুকে তাহাদিগকে তাড়াইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। আমরা অম্ভোনিধির নিকট আপাতত বিদায় হইয়া তীরে অবতীর্ণ হইলাম।

"বীচ" ষ্টেসনে (সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে) বাষ্পীয়-যান আরোহণ করিলাম। ডেলিগেটের জন্য স্পেশিয়াল ট্রেণ, প্রথম শ্রেণীর টিকিট বিনা মূল্যে। মান্দ্রাজের অপর প্রান্তে কংগ্রেস ক্ষেত্র; সুতরাং আমাদিগকে ৭ মাইল ট্রেণে মান্দ্রাজ পার হইয়া যাইতে হইল। চীৎপাৎ ষ্টেশনে নামিলাম। সম্মুখে বড় তোরণ। তাহাতে লেখা welcome বাগানের ভিতর দিয়া রাস্তা। ক্রমে চলিতে চলিতে রঙ্গিয়া নায়াড়ুর বাগানে উপস্থিত হইলাম। রঙ্গিয়া নায়াড়ু একজন বড় মহাজন ও মান্দ্রাজ লেজিস্‌লেটিভ সভার সভ্য। এই বাগানে বাঙ্গালা, উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাবের ডেলিগেটগণের থাকিবার স্থান হইয়াছিল। আমরা বাগানে পঁহুছিলাম। আমাদের লগেজ কুলীরা (স্ত্রী পুরুষ) মাথায় করিয়া পঁহুছিয়া দিল। ধ্বজ-পতাকায় ফুলের মালায় বাগান বাড়ী সাজিয়া ছিল ভাল। আমরা আপন আপন স্থান অধিকার করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিলাম। ইতি মান্দ্রাজে বেঙ্গল ডেলিগেটগণের আবির্ভাব।

(বারান্তর)

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

কুমারের সরস্বতী পূজা।

(১)

বসন্ত যামিনীযোগে নিদ্রিত কুমার
লক্ষ্মীসম মাতৃ কোলে—
লতায় কুসুম দোলে—
ভবানীপুরের' বাসে সুখের আগার।

(২)

ফুলদলে সুশোভিতা ভুবন মোহিনী
বীণাপাণি বীণাকরে
আসি তথা ধীরে ধীরে
শয্যাপাশে বসিলেন মানস মোহিনী।

(৩)

মধুর বাজিল বীণা ললিত সুতানে
বসন্তে বসন্তরাগে—
হৃদয়ের অনুরাগে—
দেবীর সুকণ্ঠ স্বর—উঠিল বিমানে।

(৪)

"কে বলে লক্ষ্মীর সঙ্গে বিবাদ আমার ?
লক্ষ্মী আমি দুই বোন্
এক প্রাণ এক মন
"প্রেমের বন্ধনে বাঁধা থাকি অনিবার।

(৫)

"লক্ষ্মীর সন্তান তুমি উঠহে কুমার !
সাজায়ে বিদ্যার বেশে—
যশ গুণ—সমাবেশে—
ঘুচাব প্রতিজ্ঞা মম—কলঙ্ক আমার।

(৬)

"দুঃখীর সন্তান ছিল বিপ্র একজন
আমার কৃপার গুণে
থেকে তোমাদের সনে
তোমাদের অন্তরঙ্গ হয়েছে এখন।

(৭)

"আমার আদেশে সেই সাজাবে তোমায়
বিদ্যার কুসুম দলে
সাজাবে তোমার গলে
এই কথা মনে রেখো—ভুল না আমায়।

(৮)

ভাঙ্গিল সুখের স্বপ্ন—জাগিল কুমার
মিলি সব ভ্রাতৃগণ
হলো আনন্দিত মন
দেবীর পূজার তরে উৎসাহ অপার

(৯)

বসন্ত পঞ্চমী দিনে অতি শুভক্ষণে
দেবীর পূজার তরে
মহা সমারোহ ক'রে
কুমার করিল পূজা আনন্দিত মনে।

(১০)

জননী হৃদিরঞ্জন তুমি হে কুমার!
চিরজীবী ধর্ম্মে মতি
বিদ্যাপথে সদা গতি
অতুল বৈভব সুখে থাক অনিবার॥

শ্রী-

রামায়ণ আর্য্যদের মহাকাব্য এবং মূলতঃ বাল্মীকি কৃত কি না?

রামায়ণ ও মহাভারতের তুল্য মহাকাব্য বোধ হয় ইহ সংসারে আর নাই। ভবভূতি বলেন, শ্রীরাম চরিত্র, চরিত্র – পঞ্জিকা স্বরূপ। শ্রীরাম চরিত্র সর্ব্বদা নয়নাগ্রে রাখিয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিলে পদস্খলনের সম্ভাবনা বিরল। চরিত্র বর্ণনে, কাব্যগুণে এবং ভাষা মাধুর্য্যে রামায়ণ জগতে অতুল্য।

Ecce homo (be hold the man) ঐ পুরুষ প্রতি দৃষ্টি কর, আখ্যাত এক খানি ইংরাজি পুস্তক আছে। ইহার উল্লিখিত পুরুষ ঈষুখৃষ্ট। ইহাকে ঈষুকে আদর্শ পুরুষ বলা হইয়াছে। আমাদের অল্প বুদ্ধিতে এটি ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। আমরা সাংসারিক জীব এবং স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার। ঈষুখৃষ্টের দারা সুত ছিল না। তিনি চিরকুমার ছিলেন। এরূপ স্থলে মেরী সুত আমাদের পক্ষে আদর্শ-পুরুষ হইতে পারেন কি না, তাহা সুবুদ্ধি পাঠকবৃন্দের বিবেচ্য। শ্রীরামচন্দ্র বীর, ধীর, বাগ্মী, পতি, পিতা নিয়ন্তা এবং সর্ব্ব সদ্গুণের আধার ছিলেন। সকলেরই তিনি আদর্শ হইতে পারেন।

শ্রীরাম চরিত্র সম্বন্ধে এই স্থানে দুইটি কথা বলিয়া পরে প্রবন্ধ শীর্ষ-সূচিত বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইব। ইংরাজী শিক্ষা গুণে পবিত্র শ্রীরাম চরিত্রে কেহ কেহ প্রধানতঃ দুইটি দোষ দৃষ্টি করেন, সীতা বর্জ্জন ও বালী বধ। রাজা শব্দ রন্‌জ্‌ ধাতু মূলক। প্রজারঞ্জক ভূপতিই কেবল রাজা নামের যোগ্য। শ্রীরাম রাজার প্রজারঞ্জন করাই প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং তিনি তাহাই করিতেন। এ কারণ কোন রাজ্য সুখের রাজ্য হইলে আজিও তাহাকে লোকে রাম রাজ্য বলে। শ্রীরামচন্দ্র গূঢ় রাজ-নীতিজ্ঞ ছিলেন। প্রজারঞ্জনের জন্য তিনি সীতাবর্জ্জনে বাধ্য হন। কিন্তু সীতাকে তিনি শার্দ্দূল সঙ্কুল বন মধ্যে নিক্ষেপ করেন নাই। সীতা দেবী মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে রক্ষিত হন। কুলপ্রথানুসারে রঘুনন্দন সীতাকে

নির্ব্বাসিত করিয়া অন্য দার পরিগ্রহ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। জানকী দেবী অযোধ্যা হইতে বহু দূরে অবস্থিতা হইয়াও রঘুনন্দনের চিত্তবাসিনী, হৃদয় রাজ্ঞী ছিলেন। হিরণ্ময়ী সীতা মূর্ত্তি সহ শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। দাশরথি সীতা ভিন্ন অন্য কোন রমণীকে মনোমধ্যে কখন স্থান দিতেন না এবং স্থানও দেন নাই। যে পুরুষ পর্য্যঙ্কে স্বীয় পার্শ্বে আপন সহধর্ম্মিণীকে রাখিয়াও অন্য নারীর চিন্তা করেন, তিনি স্বীয় স্ত্রীকে গৃহে রাখিয়াও তাহাকে নির্ব্বাসন করিয়াছেন বলিলে বোধ হয় অযথা উক্তি করা হয় না। সীতাপ্রাণ শ্রীরাম কখন এরূপ করেন নাই।

বালীবধ কীর্ত্তিবাসে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে বাল্মীকির রামায়ণে সেরূপ নহে। মূল গ্রন্থে এই ঘটনার বর্ণন এইরূপঃ—বালী ও সুগ্রীব যুদ্ধরত, এমন সময় দাশরথি দূর হইতে বালীর বক্ষে ভয়ঙ্কর শর নিক্ষেপ করেন। শরাঘাতে নিপতিত হইয়া বালী সীতাপতিকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ অনুযোগ করেনঃ—"আমি তোমার কোন হিংসা করি নাই, তুমি বিনা অপরাধে কেন আমার হিংসা করিলে?" বালীর কথা শুনিয়া দাশরথি বলেন "ধর্ম্ম রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য এবং ব্রত। তুমি ধর্ম্মভ্রষ্ট, ঘোর পাপাচারী, স্বীয় অনুজ সুগ্রীবের জীবিত কালে তাহার পত্নীতে উপগত হইয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে ঈদৃশ দণ্ড প্রদান করিলাম।" এই কথার পর এবং ইংরাজ কর্ত্তৃক বর্ম্মাদি যুদ্ধের বিবরণ স্মরণে অনেকের নীরব হইবার সম্ভাবনা। দ্বন্দ্বপ্রিয় তার্কিকদের জন্য এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধের এই অংশের উপসংহার করিব।

প্রোফেসার বিবর সাহেবের মতে রামায়ণ একাধিক কবি দ্বারা সংরচিত। একথা সম্ভবপর হইলে সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কবির ইহাতে নিজ নিজ মতানুযায়িক বিষয়াদি সন্নিবেশিত করাও অসম্ভব নহে। ইহ জগতে যাহা কিছু বর্ত্তমান, যাহা কিছু দৃষ্ট হইয়া থাকে তৎসমুদয় ঈশ্বরের বিভূতি, আর্য্য শাস্ত্রের প্রায় এই মত। নর চক্ষে যাহা ভাল মন্দ সেই সমস্তই ঈশ্বরে আছে। এই মতাবলম্বী কবির দ্বারা বালীবধ বৃত্তান্ত রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে। বঙ্কিম বাবুর মতে মহাভারতীয় "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" কাণ্ডও এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ চরিতে

বিন্যস্ত হইয়া অনেক ইংরাজি শিক্ষিতের চক্ষে শ্রীকৃষ্ণ চরিত অনুসরণের অযোগ্য হইয়াছে।

প্রোফেসার বিবরাদি পণ্ডিতদের মতে হোমারের ইলিয়ড্ দৃষ্টে বাল্মীকির রামায়ণ লিখিত। ইহারা আরও বলেন বৌদ্ধদের পুরাতন পুঁথি অবলম্বনে বাল্মীকির রামায়ণ রচিত। বৌদ্ধ ভারতীয় মহাপুরুষ। স্বদেশস্থ ব্যক্তির স্থানে বাল্মীকি ঋণী হইয়া থাকিলে বিশেষ দোষের নহে। বস্তুতঃ বাল্মীকি বৌদ্ধদের নিকট ঋণী কি না তাহার বিচার করিবার অগ্রে তিনি হোমরের অধমর্ণ কি না তাহার আলোচনা করা যাউক।

মেনিলেয়সের স্ত্রী হেলেনকে ট্রয রাজ কুমার পারিস হরণ করিয়া আনিলে, মেনিলেয়সং আগেমেমনন প্রভৃতি গ্রীক ভূপালেরা ট্রয় আক্রমণ করেন। সীতা হরণ এবং লঙ্কা আক্রমণের সহিত ইলিয়ডের এই অংশের সাদৃশ্য থাকায এবং সেকেন্দার সাহ ভারতবর্ষে আগমন করায় বিবর প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ বলেন, বাল্মীকির রামায়ণ ইলিয়ডের অনুকরণ মাত্র।

ইউরোপীয়দের অনুমান শক্তি চমৎকার। কোন সময়ে একটি জেলার ইংরাজ জজ সাক্ষীর জবানবন্দী করিতেছিলেন। অনেকগুলি সাক্ষী বলিল "আমার পিতা মৃত অমুক"। বারম্বার এই কথা শুনিয়া উকিল সরকারকে সম্বোধন করিয়া জজ সাহেব বলিলেন "এ জেলার মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত বেশী, কোন লোকেরি প্রায পিতা বর্ত্তমান নাই।" চড়ক গাছ ক্রুস কি না ঢেরার মত। চড়ক পূজা ও Good Friday প্রায এক সময়ে হইযা থাকে। চড়ক গাছে ও চড়কে ভক্তেরা অনেক যন্ত্রণা ও কৃচ্ছ্র সহ্য করে। ঈষুখৃষ্টও ক্রুসে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেন এবং Easter holiday এবং তদন্তর্গত Good Friday ঈষুখৃষ্টের মৃত্যু ও যন্ত্রণা সহনের দিবস। এই সকল দৃষ্টে চড়ক পূজা "নব সমাচার" উক্ত Crucifiction এর নকল, মিসনারি ভায়াদের এরূপ বলা বিচিত্র নহে। "আমাদের দুর্গা এবং মুসলমানের দর্‌গা, আমাদের মোক্ষদা ও মুসলমানের খোদা একই।" আমরা এরূপ উক্তি করিলে যেন কেহ আমাদের বিদ্রূপ না করেন।

কথিত পণ্ডিতবর্গের বিচিত্র অনুমানের কথা ছাড়িয়া উক্ত রূপ অভিপ্রায় প্রকাশের সম্ভবতঃ কারণ কি, ক্ষণকাল তাহার পর্য্যালোচনা

করিয়া তাহাদের মতের বিচারে প্রবৃত্ত হইব। হোমরের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধা এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি সাতিশয় অনুরাগ কথিত মতের জনয়িতা হইতে পারে। ভারতের গৌরব হ্রাস করার যত্ন ও কারণ গণ্য হওয়া সম্ভব। নূতন প্রকারের এক আধ ধূয়া উঠাইয়া বাহবা লওয়ার ইচ্ছা ও উক্তরূপ মতের কারণ হওয়া অসঙ্গত হইতে পারে না।

বাল্মীকির রামায়ণ যে ইলিয়ডের নকল নহে, তাহা বুঝিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। ভারতবর্ষের যে আর্য্যাংশ মধ্যে বাল্মীকির রামায়ণ প্রচারিত তথায় যে সেকেন্দার সাহ আসিয়াছিলেন, এমন বুঝা যায় না। ১৬০০ খৃঃ অব্দ হইতে ইংরাজ আমাদের দেশে রহিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয় জন মিল্‌টান্ কাব্য-বিষয় অবগত? গ্রীকেরা পঞ্জাবে আসিয়া যুদ্ধার্থে কিছু কালের জন্য অবস্থিতি করিল, আর বাল্মীকি তাহাদের ইলিয়ডের বিষয় অবগত হইয়া সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করিয়া ফেলিলেন! হাব ভাব বিলাসিনী হেলেন এবং স্বর্গীয় পবিত্রতাময়ী সীতাব সহিত কোনরূপ সাদৃশ্য নাই। পারিস একটা "মেয়েমুখো"—খোস-পোষাকী বাবু। কিন্তু রাবণ জনৈক বীর পুরুষ। মেনিলেয়সের সহিত মহাবীর পরম ধার্ম্মিক শ্রীরামচন্দ্রের তুলনাই হইতে পারে না। রামায়ণের ব্যক্তি সমস্ত আর্য্য আচার, ব্যবহার, ভাব ও ধর্ম্ম সম্পন্ন। ইহার নারীগণ আমাদের কুলস্ত্রী সাধ্বীগণের আদর্শ। রামায়ণের বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রাদি মুনিগণ ইলিয়েডের কোন্ ব্যক্তির কাপি বা ছায়া। তাহা স্থির করা দুরূহ। জিয়াস্ এবং জুনোর অস্থি মজ্জা লইয়া বাল্মীকি রামায়ণের হর পার্ব্বতী গঠিত হইয়াছে একান্ত অসুস্থমনা ভিন্ন অন্যে এরূপ ভাবিতে পারে না। অতুল্য দেবোপম শ্রীরামচন্দ্র এবং অতুল্যা স্বর্গীয়া সীতাদেবী গ্রীক উপাদানে সৃষ্ট কি না তাহা স্থির করিবার ভার মোক্ষমূলার প্রোফেসার স্ভেনার এবং শ্রীমতী আনি বিশান্ত প্রভৃতির হস্তে অর্পণ করা হইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীদীননাথ ধর।

হিন্দুতীর্থ।

উজ্জয়িনী।

আমি ওঁকারনাথ হইতে উজ্জয়িনী যাই। ওঁকারনাথ হইতে উজ্জয়িনী যাইতে হইলে ইন্দোর হইয়া যাইতে হয়। ইন্দোর হইতে উজ্জয়িনী ২৭।২৮ মাইল দূর হইবে। রাজপুতানা ও মালয় রেলওয়ের একটী শাখা উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই স্থান সিন্ধিয়া বা গোয়ালিয়রের মহারাজার অধীন, এখানে ইংরাজ রাজত্ব না থাকায় সহরটী সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবে অবস্থিত করিয়া আপনার প্রাচীনত্বের গৌরব প্রচার করিতেছে।

এই উজ্জয়িনী সহর দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের একটী প্রধান তীর্থ। এখানে অনেক সাধু শান্ত বাস কবিয়া থাকেন। ইহার আর এক নাম অবন্তিকাপুরী। এই স্থানই প্রসিদ্ধ মহারাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। সহরটী একটী উচ্চ ও প্রশস্ত প্রাচীর বেষ্টিত, একটী ক্ষুদ্র নদীর কিনারায় অবস্থিত। এই স্থানের দৃশ্য অতি মনোহর; সম্মুখে প্রাচীর বেষ্টিত সহর, অদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় শ্রেণী ও মধ্য স্থলে রৌপ্য সূত্রবৎ নদী প্রবাহিত হইতেছে। নদী কিনারাটী প্রশস্থ ভাবে ইট ও প্রস্তর দ্বারায় বাঁধান। তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দেবালয় সমূহ শোভা পাইতেছে।

এই সহরের মধ্যে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের কুল দেবতা "মহাকাল" নামক শিবলিঙ্গ অবস্থিত। ইহাঁরই দর্শন জন্য বহুতর যাত্রী সময়ে সময়ে এখানে আসিয়া থাকেন। স্থানীয় ভূমির সমতল ক্ষেত্র হইতে অনেক নিম্নে এই মহাদের স্থান। মহাদেবের দর্শনেচ্ছু যাত্রীদিগকে অন্যান্য তীর্থের ন্যায় এখানেও পাণ্ডাদের হস্তে অনেক ভুগিতে হয়। তাহারা পুষ্প, পুষ্পমাল্য ও বিল্বপত্র প্রভৃতি লইয়া যাত্রীদিগকে বড় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। যাহা হউক এই মহাদেব দেখিতে হইলে কতকগুলি ঘন অন্ধকারময় সোপান সমূহ ভেদ করিয়া নিম্নে অবতরণ করিতে হয়। সেখানে পুরোহিতগণ প্রদীপ জ্বালিয়া, ধুপধুনার গন্ধ বিস্তার করিয়া, আতব চাউল পুষ্প ও বিল্বপত্র দ্বারা মহাদেবের পূজা করিতে করিতে উচ্চৈস্বরে গম্ভীর ভাবে তাঁহারা স্তব পাঠ করিতেছেন। যাত্রীগণ সেই স্থানে টাকা পয়সা

ও সোণা রূপার বিল্বপত্রাদি প্রদান করিয়া নিজ নিজ ইষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রার্থনাদি করিতেছেন। স্থানটীর গাম্ভীর্য্য দেখিয়া মনে একটী অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয় বটে, কিন্তু ইহার সহিত আরও মনে হয় যে সেই অপূর্ব্ব বিশ্বনির্ম্মাতা দেব দেব মহাদেবকে এই সামান্য প্রস্তরখণ্ড কল্পনা করিয়া মনুষ্যেরা কেমন এই অদ্ভুত ভ্রান্তিতে পড়িয়া রহিয়াছে। যাঁহারা প্রতিমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান বলেন তাঁহারা ইহা দেখিতেছেন না যে লোকে এই সোপানকেই আদত বস্তু মনে করিয়া ইহাতেই আবদ্ধ রহিয়াছে! কোটী কোটী লোকের মধ্যে কয়জন লোক এইরূপ সোপান অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন বা পারিতেছেন ?

এই মন্দিরের প্রাচীরের মধ্যে একজন মধ্য বয়স্কা বাঙ্গালী সন্ন্যাসিনী দেখিলাম, তিনি মারহাট্টা রমণীদিগের মত কাপড় পরেন। আলাপ করিয়া জানিলাম তাঁহার বাড়ী গোবরডাঙ্গায় ছিল। তিনি বলেন পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ মহাদেব ও আমি একাই পার্ব্বতি। এই কথাটীর ভাবার্থ সুন্দর হইলেও তাঁহাকে পবিত্র চরিত্রা বলিয়া বোধ হইল না। এখানে ২। ৪ জন সন্ন্যাসী বাস করেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও অবস্থা ভাল বলিয়া বোধ হইল।

এই সহরের প্রায় এক মাইল দূরে নদী কিনারায় "ভর্ত্তৃ হরির গুহা" নামে একটী প্রকাণ্ড গুহা আছে। তাহা এখন মাটীর নীচে অতি অন্ধকার মধ্যে অবস্থিত। সেখানে দুই জন সন্ন্যাসী বাস করেন, আমরা গুহা দেখিতে যাওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রদীপ জ্বালিয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া গুহার সংকীর্ণ পথ দিয়া নিবিড় অন্ধকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গুহাটী বড় বড় প্রস্তরের দ্বারায় নির্ম্মিত, তাহার মধ্যে ১০। ১২টী ছোট ছোট কুঠরি আছে, সেখানে প্রবেশ করিলে পৃথিবীর সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না, বোধ হয় যেন পৃথিবী ছাড়াইয়া কোন এক নির্জ্জন গভীর অন্ধকারময় স্থানে আসিয়াছি। শুনিলাম মহারাজা বিক্রমাদিত্যের ভর্ত্তৃ হরি নামে এক ভ্রাতা ছিলেন, তিনি রাজবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া এই গুহার মধ্যে পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। সেই জন্যই এই গুহার নাম "ভর্ত্তৃ হরির গুহা" নামে পরিচিত হইয়াছে। এই গুহার পাশাপাশি ঐরূপ অন্ধকারময় আর একটী গুহা আছে তাহাও ঐ নামে পরিচিত।

এখানে এক দিন বৈকালে নদীতীরে বেড়াইতে যাইয়া দেখিলাম, তথায় দলে দলে স্থানীয় মারহাট্টা রমণীগণ মারহাট্টি ভাষাতে সঙ্গীত করিতে করিতে পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া একটি পিঠালীর নৈবেদ্যের চারি ধারে নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম ইহাঁরা সকলেই ভদ্র মহিলা, অদ্য নাগ পঞ্চমী, এই নাগপঞ্চমীর দিনে ইহাঁরা এইরূপ করিয়া কৌলিক প্রথা অনুসারে সঙ্গীত ও নৃত্যাদি করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত ইহাঁরা গাহিতেছেন। এখানে স্ত্রীলোকদিগের অবরোধ প্রথা নাই সুতরাং তাঁহারা স্বাধীন ভাবে আপনাপন কার্য্যাদি সম্পাদন করেন এবং পাল পর্ব্বণ উপলক্ষে কৌলিক প্রথানুসারে প্রকাশ্য স্থানে সংগীত ও নৃত্যাদি করিয়া থাকেন এবং আবশ্যকানুসারে পরিচিত অপরিচিত প্রভৃতি সকল পুরুষের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরা আমাদের দেশের পুরুষের ন্যায় কাছা দিয়া কাপড় পরেন। এবং গাত্রে পিরাণাদি পরেন, পেছন হইতে দেখিলে পুরুষ বলিয়া ভ্রম হয়।

পঞ্চবটী।

উজ্জয়িণী হইতে পুনরায় ওঁকারনাথ যাই, তথা হইতে পঞ্চবটী যাই। গ্রেড ইণ্ডিয়ান পেনুনসুলা রেলওয়ের নাসিক নামক ষ্টেসন হইতে এই পঞ্চবটী যাইতে হয়। নাসিক ষ্টেসন হইতে নাসিক সহর প্রায় ৬ মাইল হইবে। এই ৬ মাইল রাস্তা যাইবার জন্য ট্রামওয়ে ও ঘোড়ার গাড়ী উভয়ই পাওয়া যায়। ইংরাজ-রাজত্বে নাসিক এখন একটী সহর ও জেলায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে এই স্থান জঙ্গল ও পাহাড়ময় ছিল। কথিত আছে এখানে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক রাবণ-ভগ্নি সূর্পনখার নাক কাটা হইয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম নাসিক হইয়াছে। আমাদের দেশের লোকদিগের কাশী যেমন মহাতীর্থ, দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের নাসিকও তেমনি মহাতীর্থ। এই নাসিক সহর "গোদাবরী" নামক প্রসিদ্ধ নদীর তীরে অবস্থিত, ইহার অপর পারে পঞ্চবটী নামক স্থান। এ পঞ্চবটী দেখিয়া রামায়ণে উল্লিখিত পঞ্চবটীর কথা মনে হয় না, কেন না এ পঞ্চবটী এখন একটী সহর হইয়াছে। বড় বড় প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির সমূহ ও মারহাট্টা ধনিদিগের অট্টালিকা পুঞ্জে পরিপূর্ণ। যাহা হউক এই স্থানের এই গোদাবরী নদীর দৃশ্যটী অতি সুন্দর, এক পারে নাসিক ও অপর পারে

পঞ্চবটী, মধ্যখান দিয়া গোদাবরী নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং নদীর গর্ভমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবালয়াদ নির্ম্মিত হওয়ায় অতি সুন্দর দৃশ্য হইয়াছে। এখান হইতে এক মাইল দূরে তপোবন, তাহাও প্রায় সহরের ন্যায়, তবে সেখানে বহুল পরিমাণে রামসীতার মন্দির ও তথায় সন্ন্যাসীগণই থাকেন। বলা বাহুল্য এখানকার পাণ্ডারা সীতামাইর কুঠির, লক্ষ্মণের কুঠির, সূর্পনখার নাক ইত্যাদি বলিয়া যে সমস্ত স্থান ও দ্রব্যাদি দেখান তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হইল না। এখানে আমি অল্প সময় ছিলাম বলিয়া স্থানীয় সন্ন্যাসীদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার সুযোগ হয় নাই। পরে এখান হইতে বোম্বাই যাই।

পুষ্কর।

বোম্বাই সহরে কয়েক দিন থাকিয়া বরদা যাই এবং বরদা হইতে আজমীর আসি। এই আজমীর সহর হইতে পুষ্কর তীর্থ ৬।৭ মাইল হইবে। এখান হইতে পুষ্কর যাইতে হইলে একা নামক গাড়ী পাওয়া যায়। আজমীর হইতে পুষ্কর যাইবার পথে প্রায় ১ মাইল ব্যবধান একটা পাহাড় অতিক্রম করিতে হয়, এই পাহাড়ের উপর হইতে আজমীর সহর অতি মনোহর দেখায়।

যে স্থানে পুষ্কর তীর্থ অবস্থিত তাহার প্রায় চারি দিকেই পাহাড়, সেই পাহাড় সমূহের কয়েকটী আবার বালুকাময়। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। পুষ্কর তীর্থ আর কিছুই নহে, চারি দিকে দেবালয় পরিপূর্ণ একটী বিস্তির্ণ সরোবর। এই সরোবর কাহারও কর্তৃক খোদিত নহে, ইহা পাহাড় পরিবেষ্টিত একটী স্বাভাবিক ক্ষুদ্র হ্রদ। এই পাহাড় ও মরুময় নির্জ্জন প্রদেশ মধ্যে এইরূপ একটী স্বাভাবিক ক্ষুদ্র হ্রদ থাকায় স্থানের সৌন্দর্য্যতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সেই কারণেই বোধ হয় ইহা একটী হিন্দুতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই হ্রদের জলে স্নান করিবার জন্যই নানাদেশ হইতে হিন্দু যাত্রীগণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। এক্ষণে হ্রদের জল দুর্গন্ধময় ও তাহার মধ্যে সবুজ বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্বের ন্যায় পদার্থে পরিপূর্ণ। স্থানীয় পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগের নিকট হইতে অর্থ লইয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক এই হ্রদে স্নান করাইতেছেন এবং যাত্রীগণ আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে স্নান করিয়া আপনাদিগকে কৃত কৃতার্থ মনে করিয়া প্রত্যাগত হইতেছেন। আমি এখানে অল্প সময় ছিলাম, ইহার মধ্যে কোন সাধু সন্ন্যাসীকে দেখিলাম না, ফলে এখানে স্থায়ীভাবে কোন সাধু সন্ন্যাসী অবস্থিতি করেন না।

শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন।

ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

২য় ভাগ—১১শ সংখ্যা। ফাল্গুন—১৩০১

পূর্ণিমা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন।

সূচী।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

হুগলী।

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফাল্গুন—১৩০১।

এই সংখ্যার মূল্য ৴১০ দেড় আনা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে পূর্ণিমার দিনে প্রকাশিত হয়। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়াছেন। যাহাতে ইহা স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন আছে। এই পত্রিকা যাহাতে সকলের সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন তজ্জন্য ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাসুল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনার জন্য পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

বিজ্ঞাপন।

হুগলীর চকে সাবিত্রী যন্ত্র নামে একটী ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী বহু প্রকার নূতন অক্ষর আছে এবং কলিকাতার দরে পুস্তকাদি ছাপান হইতেছে। বিশেষ সুবিধা এই, গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে, প্রুফ সংশোধনের ভার রীতিমত লওয়া হইয়া থাকে। চিঠিপত্র চেক দাখিলা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জবওয়ার্ক সুলভ মূল্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাপান হইয়া থাকে। আমাকে লিখিলে বিশেষ বিবরণ সকলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল
ম্যানেজার।
হুগলী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় ভাগ। } ফাল্গুন, সন ১৩০১ সাল। { ১১শ সংখ্যা

মধুময়ী গীতা।

চতুর্থ অধ্যায়—জ্ঞানযোগ।

শ্রীভগবান কহিলেনঃ—

আদিত্যে অক্ষয় যোগ কহিলাম যাহা,
স্বপুত্র মনুকে সূর্য্য কহিলেন তাহা;
পুত্র ইক্ষ্বাকুকে মনু বলিলেন পরে; ১
রাজর্ষিরা এই যোগ পান পরম্পরে।
সেই যোগ পরন্তপ নষ্ট কালবশে। ২
ভক্ত তুমি, সখা মোর, তাই ভাবাবেশে
সেই যোগ কহিলাম তোমায় সুমতি,
অত্যুত্তম গূঢ়তত্ত্ব পুরাতন অতি। ৩

অর্জ্জুন কহিলেনঃ—

আদিত্যের জন্ম পূর্ব্বে, তব জন্ম পরে,
সূর্য্যকে কহিলে কৃষ্ণ যোগ কি প্রকারে? ৪

শ্রীভগবান কহিলেনঃ—

তোমায় আমায় পার্থ বহু জন্ম গত,
আমার বিদিত, তুমি অবিদ্যা আবৃত। ৫
জন্মহীন অবিনাশী জীবের ঈশ্বর

হইয়াও হই আমি আত্ম মায়া পর,
জন্ম গ্রহণ করি আত্ম-প্রকৃতিতে ;
প্রকৃতিতে আমি পার্থ, প্রকৃতি আমাতে। ৬
ধর্ম্মনাশ পাপবৃদ্ধি যখন যখন,
তখনই করি আমি শরীর ধারণ। ৭
পাপীর প্রলয় আর সাধুর উদ্ধার
করিবারে, যুগে যুগে হই অবতার। ৮
স্বেচ্ছাকৃত জন্ম এই, পালন-কৌশল
জানিলে আমারে, পার্থ, পায় মোক্ষফল। ৯
বীতরাগ ভয়-ক্রোধ আত্ম পরায়ণ
অনেকে আমার ভাব করেছে গ্রহণ। ১০
আমার ভজনা কিন্তু যে যে ভাবে করে ;
সেই ভাবে অনুগ্রহ ক'রি আমি তারে।
আমারি ভজন মার্গে আসিছে সকল। ১১
ফলাকাঙ্ক্ষী পূজে দেব শীঘ্র পায় ফল। ১২
সৃজিয়াছি চতুর্ব্বর্ণ্য কর্ম্ম অনুসারে ;
অব্যয় অকর্ত্তা আমি কিন্তু এ সংসারে। ১৩
কর্ম্মাশক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা নাহিত আমার,
যেজন শিথিল হয় কর্ম্ম বন্ধ তার। ১৪
অহঙ্কার শূন্য কর্ম্মে না হয় বন্ধন,—
জানিয়া জনক আদি যত ঋষিগণ
করেছেন কর্ম্ম তাঁরা ; তুমিও এখন
কর তা' যা' করেছেন পূর্ব্বতনগণ। ১৫
কিবা কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম ? বিবেকী সকল
না পারি করিতে স্থির বিহ্বল কেবল !
যে কর্ম্ম জানিলে হবে বিমুক্ত বন্ধন,
সে কর্ম্ম তোমায় পার্থ বলিব এখন। ১৬
বিহিত, নিষিদ্ধ কর্ম্ম, অবিহিত আর—
দুর্জ্ঞেয় কর্ম্মের গতি ,—এ তিন প্রকার। ১৭

আরাধনা কর্ম্ম নয় § বন্ধ শূন্য বলি ;
বিহিত কর্ম্ম না করা অকর্ম্ম সকলি ,—
অকর্ম্মেই বন্ধন হয় ; অকর্ম্মই কর্ম্ম !*
আরাধনাদির কর্ম্মে মগ্ন যোগীজন ,
সর্ব্বদাই কর্ম্ম শূন্য কর্ম্ম পরায়ণ ! ১৮

ফলাকাঙ্ক্ষা নাই যাঁর, কহে বুধগণ,
জ্ঞানাগ্নি-বিদগ্ধ কর্ম্মা পণ্ডিত সেজন। ১৯
নিরাশ্রয় তৃপ্ত তিনি, যে কর্ম্ম ধরেন,—
বিহিত বা স্বাভাবিক—কিছু না করেন। ২০
করিয়া সামান্য কর্ম্ম নিষ্কাম যেজন—
দেহযাত্রা উপযোগী পাপভাগী ন'ন। ২১
যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্ট সহিষ্ণু যেজন,
সিদ্ধ্যসিদ্ধি সমজ্ঞানে কর্ম্ম পরায়ণ ; ২২
তাঁর কর্ম্মে বন্ধ নাই। নিষ্কাম যে হয়,
ঈশ্বরার্থে কর্ম্ম করে, কর্ম্ম পায় লয়। ২৩
যজ্ঞ পাত্র ব্রহ্ম যাঁর, ঘৃত ব্রহ্মজ্ঞান,
ব্রহ্মাগ্নিতে ব্রহ্ম হোম, ব্রহ্ম তিনি পান। ২৪
দৈব যজ্ঞ করে কর্ম্মী জ্ঞানযোগিগণ
করে সদা ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞ সম্পাদন ; ২৫
নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী করে অবস্থান
ইন্দ্রিয় নিরোধ করি, সংযম প্রধান ;
গৃহস্থ বিষয় ভুঞ্জে অনাসক্ত মনে ; ২৬
ধ্যাননিষ্ঠ প্রাণেন্দ্রিয় রত সংযমনে। ২৭
দান-তপ-যজ্ঞ কেহ যোগ-যজ্ঞকারী,
কেহ বা স্বাধ্যায়-জ্ঞান-যজ্ঞ-সমাচারী। ২৮
কেহ বা অপানে প্রাণ করেন সমাধি ;
কেহ প্রাণে করে হোম প্রাণাপান রোধি। ২৯

§কর্ম্ম নয় অর্থাৎ অকর্ম্ম। *গুরুগম্য।

আহার সংযম করি, কোন কোন জন
প্রাণে হোম করে, দিয়া জীর্ণেন্দ্রিয়গণ।
এই সব যজ্ঞবিদ যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে
মুক্ত হন, পুণ্য লভি যজ্ঞান্ন ভোজনে। ৩০
ধর্ম্ম কর্ম্ম শূন্য হয় যজ্ঞহীন নরে
না পায় ঐহিক সুখ, পারত্রিক দূরে। ৩১
বেদব্যক্ত বহুযজ্ঞ, কর্ম্মজ সকল,—
হেন জানি জ্ঞান নিষ্ঠ বিমুক্ত কেবল। ৩২
জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ পার্থ দ্রব্য যজ্ঞ হতে,
ফল সহ সর্ব্ব কর্ম্ম রয়েছে জ্ঞানেতে। ৩৩
প্রণিপাত প্রশ্ন সেবা করি লভ জ্ঞান,
তত্ত্বজ্ঞেরা উপদেশ করিবেন দান। ৩৪
হে পাণ্ডব সেই শিক্ষা হ'লে এক বার,
পুনঃ হেন মোহ প্রাপ্তি হবে না তোমার ;
আত্মাতে হইবে সব অভেদ দর্শন,
আমাতে তোমার আত্মা হইবে মিলন। ৩৫
সর্ব্বপাপী হতে যদি মহা পাপী হও,
জ্ঞান পোতে পাপার্ণব পথে চলি যাও। ৩৬
জ্ঞানাগ্নিতে কর্ম্ম কাষ্ঠ ভস্মসাৎ করে, ৩৭
পবিত্র জ্ঞানের তুল্য নাই এ সংসারে,
যোগ্য পাত্র আত্মজ্ঞান যথাকালে পায়,
কর্ম্ম যোগে ; কর্ম্ম কর জ্ঞান অপেক্ষায়। ৩৮
শ্রদ্ধাবান জিতেন্দ্রিয় একনিষ্ঠ জন
জ্ঞানলাভ করি শীঘ্র মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ৩৯
অনভিজ্ঞ শ্রদ্ধাহীন, সন্দেহ যাহার,
ইহ পরলোকে সুখ কিছু নাহি তার। ৪০
যোগপথে কর্ম্ম যার ঈশ-সমর্পিত,
নিঃসংশয় আত্মজ্ঞান যাঁহার উদিত,
কর্ম্মেতে আবদ্ধ তাঁরে নাহি করে আর। ৪১

যে সংশয় ধনঞ্জয় করিছে আত্মার
আচ্ছাদন, জ্ঞান খড়্গে তারে ছিন্ন কর ;
উঠ পার্থ, তত্ত্বোপায় কর্ম্মযোগ ধর। ৪২

ইতি ৪র্থ অধ্যায়—জ্ঞানযোগ।

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।

রামায়ণ আর্য্যদের মহাকাব্য এবং মূলতঃ বাল্মীকিকৃত কি না তদ্বিষয়ে দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

প্রায়েম্ পুত্র পারিস। গ্রীক রাজ মেনিলিয়সের গৃহে আতিথ্য সৎকার গ্রহণে তথায় অবস্থিতি কালে তাঁহার অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ পাইয়া তাঁহার পত্নী হেলেন সহ ট্রয়ে পলায়ন করেন। দারোদ্ধার এবং বিশ্বাসঘাতীর দণ্ডবিধান করিবার জন্ম মেনিলিয়স্ প্রভৃতি গ্রীক্ ভূপালগণ ট্রয় আক্রমণ করেন এবং দশ বৎসর যুদ্ধের পর ট্রয় বিধ্বস্ত হয়। আখ্যানাংশে রামায়ণের ইলিয়ড সহ এইটুকু সাদৃশ্য থাকা হেতু কতকগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিত প্রথমোক্ত কাব্য দ্বিতীয়ের নকল মাত্র এইরূপ বলেন। যাহারা এই অদ্ভুত মতের পক্ষপাতী তাহাদের বিষয় ভাবিলে হৃদয়ের বিস্ময় রস প্রায় বিশুষ্ক হয়। আমি কোন সময়ে জেলা বগুড়ায় ওকালতি করিতাম। তথায় শশধর বক্সী নামক জনৈক মুসলমান মোক্তার ছিলেন। আমার নাম দীননাথ ধর। আমি কি জাতি, কয়েক ব্যক্তির মধ্যে ইহার আন্দোলন উপস্থিত হইলে, এক ব্যক্তি বলেন "শশধর আর দীন ধর" একই জাতি। এই ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে আসন পাইবার যোগ্য।

শ্রীরামচন্দ্রের অন্তর বাহে গ্রীক্ ও ম্লেচ্ছ কোন কিছুই নাই। তাহাতে যা কিছু দৃষ্ট হয়, সমুদয় ভারতীয় ও বেদ পুরাণ সম্মত। মেনিলিয়স এগেমেমনন্ হেকটর। এবং একিলিসেসের মূর্ত্তি নয়নাগ্রে রাখিয়া বাল্মীকি দাশরথির সৃষ্টি করিয়াছেন, একান্ত বীতচিৎ ভিন্ন অন্যে এরূপ কথন মনে করিতে পারেন না। হেলেনা অন্তঃকীট কর্ত্তিত, পঙ্কে পতিত, সৌরভ বিরহিত পচা বিকৃত

গোলাপ; আর সীতা চন্দন-চর্চ্চিত বিশুদ্ধ সৌরভশালী প্রফুল্ল-দল শ্বেত পারিজাত পুষ্প। মেনিলিস্‌ মহিলা পাপ পূতিগন্ধ পূর্ণা, জনক দুহিতা স্বর্গীয় সৌরভ ও পরম পবিত্রতার আধার। মৈথিলীর হস্ত পদের নখাগ্র মাত্র লইয়া এক একটি আদর্শ নারী বিরচিত হইতে পারে। ম্লেচ্ছ মহিলার কোন কিছুই লব মাতার দেহ মনে নাই। তাঁহারও অন্তর বাহ্য কেবল পবিত্র আর্য্য উপাদানে নির্ম্মিত। হেকটার্‌ পত্নী এণ্ডামাকী তাঁহার পদতলে বসিবার যোগ্যা, কিন্তু হেলেন অলক্তক রসে তাঁহার সেই পদ রঞ্জিত করিবার ও অনধিকারিণী। কপির কটির নিম্নদেশস্থ লাল গোলাকার ভাগের আদর্শে পূর্ণ বিধুর সৃজন সম্ভবপর হইলে ও হইতে পারে, কিন্তু হেলেনকে লক্ষ্য করিয়া পরম দেবোপম স্বর্গীয়া সীতা মূর্ত্তি ও সীতা চরিত্রের গঠন একান্ত অসম্ভব।

শ্রীরামচন্দ্র ভারতীয় আর্য্য মহাপুরুষ। তিনি কবি কল্পিত পরাকৃত (ideal) ব্যক্তি নহেন। তিনি অযোধ্যায় দশরথের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া স্বকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক নরদেহ বর্জ্জন করেন। রামায়ণের আদি কাণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে বাল্মীকি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ঋষিবর নারদ তাঁহাকে বলেন:—"তোমার জিজ্ঞাসিত সমস্ত গুণ যুক্ত ও অন্যান্য বহু গুণ বিশিষ্ট এক ব্যক্তি ইক্ষ্বাকু বংশে সম্ভূত হইয়াছেন, তাহার নাম রাম।" দাশরথি যে ভারতীয় এবং আমাদিগের ন্যায় রক্ত মাংসের শরীর বিশিষ্ট ছিলেন, রামায়ণ তাহার অন্যতর প্রমাণ। তিনি যে সরযূ তীরে জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় এবং হিন্দু মাত্রে এ কথা বিশ্বাস করেন। তোমার আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ভবতলে লীলাখেলা করিয়া গিয়াছেন, আমরা যেরূপ স্থির ও নিশ্চিত রূপ বিশ্বাস করি, শ্রীরামচন্দ্র এবং জানকীর কথা হিন্দু নর নারী মাত্রে সেইরূপ বিশ্বাস করেন। চিত্রকূট পঞ্চবটী নাসিক সেতবন্ধ রামেশ্বর এবং সিংহলে দাশরথি জীবন ঘটিত অনেক কথা আজিও তৎ তৎ স্থানীয় লোকে প্রকৃত ব্যাপারের ন্যায় সন্ধ্যা সকালে কহিয়া থাকে। বস্তুতঃ শ্রীরামচন্দ্র মানব শরীর ধারণ পূর্ব্বক রামায়ণ কীর্ত্তিত প্রদেশ এবং স্থান সমূহে আমাদিগের ন্যায় জন্ম গ্রহণ করিয়া কার্য্যাদি না করিলে, এরূপ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং দশরথ সুত শ্রীরামচন্দ্র

যে ভবতলে অবতীর্ণ হইয়া, তথায় লীলাখেলা করত সময়ে স্বধামে গমন করেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

রামায়ণের উত্তর কাণ্ড পাঠে অবগত হওয়া যায়, শ্রীরাম তনয় কুশ কোশল এবং লব উত্তর কোশল রাজ্য প্রাপ্ত হন। কোশল খণ্ড অযোধ্যা এবং উত্তর কোশল নেপালের নিম্ন প্রদেশ। শ্রীরাম কনিষ্ঠ ভরতের পুত্র তক্ষক তক্ষশিলা দেশ প্রাপ্ত হন। এই তক্ষশিলা হইতেছে ট্যাক্‌শিলা (Taxila)। সেকেন্দার সাহ ভারতবর্ষের এই পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন এবং ক্যানিংহাম্ সাহেব এই প্রদেশে তাঁহার বিউসিফিলাস্ অশ্বের সমাধি স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন, এইরূপ প্রবাদ। উদয়পুরের রাণা সূর্য্যবংশ সম্ভূত। শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর বলিয়া ইনি আপনাকে দৃঢ় বিশ্বাস করেন। ভারতীয় ভূপাল বৃন্দের মধ্যে তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদানে ইংরাজ অসম্মত হওয়ায় রাণা সাহেব ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত দিল্লী দরবারে উপস্থিত হন নাই। রাণা সাহেব কলিকাতায় আগমন করিলে তাঁহার সম্মানার্থ ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গ হইতে কয়েকটি তোপধ্বনি হইত। কথিত দরবারে উপস্থিত না হওয়ায় ঐ সময় হইতে রাণা সাহেব উক্তরূপ সম্মানে বঞ্চিত হইয়াছেন। আপনাকে শ্রীরাম বংশধর ভাবিবার রাণা সাহেবের গূঢ়তর কারণ না থাকিলে, তিনি উক্তরূপ কার্য্য করিবেন কেন? এই সকল এবং অন্যান্য কারণেও বুঝা যায় যে বাল্মীকি বর্ণিত শ্রীরামচন্দ্র বস্তুতঃ সরযূ তীরবাসী এবং রাবণ বিধ্বংসী ছিলেন, কবি কল্পিত চরিত্র মাত্র নহে রক্ত মাংসের শরীরে অবতীর্ণ হইয়া অযোধ্যা হইতে সিংহল অবধি স্বীয় কার্য্য গরিমায় লোককে চকিত এবং ঐ সমস্ত দেশ চরণ স্পর্শে পবিত্র না করিলে হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং পঞ্জাব হইতে ব্রহ্মপুত্র তীর পর্য্যন্ত নররাজি মানবাবতাররূপে শ্রীরামচন্দ্রকে কখন বিশ্বাস করিত না।

হিন্দু শাস্ত্রের দশ অবতারের কথা কল্পনা প্রসূত অথবা গল্প মাত্র নহে। গল্প হইলে ভগবান অতি নিকৃষ্ট পশু বরাহ হইয়াছিলেন, শাস্ত্রকারেরা এরূপে আপনাদের কল্পনা শক্তির কখন সঞ্চালন করিতেন না। সৃষ্টি এবং সমাজের ক্রম স্পষ্ট প্রকাশমান। আমাদের শাস্ত্রানুসারে সৃষ্ট্যানুক্রমে আবশ্যক মত ভগবান আপনাকে নানারূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ডারুইনের মতে তুমি আমি একবারে মানুষ হই নাই। দশ অবতারেও

এই তত্ত্বের বিকাশ। সৃষ্টি করণেচ্ছু এবং সৃজনশীল ভগবান প্রথম মৎস্য, পরে কূর্ম্ম, তৎপরে বরাহ তাহার পর নরসিংহ এবং তদন্তে খর্ব্বাকৃতি বামন হইয়াছিলেন। ভগবান বামন হইয়া পরে কুঠারধারী পরশুরাম, তাহার পর ধনুর্ধারী রাম এবং তৎপরে হলধারী বলরাম হইয়াছিলেন। ইংরাজ পণ্ডিতের দোহাই দিলেই আমাদের কথার আদর হইবার সম্ভাবনা সেজন্য বলিতেছি যে এই সমস্ত কথা ডারুণের ও অন্যান্য ইংরাজ বিজ্ঞান-বিতের অভিপ্রায় সম্মত। ডারুণের মতে সৃষ্টির ক্রম এইরূপ এবং একান্ত অসভ্যাবস্থা হইতে মানব উপস্থিত সভ্যাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, ইহাও ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত। পরশুরাম কুঠারধারী বুনো পুরুষ, শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্ধারী তীরেন্দাজ শিকারী এবং বলরাম লাঙ্গলধারী কৃষক বুদ্ধ কিন্তু পরম জ্ঞান সম্পন্ন সমাজ সংস্কারক। ভগবানের এই সকল অবতারে মানব সমাজের অবস্থার ক্রম অনুসূচিত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে দশ অবতারের কথা প্রকৃত ঘটনা মূলক ও পরাকৃত (ideal) নহে। প্রবন্ধের এই সকল কথাতেও রামায়ণ যে ইলিয়ডের প্রতিচ্ছায়া নহে তাহাও প্রতীয়মান।

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত হইয়াছে যে অশোক বংশ সম্ভূত দামোদর ভূপাল অভিশপ্ত হইলে শাপ মুক্ত হইবার কারণ এক দিনে সমস্ত রামায়ণ শুনিবার জন্য উপদিষ্ট হন। গোল্ডষ্টুকার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে রাজা দামোদর খৃষ্টের ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। ভাগবতাদি পাঠ শ্রবণে পাপ ও কঠোর পীড়া মুক্ত হওয়া যায়, লোকের এই বিশ্বাস। রামায়ণ রাজা দামোদরের বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়া প্রচলিত থাকাই একান্ত সম্ভব। কয়েক দিন মধ্যে তাহা বেদ পুরাণ সম পবিত্র ও অঘ নাশকারী ধর্ম্ম সম্পন্ন হয় নাই। শত শত বৎসর সমাজে থাকিয়া তৎপরে যে রামায়ণ উক্তরূপ পবিত্রতা লাভ করে এবং পাপ তাপ হর্ত্তা হইয়া উঠে, ইহাই একান্ত সম্ভব। খৃষ্টের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে সেকেন্দার সাহ আটকে উপস্থিত হন এবং কয়েক মাস মাত্র তৎপ্রদেশে থাকেন। গ্রীক্ সহ আর্য্যদের এই প্রথম সংমিলন। সেকেন্দার সাহ তক্ষশীলা প্রদেশে অবস্থিতি কালে লড়াই ঝগড়া লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। তথাপি বিবরাদি পণ্ডিতবর্গ আমাদের বারম্বার বলিতেছেনঃ—

"বাল্মীকি সেকেন্দার সাহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। গ্রীক্ ভাষায় ইলিয়ড্ পাঠ হইত এবং তিনি তাহা শ্রবণ করিতেন এবং বুঝিতেন। সাহ মজকুরের ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পরই তিনি সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন এবং অনতি বিলম্বে তাহা শাপ ও পাপ মোচনের মহৌষধ স্বরূপ হইয়া উঠে এবং রাজা দামোদর তাহার পাঠ শ্রবণে শাপ মুক্ত হন।" এ কথার পর আমাদের চুপ থাকাই বিধেয়।

এই সঙ্গে আর একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। জয় বিজয় বৈকুণ্ঠের দ্বারী স্বর্গবাসী ছিলেন। ব্রাহ্মণকে উপেক্ষা করায় তাঁহারা অধঃপতিত হইয়া মানবযোনি প্রাপ্ত হন। এই জয় বিজয়, রাবণ কুম্ভকর্ণ রূপে লঙ্কা দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। আমাদের রামায়ণের এই একটি মূল কথা। মহারাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় হইতে ইংরাজ আমাদের দেশে আছেন। ইংরাজের (Paradise Lost) মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে যে সয়তান (Satan) ও পূর্ব্বে স্বর্গবাসী ছিলেন। সয়তান অহং জ্ঞানে স্বর্গচ্যুত হইয়া প্রথমতঃ নরক তৎপরে ধরাতলে আসিয়া মানব জাতির অনিষ্ট সাধনে ব্যাপৃত হন। রাবণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অনিষ্টে রত হইয়াছিলেন এবং আমাদের শাস্ত্রানুসারে মানব সমষ্টি ভগবান ছাড়া নহে। এই সকল কারণে অতি প্রাচীন পুরাণোক্ত জয় বিজয় আখ্যান (Paradise Lost) মহাকাব্যের নকল, বিবরের ন্যায় কোন পণ্ডিত মুখে এইরূপ কথা বাহির হওয়াও বিচিত্র নহে।

যে সকল তর্ক দ্বারা বিবরাদি পণ্ডিতগণ রামায়ণ ইলিয়ডের নকল ইহা সংস্থাপনে যত্নশীল তাহা একান্ত অসার এবং বালকোচিত। দুইটি বিভিন্ন ব্যক্তির একরূপ ভাবনা এবং চিন্তা করা বিচিত্র নহে। এক রূপ দুইটি ঘটনা একই অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন জাতি মধ্যে ঘটিতে না পারার কোনও কারণ নাই। ভারতবর্ষে রাবণ কর্তৃক সীতা হৃত হইলে মুনিবর বাল্মীকি সেই ব্যাপার অবলম্বনে রামায়ণের সৃষ্টি করেন। হেলেনকে পারিস্ চুরি করিয়া লইয়া গেলে এই ঘটনাশ্রয়ে কবিবর হোমরের ইলিয়েড্ রচিত হয়। বাল্মীকি ও হোমর নিজ নিজ দেশস্থ ঐ ঐ ঘটনা অবলম্বনে আপনাদের রচনা শক্তির সঞ্চালন করিয়াছিলেন। এই সহজ

স্বাভাবিক ও সঙ্গত সিদ্ধান্ত না করিয়া অতি পবিত্র চরিত্র জনৈক মুনি ও মহাকবির প্রতি চৌরাপবাদ দেওয়া অতীব অন্যায়।

বিবরাদি পণ্ডিতদের দ্বিতীয় কথা এই যে রামায়ণ বৌদ্ধ গ্রন্থ ও গল্প বাল্মীকি মুনির নহে। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্প নকুলের ভাব। পরম শত্রু পক্ষের কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া বিপ্রবর বাল্মীকির রামায়ণ রচনা করা কোনও প্রকারে সম্ভবপর নহে। দেখা যায় বৌদ্ধদের সীতা রামের ভগ্নী। ভগ্নী সহ ভ্রাতার বিবাহ হিন্দু শাস্ত্র নিষিদ্ধ। এই বিবাহ পাপকর্ম্ম বলিয়া ঋক্‌বেদে কথিত হইয়াছে। বৌদ্ধ রাম সীতা মধ্যে এরূপ শাস্ত্র বিরুদ্ধ সম্বন্ধ থাকায় বৌদ্ধ রাম যে ব্রাহ্মণদের একান্ত অস্পৃশ্য তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর টেলাঙের কথাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। রাম সীতার আখ্যান অতি প্রাচীন এবং রামায়ণ আর্য্য ব্রাহ্মণদের পুঁথি। বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাওয়া কালে অতি পবিত্র রাম সীতা আখ্যান আপনাদের সঙ্গে লইয়া যাওয়াই সম্ভব এবং সঙ্গত অনুমান। বৌদ্ধ সীতা রামচন্দ্রের ভগ্নী এইরূপ হওয়া সম্ভব। বাল্মীকির সীতা জনক দুহিতা। শ্রীরামচন্দ্র জনক দুহিতাকে বিবাহ করেন। এই কথা ধরিয়া কালে এবং স্থানান্তরে সীতা রামের সহোদরা হইয়া থাকিবেন।

শ্রীদীননাথ ধর।

বড়দিনে বঙ্গ-সাহিত্য।

['শিলং সাহিত্য-সভা'র সমালোচনী শাখা হইতে নির্গত।]

বড় দিনের 'বাহবা' লইতে প্রতি বৎসর বিলাসিতার বিপুল আয়োজন হইয়া থাকে। তাহা বরং বিবি-সাহেব অপেক্ষা বাবু-সাহেব মহলেই বেশী বেশী। পূজনীয় 'পঞ্চানন্দ' মহাপ্রভু 'প্রাচীন' বয়সে, সম্ভবতঃ, বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া পড়িয়াছেন, তাই সেই পুরাতন প্রথানুসারে শারদীয় দুর্গোৎ-সবের সময়েই সাদার উপর কালি চড়াইয়া কতকগুলা 'বেয়াদবি' করিয়া বসেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের 'বড় দিন' নামক এই মহা পর্ব্বের খোঁজ খবর বড় রাখেন না। তিনি না রাখুন বড় দিনের 'বেজায় আওয়াজ'

দিগন্তব্যাপী সহর মফস্বল সর্ব্বত্রই এই সুযোগে হাসির হর্‌রা, গানের গর্‌রা, আর উৎসবের ফোয়ারা ছুটিয়া থাকে। রাজা-রাজড়া হইতে হ্যাক্‌নী ক্যারেজের কোচম্যান পর্য্যন্ত কেহই এই শীতোৎসবের রস-তরঙ্গে বিভোর হইতে পশ্চাৎপদ হয়েন না। কলিকাতাতেই এই কলি যুগে ধর্ম্মময় ভারত ভূমির কর্ম্মক্ষেত্র, ইহাই সে কারণ কলির এই প্রধান ধর্ম্মোৎসবের কেন্দ্রস্থল; রাজা, মহারাজা, মুন্সেফ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কৌন্সিলের মেম্বর, মফস্বলের কেরাণী সকলেই সানন্দে এই সন্ধিস্থলে সমাগত হয়েন এবং "গ্রেট ঈষ্টারণ" নামক মহামন্দিরের সায়াহ্ন-শোভা সন্দর্শন করিয়া চরিতার্থতা লাভ করেন। মদ্য হইতে ম-কারের চূড়ান্ত, কচুরি হইতে কেক্ পর্য্যন্ত, পূজার সমগ্রীর সুবন্দোবস্ত প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে, সুচিক্কণ কাঞ্চন মূল্যে তদভাবে রজত খণ্ডে দক্ষিণান্ত করিয়া মহাভোগ উপভোগ করিলেই হইল। পূজান্তে নৃত্য গীতের আয়োজনও অগণন;— ঘোড়ার নাচ হইতে ব্যাঘ্র ভল্লুক ও হস্তীর নাচ, সাহেব-বিবি-মহলে ফ্যান্সী ড্রেসের সুন্দর নাচ, আর বাস-রসিক প্রেমিকের প্রমোদ উদ্যানে রাশি রাশি বিলাসিনীর নাচ। এই নৃত্য গীতের স্রোত রঙ্গ-ক্ষেত্রেও প্রবল ভাবে প্রবহমান,—এই স্রোত প্রবাহে মৃতপ্রায় 'মকরত' ও সঞ্জীবিত 'আবু হোসেনে'র উদ্ভট লীলায় রঙ্গ-রস উৎসারিত, আর মিনার্ভা'র 'অজ্ঞাতবাসে' রুচিধ্বজীদিগের মুখ-কমল মলিনীভূত। এই মহাপূজার মূলমন্ত্র একাকার! ভক্তগণ ভক্তিভরে অনুক্ষণ ভিক্ষা করিতেছেন 'একাকার' এই একাকারের আভিধানিক সাধুভাষা 'সাম্য'; সাম্য-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বাধীনতা রক্ষার সুচেষ্টাই এই পূজার উদ্দেশ্য। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান, ধোবা, কলু, মুসলমান, বালক, বৃদ্ধ, বিবিজান, সকলে সমসূত্রে মিত্রতাবদ্ধ হইয়া শয়ন ভোজন উপবেশন করুন, প্রেমময়ের রাজ্যে অবাধে বিচরণ করুন, সম্বন্ধনির্ব্বিশেষে সোদরত্ব সংস্থাপন করুন, আপনার মহাপূজার মহোদ্দেশ্য সফল হইবে, নির্ব্বিকল্পে নিরাকারের নবীন চরণে নিমজ্জিত হইতে পারিবেন, বিপর্য্যয় যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আর লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিতে হইবে না। প্রাচীন মহাজনেরা বলিয়াছেন—(Out of evil cometh good) কাল বিপর্য্যয়ে এখন দেখিতেছি, ইষ্ট হইতেই অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কুক্ষণে এই মহাপূজার মূলমন্ত্র আরসিক

অমৃতলালের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, তিনি দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন—সব একাকার! তাঁহার মস্তিষ্ক ঘুরিয়া গেল, যোড়া-তাড়া দিয়া গড়িয়া বসিলেন—একাকার!!! তাহাতেও মন প্রবোধ মানিল না, বড় দিনের আসরেই জীবন্ত ছবি দেখাইলেন একাকার!!! এখন এই একাকারের মোহন চিত্রে আমরাও 'দিশেহারা' হইয়া পড়িয়াছি, তাই কালি কলম নষ্ট করিয়া আসলের উপব 'কারসাজি' করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বহুদিন হইল, ১২৯৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে, বঙ্গের জনৈক রসজ্ঞ বিজ্ঞ লেখক বলিয়াছিলেন—

"আমার মনটা 'মেকি'। মনের ভাব গুলার অনেক গুলাই আসল নয়, নেহাত নকল। আমার এ যুগের জীবনটা সাড়ে পনর আনা রকম জাল। আমি একটা জীবন্ত পদার্থ সন্দেহ নাই; কিন্তু কোন কালেই আমি জীবন্ত নাটক নহি। সকল সময়েই আমি জীবন্ত 'প্রহসন'। আমি Test, কাজেই আমি প্রহসন। যদি Earnest হইতাম, তবেই নাটক হইতাম। আমাকে চিত্রিত করুন, নিম্ন শ্রেণীর নাটক হইবে না; কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর প্রহসন হইবে। হইতেছেও তাই। "সধবার একাদশী" হইয়াছিল, "বিবাহ-বিভ্রাট" হইয়াছে। যেমন গতিক এখনও অমন অনেক হইবে।"

লেখক পরিণামদর্শী বটে,—অনেকে না হউক, দুই এক মাস উচ্চ শ্রেণীর প্রহসন আমরা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই; আরও যে কালক্রমে পাইব না, কে বলিতে পারে? একাকার এইরূপ প্রহসনের অন্যতম। আমরা অবস্থাগতিকে 'মেকি' হইয়া দাঁড়াইয়াছি, কোন আঘাতই আসল ভাবে মর্ম্ম স্পর্শ করে না, কাজেই প্রতিঘাত পূর্ণ মাত্রায় হয় না, নাটকও জন্মে না। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা" আজ কাল আমাদিগের প্রধান উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এই পরস্পর বিরোধী ভাবের মধ্যে আপনাদিগকে একটা সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইতেছে, নচেৎ সংসার অচল হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই যে জ্বালা জন্মে, তাহা গাত্রজ্বালা মধ্যে—মর্ম্মজ্বালা নহে; যেটুকু নেহাৎ অসহ্য হইয়া উঠে, তাহাই প্রহসনে ফুটে, নাটকে বড় জুটে না। বড় দিনের যে ছবি আমরা পূর্ব্বে ঈষৎ

দেখাইয়াছি, তাহাতেই ভরসা করি বুঝা যাইবে, প্রাচ্য মস্তিষ্কে পাশ্চাত্য শিক্ষা এই উৎসবেই জলন্ত ভাবে কার্য্য করে; এই সূত্রেই সুতরাং প্রতি বৎসর প্রহসনের উৎপত্তি ঘটে—প্রত্যেক রঙ্গক্ষেত্রেই এক এক খান অভিনব হাস্যনাটকের অবতারণা হইয়া থাকে। তবে যে হৃদয়ে চিন্তাশীলতা অধিক, শুভাশুভের বিচার নিরপেক্ষতা প্রবল, সেই হৃদয়েই প্রাচ্য পাশ্চাত্যের ঘাত প্রতিঘাত একটু অস্ফুট, তাঁহার প্রহসনের মধ্যেও নাটকত্ব একটু প্রচ্ছন্ন। এই চিন্তাশীলতার ফল বর্ত্তমান একাকার!

ব্যঙ্গোক্তি সময়ে সময়ে বিরক্তিকর হইয়া উঠে, কখনও শীলতার সীমা অতিক্রম করিয়া বসে। কিন্তু আমরা এরূপ অসাড় হইয়া গিয়াছি, যে অতিরঞ্জনের চাক্‌চিক্য না থাকিলে কোন চিত্রই মানস-পটে অঙ্কিত হওয়া দূরে থাকুক চর্ম্মচক্ষুতেও প্রতিভাত হয় না। কাজেই চিত্রকরকে তুলি ধরিলেই, এক আঁচ রঙ চড়াইয়া দিতে হয়। একাকারে ও অতিরঞ্জনের একটু প্রয়োজন হইয়াছে, অথবা দোষ দাঁড়াইয়াছে। ঐ টুকু বাদ দিলে যে চিত্রটি নিখুঁট খাটি জিনিস হয়, তাহা বোধ করি, সকল পক্ষই নিঃসংশয়ে স্বীকার করিবেন। এই দারুণ একাকারের দিনে যে একজনের হৃদয়েও উহা উচিত মত আঘাত করিতে পারিবে, আমাদিগের এমন আশা নাই; বরং বড় দিনের রঙ্গরসের সঙ্গে আনুসঙ্গিক নাট্য রসেরও চিরাবসান হওয়াই অধিকতর সম্ভাবনা। অমৃতলাল এই প্রসঙ্গে অনেকের বিষদৃষ্টিতে পড়িবেন, তাহাও বড় বিচিত্র নহে। তবে তিনি ইহা দ্বারা বিষবড়ি বানাইয়াছেন, ভক্তিপূর্ব্বক তাহা গলাধঃ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই অমৃতের ন্যায় কার্য্য করিবে, সমাজের শিরায় শিরায় শান্তি ও সুমঙ্গল সঞ্চারিত হইবে।

এই বৈষম্যময় জগতে সাম্যের দোহাই দিয়া সকলে জাতিভেদ উঠাইতে উন্মুখ। একাকারের কবি সেই সাম্যের সুগভীর অর্থ আর জাতিভেদের উদ্দেশ্য ও ফলাফল জলন্তভাবে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং আমাদিগের বিশ্বাস, সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হইয়াছেন। এই সাম্য হইতেই একাকারের উৎপত্তি—

"সাম্য সাম্য রব তোলে, নাহি বোঝে অর্থ,
বিপ্লব প্লাবন আনি, ঘটায় অনর্থ।

সাম্যের না বুঝে তত্ত্ব করে একাকার,
একাকারে ঘরে ঘরে উঠে হাহাকার।”

তাই “স্ববৃত্ত্যবলম্বী শিক্ষিত যুবা রাধানাথ কর্ম্মকার” বেশে স্বয়ং গ্রন্থকার বিকৃত মস্তিষ্ক“গ্রাজুয়েট যাদবচন্দ্র পাল”কে সাম্যের সুন্দর অর্থ বুঝাইয়াছেন—

“কাজ ভাগাভাগি ক’রে নিতেই হ’বে শরীর খাটাইতেই হ’বে; তবে আজ বা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হাতে লাঙ্গল দিয়ে তুমি ঘণ্টা নাড়, আবার তোমার ছেলে কাল জুতো সেলাই ক’র্ত্তে বসুক, আমার ছেলে অন্নের অভাবে বিহারীলাল কর্ম্মকার নাম ব’দ্‌লে বিহারানন্দ স্বামী হ’য়ে গেরুয়া প’রে ধর্ম্ম প্রচার ক’র্ত্তে বেরিয়ে য’ান। এই রকম পোড়া ধরা খিচুড়ি চ’লতেই থাক্‌বে। কিন্তু বংশগত জাতিভেদের বন্দোবস্ত ভারি পাকা, ভারি কায়েমি। এই জাতিভেদই সাম্য; সাম্য মানে তোমারও ঘটী আছে, আমারও ঘটী আছে—নয়, তোমার না হয় ঘটী আছে, আমার না হয় বাটী আছে। যেমন পরকালে তরবার জন্য তাঁতিকে ব্রাহ্মণের কাছে যোড় হাত ক’রে দাঁড়া’তে হ’বে, তেমনি ব্রাহ্মণদের ইহকালের লজ্জা নিবারণের জন্য তাঁতির দ্বারস্থ হ’তেইত হবে। প্রতেক জাতিরই নিজের নিজের সম্মান আছে, জোর আছে। আমি প্রত্যেক জাতিকেই সম্মান করি; তবে কাক কাকের মধ্যেই সুন্দর, তিনি যদি ময়ূরপুচ্ছ পরেন, তবে আমি শ্রীদাঁড়কাকচন্দ্র রায় তাঁ’কে একটু ঠোক্‌রাব। * * * এই ভেদাভেদই সাম্য, এই গুণের তারতম্য ভেদ ক’রেই জগদীশ্বর সৃষ্টির সাম্য রক্ষা ক’রেছেন। এটী বেশ মনে রেখ মেয়েদের গোঁপ বেরুলেই আর পুরুষেরা ঘোমটা দিলেই সাম্য হয় না।” স্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়া চলায় সমাজের ও সংসারের কিরূপ মঙ্গল, আর তদ্বিপরীতে কি দারুণ অধোগতি, রাধানাথের প্রত্যেক কথায় তাহা সুস্পষ্ট ভাবে পরিব্যক্ত। কেরাণীগিরির কঠোরতার মধ্যে কি নীচতা, কি কাপুরুষতা, তাহা গদাধর দত্তের কার্য্যে, এবং বেকার কেরাণী বাবুও এলে পাশ করার পিতা ব্রাহ্মণঠাকুরের ব্যবহার বিশদভাবে বর্ণিত। কিন্তু এ বর্ণনায় কি হইবে? স্বয়ং ভুক্তভোগী হইয়াও ত শিক্ষালাভ হইতেছে না। বি-এ পাশ করিয়াও ত কুড়ি টাকা বেতনের কেরাণীগিরির লালসায় এই বিদেশে বিজাতীয় শীতের মধ্যে বাসাবাটী পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। তাই সেই বিজ্ঞের কথা মনে

পড়ে,—আমরা কেবল Jest, Earnestness আদৌ আমাদিগের হৃদয়ে নাই ; আমরা গ্র্যাজুয়েট পুঙ্গব যাদবচন্দ্রের মত মুখের জোরে জগৎ মারিতে পারি, "চাকরি দিলে না" বলিয়া Patriotism, Independence, Lecture, Meeting, কাগজে Article ইত্যাদি লইয়া কাঁদুনি গাহিতে পারি, কিন্তু বিদ্যাবিনোদ হইয়াও ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে, অথবা চাষার ছেলে হইয়াও লাঙ্গল ধরিতে পারি না। কত দিনে আমাদিগের মতি গতি ফিরিবে, অমৃতলালের অমৃতময় কথাগুলি মর্ম্মস্পর্শ করিবে, তাহা সর্ব্বান্তর্যামী বিধাতাই বলিতে পারেন।

'একাকার' উপলক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার সমাজের অনেক অঙ্গের প্রতি ভ্রূকুটী বিক্ষেপ করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটীর ময়লা, অনাহারী মাজিস্ট্রেটের মজলিস ও মর্য্যাদা মুচির যোগ্যতা ও জাত্যভিমান কিছুই তাঁহার দৃষ্টি সীমা অতিক্রম করে নাই। মধু বাবুর ন্যায় সাহেবের চাপরাসী বাবুজানের উপাসক, পরন্তু আশ্রিত ভদ্র সন্তানের প্রতি অযথা উৎপীড়ক, বড় বাবুও সমাজে আজ কাল বিরল নহে। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাসির ছটায় বিচিত্র এই ইঙ্গিত কয়জনের হৃদয়ে উচিত মত আঘাত করিবে, কেই বা তাহা ভাবিয়া আপনাপন কর্ত্তব্যের প্রসার বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইবে? যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, আমাদিগের যেরূপ দুর্ম্মতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে 'একাকারে'র ন্যায় সহস্র চিত্রও বর্ত্তমান একাকার দূর করিতে পারিবে কি না, সন্দেহ ; প্রবীণ নট তাহা বুঝিয়াছেন, তাই প্রাণের কথা বলিয়াছেন—

"শোবার ঘরে শাসন হ'লে তবে যাবে একাকার।"

তবে সেখানেও অধুনা 'কাঙ্গালমণি' ও 'নীলাম্বরী' ভগিনীর ন্যায় অনেকেই 'সুশিক্ষিতা' তাই আমাদিগের সে পক্ষেও বড় চিন্তা। যাহা হউক, আমরাও উদাস প্রাণে হতাশ মনে—

"বর দিয়ে যাই নরের যেন হয় সুমঙ্গল।"

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

উচ্ছ্বাস।

১।

ডেকে লও দয়াময় এই শুধু চাই
বৃথা সুখ অন্বেষণে
কি নগরে কি কাননে
ভ্রমিনু সকল স্থানে আর কায নাই
ডেকে লও দয়াময় এই শুধু চাই।

২।

ডেকে লও দয়াময়, আর কাজ নাই
ঘুরে ঘুরে নিশি দিন
হইয়াছে তনুক্ষীণ
দাঁড়াতে শকতি হীন, বসিয়াছি তাই।
ডেকে লও দয়াময়, আর কায নাই।

৩।

প্রাণের পিয়াসা নাথ মিটেনি আমার
কাতর উদাস মনে
এই চাই ও চরণে
আঁধারে আঁধারে বিভো ঘুরাওনা আর।
প্রাণের পিয়াসা নাথ মিটেনি আমার!

৪।

ঘুরিতে ঘুরিতে (নাথ!) একদিন একবার
ক্ষীণ আলোকের রেখা
দূরে দিয়েছিল দেখা
আলোকিত করেছিল হৃদয় আমার,
ঘুরিতেছি সে অবধি পশ্চাতে তাহার।

৫।

আর একদিন বিভো, আর একবার
বিমলিন মমচিত্ত
সে আলোকে আলোকিত
হয় নাই। হইবে কি এ জনমে আর
ঘুরিতেছি সে অবধি উন্মাদ আকার!

৬।

শারদ পূর্ণিমাকাশে সুধাংশু যখনি হায়
হাসিয়া মধুর হাসি
ছড়ায়ে জ্যোছনারাশি
আলোকিত করিয়াছে সমগ্র ধরায়
তখনি সে আলো আমি খুঁজেছি সেথায়

৭।

সে আঁধারে চিরকাল—সে আঁধারে হায়
ছিলনা সে আলো রেখা
আর একবার দেখা
নিরাশার অন্ধকারে বুক ফেটে যায়
রে বিধাতঃ আর কেন রাখ অভাগায়।

৮।

তোমার জগতে নাথ সুখ কিগো নাই
শুধু হেথা ঘৃণা দ্বেষ
শুধু হেথা রেষারেষ
কারো প্রাণে শান্তি লেশ খুঁজিয়া না পাই,
তোমার জগতে নাথ সুখ কিগো নাই।

৯।

তোমার জগতে নাথ একি হেরি হায়
নাই হেথা মেশামিশি
নাই ভাল বাসাবাসি

ভাই ভাই পর পর কেউ কারো নয়,
তোমার জগতে নাথ একি হেরি হায়।

১০।

ডেকে লও দয়াময় এই শুধু চাই
পরবাসে এ বিদেশে
যায় দিন বড় ক্লেশে
এখন আপন দেশে যেতে আমি চাই,
ডেকে লও দয়াময়, আর কায নাই।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র।

ডেলিগেটের ডালি

২।

অহিন্দু-মতাচারীদিগের দোতালার উপর থাকিবার স্থান হইয়াছিল। সেই খানেই কমোড ছিল, হিন্দু বাবুর্চ্চি (মান্দ্রাজে হিন্দু বাবুর্চ্চি মেলে) ছিল। আর আমাদের স্থান হইয়াছিল নীচের তালায়। বড় হলের মেজে সুন্দররূপে ম্যাটিং করা। এক এক খানি খট্টা তাহার উপর গদী ও দুইটা করিয়া বালিশ। সকলই নূতন। ঠিক যেন শ্রাদ্ধ বাড়ীর উৎসর্গের দান সাজান রহিয়াছে। আমাদের একজন রহস্যপ্রিয় বন্ধু সহসা ঐরূপ সাজান দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয় একজন বাঙ্গালী বাবুকে বলিয়াছিলেন যে "মহাশয় একটা করিয়া নূতন মশারি খাটাইয়া দিন তাহার ভিতর শুইয়া শ্রাদ্ধ বাড়ীর দান উৎসর্গ হইয়া যাই।" একটি একটি ছোট ছোট টেবিল মায় আয়না, মধ্যে মধ্যে ছিল। সন্ধ্যার পর প্রত্যেকে এক একটি কেরোসিন ল্যাম্প পাইত। ডেলিগেট গণের জন্য দুই বেলা (মান্দ্রাজে Evening paper আছে) সংবাদ পত্র আসিত। এক এক জন ভলণ্টিয়ার (প্রায়ই মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবক) ডেলিগেটের কায়াক্লেশ নিরা-করনার্থ খবরদারী করিত। তাহার উপর তত্ত্বাধারক ছিলেন। কাগজ কলমে নালিশবন্দ হইবার প্রথা ছিল ভলণ্টিয়ারগণ সর্ব্বদা সশঙ্ক। নায়াডুর

বাগানটি খুব বড়। মধ্যস্থলে অনেকগুলি কলের জলের উৎস (Hydrant) বসান হইয়াছিল। বাগানের একদিকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় ডেলিগেটদিগের রন্ধন স্থান। যিনি স্বহস্তে পাক করিবেন তাঁহারও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল। বাগানের আর এক দিকে ভাণ্ডার ও তৎপার্শ্বে বাঙ্গালীদের হিন্দু মতে রন্ধন ও আহার করিবার স্থান। কলিকাতা হইতে বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ গিয়াছিল, তাহারা রন্ধন করিত। আমাদের ব্যবস্থা মত তাহারা রন্ধন করিত। মান্দ্রাজের হিন্দুরা মৎস্য ব্যবহার করেন না। বাঙ্গালীদের জন্য তথাপি বড় বড় সমুদ্র মৎস্য আনা হইত। রীতিমত ছাগ মাংস সরবরাহ করা হইত। আমরা ইচ্ছামত পোলাও, কালিয়া, আতপ তণ্ডুলের অন্ন, ব্যঞ্জন, লুচি, মোহনভোগ আহার করিতাম। দুগ্ধের বড় সুখ হইয়াছিল। ৩।৪টি দুগ্ধবতী গাভী সবৎসে আসিয়া প্রাতে দুগ্ধ দিয়া যাইত। আহারান্তে আমরা পান সুপারি পাইতাম। সাজিয়া খাইতে হইত। রীতিই এইরূপ। মান্দ্রাজে হিন্দুরা তামাকটুকুও সেবন করেন না; মুসলমানেরা ও ইতর জাতীয় হিন্দুরা তামাক খাইয়া থাকে। আমাদের জন্য তামাকও আসিয়াছিল। বাগানের অপর প্রান্তে শৌচের সুবন্দোবস্তও ছিল। একেবারে ৫০জন লোক গমন করিতে পারে। ৮।১০ জন মেথর সর্ব্বদা দণ্ডায়মান ও ক্রমাগত পরিষ্কার করিয়া নূতন বালুকা ছড়াইয়া দিতেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জল ও জলাধার যথেষ্ঠ। নিকটেই আবার পুকুর ছিল। লোকজনের সঙ্গে কথা কহা অসম্ভব হইলেও সম্ভব হইয়াছিল কেবল ইংরাজীর গুণে,— মান্দ্রাজে দোকানী পসারি, কুলীরা, অনেক স্ত্রীলোকেও ইংরেজী বুঝে; কারণ ইংরেজ মান্দ্রাজে প্রায় দুই শত বৎসর আসিয়াছেন। কলের জল ও শৌচাগারের সুব্যবস্থা মান্দ্রাজ মিউনিসিপালিটীর কল্যাণে হইয়াছিল। ভলণ্টিয়ারগণকে আমরা যখন যাহা আদেশ করিতাম তখনই তাহা সুন্দররূপে সম্পাদিত হইত। রজনীতে সমস্ত বাগান আলোকমালায় আলোকিত হইত।

কংগ্রেস ক্ষেত্র হইয়াছিল ল্যাণ্ডেন বাগানে। বাগানটি সুবৃহৎ। মধ্যস্থলে একটি সুন্দর বাড়ীতে কংগ্রেস সভাপতি ওয়েব সাহেব ও অপর বড় বড় লোক থাকিতেন। চারু বাবু রাজা রামপাল সিংহ মর্গান ব্রাউন সাহেব ও কংগ্রেসের মান্দ্রাজী সেক্রেটরীরাও এই ভবনে থাকিতেন। কংগ্রেস

ক্ষেত্রে যাইতে দুই পার্শ্বে বস্ত্রাবাস শ্রেণী ছিল। বাম দিকে—ক্যারেজ (শকট) কমিটির সেক্রেটরীর তাম্বু, প্রভিসন (খাদ্য) কমিটির তাম্বু, ধনাধ্যক্ষের তাম্বু, সাধারণ সেক্রেটরীর তাম্বু, ডেলিগেট রেজেষ্টরীর তাম্বু, সকল প্রকার সংবাদ পাইবার তাম্বু (intelligence department), বিখ্যাত দর্শকের তাম্বু, ডেলিগেটের টিফিন করিবার তাম্বু, ডেলিগেটের জন্য দাতব্য ডিসপেন্সরি। দক্ষিণ দিকে—পুলিস, টেলিগ্রাফ, ডেলিগেটের হাঁসপাতাল, মিস্‌মূলরের তাম্বু, ইণ্ডিয়া সংবাদ পত্রের আফিস, সংবাদ পত্রের রিপোর্টারগণের তাম্বু কংগ্রেসের প্রধান রিপোর্টারের তাম্বু, রিফ্রেসমেণ্টের তাম্বু ইত্যাদি ইত্যাদি। মধ্যস্থলে কংগ্রেস মহাসমিতির বৃহৎ পটমণ্ডপ——ছয় হাজার লোক বসিতে পারে। এক দিকে সভাপতি ও আবাহন সভার সভ্যগণের বসিবার বেদী। আলোকের সুবন্দোবস্তের জন্য কতকগুলি বড় বড় ঝাড় ছিল। প্রতি রাত্রিতেই বাগানটি আলোকমালায় বিভূষিত হইত। কংগ্রেসের সভাপতি যখন সভায় আসিতেন বা যাইতেন তখন সঙ্গে সঙ্গে ব্যাণ্ড বাজিত। মান্দ্রাজের বড় বড় লোক ও ভদ্রলোক স্বীয় স্বীয় শকট ডেলিগেটগণের ব্যবহারের জন্য দিয়াছিলেন। ডেলিগেটেরা যদৃচ্ছা চেরেট, ব্রুহাম, কিটন, ল্যাণ্ডো প্রভৃতি আরোহণ করিতে পারিতেন কিন্তু মূল্য দিতে হইত। মধ্যাহ্নকালে টিফিন হইলে ডেলিগেটেরা টিফিন করিতেন। কংগ্রেসে কি হইয়াছিল না হইয়াছিল তাহা সংবাদ পত্রের সামগ্রী ও তাহা যথা সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে সে বিষয়ে কিছু বলিব না ও তাহা লিখিবার স্থানও আমাদের নাই। প্রথম দিন সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়, পরে তিন দিন কংগ্রেসের কার্য্য হয়। কংগ্রেস বসিত মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কার্য্য হইত। তৎপরে সবজেক্ট কমিটি বসিত এবং পরদিন কি কি কার্য্য হইবে তাহা স্থির করিয়া দিত। সবজেক্ট কমিটির মেম্বর শতাধিক। মিস্‌মূলর সংক্রান্ত রহস্য ভেদ করিবার ইচ্ছা ছিল, স্থানাভাবে হইল না।

কংগ্রেস ফুরাইয়া গেল কিন্তু "রেবা" জাহাজ আসিয়া পৌছিল না। কলিকাতায় তারে সংবাদ দিয়া জানা গেল যে রেবা জাহাজ লণ্ডন হইতে আসিতেছে ও ২রা জানুয়ারি তারিখে আমাদিগকে মান্দ্রাজ হইতে তুলিয়া লইবে। আমরা ফরাশিশ মেল "এরিডন" জাহাজে আসিবার জন্য "মেসাজেরিস মেরিটাইম" আফিসে গমন করিয়াছিলাম কিন্তু সেখানে শুনিলাম

যে যে দিন রেবা ছাড়িবে সেই দিন এরিডনও ছাড়িবে, সুতরাং নায়াডুর আতিথ্যে নির্ভর করিয়া সবান্ধবে দৃশ্য দর্শনে বহির্গত হইলাম।

প্রথমেই মান্দ্রাজ সহর। সহর দেখিয়া মন উঠিল না। ট্রাম নাই। গ্যাস নাই,—তাই বুঝি মান্দ্রাজকে "তিমিরাবৃত (benighted) বলে? অভ্রভেদী সৌধমালা নাই। কৃষ্ণ সহর (black town) আমাদের কলিকাতার উত্তর বিভাগ অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, উভয়ে তুলনাই হয় না। থম্বু শেঠী ষ্ট্রীটে যা একটু ঘন বসতি। সমুদ্র তীরে যা কয়টী ভবন, রবিবার বন্ধ বলিয়া হাইকোর্ট দেখা হইল না। একবার প্রাণ ভরিয়া অর্দ্ধ বৃত্তাকৃতি নীলোর্ম্মি সঙ্কুল পয়োনিধি দর্শন করিয়া ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ কেল্লা দর্শন করিতে গমন করিলাম। ইতিহাস পাঠক জ্ঞাত আছেন যে দুই শত বৎসর পূর্বে মান্দ্রাজ পত্তনের রাজা এই কেল্লা ইংরাজকে দান করিয়াছিলেন। নিজ কেল্লা কলিকাতার কেল্লা অপেক্ষা বড়-এবং সামরিক রীত্যনুসারে এরূপ ভাবে সজ্জিত, যাহা, শুনিয়াছি, কলিকাতার কেল্লায় সম্ভবপর নহে। আমরা আর্দ্রক ব্যবসায়ী আমাদের অর্ণব পোতের সংবাদ রাখিবার প্রয়োজন নাই। আসুন একবার দূরবীক্ষণ সাহায্যে সমুদ্রাদি দর্শন করি। কেল্লায় ঢুকিয়াই গেটের একতালার ছাদে গিয়া দেখিলাম ভীমার্জ্জুন দুইটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র রহিয়াছে ও দুই জন প্রহরী দিন রাত্রি তাহাতে নয়ন সংযোগ করিয়া বসিয়া আছে;—দেখিতেছে শত্রু আসিতেছে কি না? ভীম দূরবীক্ষণে ৪১ মাইল দূরে সমুদ্রে কি হইতেছে দেখা যায়। জাহাজাদি উল্টা দেখায়, মাস্তুলের আলো ও জাহাজের ধ্বজা দেখাই উদ্দেশ্য কি না? —তাহা দেখিয়া শত্রু মিত্র নিরূপণ হইবে। ছোটটিতে সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা যায়, অবশ্য অত দূরে নহে। দেখিলাম অনেক দূরে জালিকেরা মৎস্য ধরিতেছে—ভেলায় ভাসিতেছে—সমুদ্র তরঙ্গে এক একবার ডুবিয়া যাইতেছে আবার তরঙ্গ চলিয়া গেলে ভাসিয়া উঠিতেছে। তাহার মধ্যে স্ত্রীলোক দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। দূরবীক্ষণ সাহায্যে আর্কটের নবাবের বাড়ী ও একটি বৃহৎ হিন্দু মন্দিরও দেখিয়া ছিলাম। কেল্লা হইতে বাহির হইয়া মান্দ্রাজের লাট ভবন দেখিলাম। খোলার ছাদ। বোম্বাই সহরেও খোলার ছাদের লাট ভবন দেখিয়াছিলাম। সওদাগরী দোকানপাটও নাম মাত্র। যে কলিকাতা দেখিয়াছে তাহার

চক্ষে কিছুই লাগে না। মান্দ্রাজে সহরের মধ্যে একটি কেনাল আছে। পিপ্‌ল্‌স্‌ পার্কে ভিক্টোরিয়া হল দেখিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। এক ব্যক্তি পার্ক হইতে বেলুনে উঠিলেন, আমরা কিন্তু তাহা দেখিবার জন্য রহিলাম না। মান্দ্রাজ সহরে অনেক বড় বড় অতিথিশালা আছে, কলি-কাতা সহরে তাহা নাই। অতিথিশালাকে "চোলট্রি" বলে। মান্দ্রাজে ট্রাম হইবে তাড়িত সাহায্যে চলিবে। সমস্তই প্রস্তুত পরীক্ষা হইয়াগিয়াছে, খুলিলেই হইল। বলিতে ভুলিয়াছি মান্দ্রাজের হিন্দুয়ানি সজীব ও সতেজ।

পর দিন প্রত্যুষে মান্দ্রাজ রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়া ত্রিবিলোরের টিকিট কিনিলাম। ত্রিবিলোর একটি তীর্থস্থান। প্রায় ২৪ মাইল দূরে। প্লাটফরমে একজন বালক আসিয়া বলিল "পচ্চা ওড় আড়ম্" একটি বালিকা আসিয়া বলিল "কাল্‌কানি" "কাল্‌কানি"। চাহিয়া দেখিলাম বালক রম্ভা ও বালিকা মিছরী বিক্রয় করিতেছে। মরুভূমি সদৃশ উভয় পার্শ্বের তরঙ্গায়িত ক্ষেত্র শ্রেণী দেখিতে দেখিতে বেলা সাড়ে দশটার সময় ত্রিবিলোর আসিয়া পঁহুছিলাম। এক্কা আরোহণ করিয়া দুই ক্রোশ তফাতে ত্রিবিলোর পুণ্য ক্ষেত্রে পঁহুছিলাম। অতি সুন্দর রাস্তা—একেবারে সমতল উভয় পার্শ্বে ঘন বিটপীশ্রেণী, রাস্তায় আতপ সন্তাপ নাই। ত্রিবিলোরে, ক্ষীরোদ সমুদ্রে অনন্ত শয্যায় শায়ী ভগবানের মূর্ত্তি। সর্প ফণাগুলি প্রায় পাঁচ ছয় হাত উচ্চ। মন্দির ত নয় দুর্গ বিশেষ। শুনিলাম মুসলমানদিগের অত্যাচারের ভয়ে ঐরূপ ভয়ানক অন্ধকার গৃহে বিগ্রহ রাখা হইয়াছিল। প্রদীপ না জ্বালিয়া যাবার বা দেখিবার যো নাই। ৩।৪টী ঘোর অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠ অতিক্রম না করিলে ঠাকুরঘরে যাইবার যো নাই। নারিকেল উদক ও শর্করা দিয়া বিগ্রহের পূজা করিতে হয়। অনেক অতিথিশালা আছে। মন্দিরের বাহিরে অনেক বড় বড় পিতলের দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে। মন্দির পার্শ্বে একটি অতি বৃহৎ পুষ্করিণী। চতুর্দ্দিকে প্রস্তর গ্রথিত সোপানশ্রেণী ও মধ্যস্থলে একটি প্রস্তরের মন্দির, যাঁহারা অমৃতসরে গুরুদ্দরবার দেখিয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন তবে প্রভেদ এই যে সন্তরণ ভিন্ন যাইবার উপায় নাই। পুষ্করিণীর জল খারাপ; আমরা তাহাতেই স্নান করিয়াছিলাম। পূজা অন্তে আমরা একজন ধনী মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের অতিথিশালায় দক্ষিণা দিয়া ভোজন করিয়াছিলাম। আতপ তণ্ডুল। মৎস্যের সংস্রব নাই।

গোল মরিচের ঝোল ও আহারান্তে গরম জল পান উল্লেখযোগ্য। আসিবার সময় ত্রিবিলোরের সবডিবিসানাল আফিস ও মুন্সেফের কাছারী দেখিয়া আসি। আমাদের দেশের মত নহে, অতি সুন্দর বাড়ী, বলা বাহুল্য এদেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা পূর্ণ মাত্রায়। বাসায় আসিতে সন্ধ্যা হইল।

পর দিন প্রত্যুষে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের চীৎপাৎ ষ্টেশনে গিয়া প্রথমে চিঙ্গিলিপট্ট পর্য্যন্ত টিকিট লইলাম। এই দিকেই ম্যাডাম ব্লাভেটস্কী ও কর্ণেল অলকট পরিচালিত থিওজোফিষ্ট দিগের মুখ্য-ক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ "আদিয়র" গ্রাম। অবকাশ অভাবে যাইতে পারিলাম না। মরুভূমি ও ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্য দিয়া রেল চলিয়াছে। দশ ঘটিকার সময় চিঙ্গিলিপট্ট পঁহুছিলাম। এখান হইতে চারি দিকে রেল গিয়াছে—সুতরাং ষ্টেশনটি একটি বড় জংসন। এখান হইতে পণ্ডীচারী যাওয়া যায় সেতুবন্দ রামেশ্বর যাওয়া যায় ষ্টেশনের অতি সন্নিকট একটি পাহাড়ের পাদদেশে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ আছে। এখান হইতে কঞ্জিভিরামের টিকিট লইলাম। কঞ্জিভিরামের নামান্তর কাঞ্চীপুর।

বর্দ্ধমান কাঞ্চীপুর ছয় মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ॥

মনে পড়িয়া গেল। নগর দেখিয়া আরও মনে হইয়াছিল "নগরেষু কাঞ্চী"। কিন্তু সুন্দরের বাটী খুঁজিয়া পাই নাই। অতি প্রশস্থ অতি সুন্দর রাস্তা ঘাট। দুই পার্শ্বে সমোচ্চ নারিকেল বৃক্ষের শ্রেণী থাকায় রাস্তায় আতপ সন্তাপ একেবারে নাই। এখানেও অনেক অতিথিশালা আছে। আর গোলমরিচের ঝোল ও ভোজনান্তে উষ্ণ জল পান এ রীতিও এখানে দেখিলাম। নগরটি প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত। তিনটি দেব মন্দির লইয়া তিনটি নাম, শিব কাঞ্চীপুরী, বিষ্ণু কাঞ্চীপুরী ও কাঞ্চীশ্বরপুরী। শিব মন্দিরের তুল্য এত বড় প্রস্তর মন্দির আমি আর কখনও দেখি নাই। তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। প্রায় চোদ্দ তলা উচ্চ হইবে। গেটের উচ্চতা প্রায় ১০০ হাত। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি মন্দির নয় একটি প্রকাণ্ড দুর্গ। বিষ্ণু মন্দিরও তদ্রূপ তবে অত উচ্চ নহে। মন্দিরের গাত্রে নানা দেব দেবীর প্রস্তর মূর্ত্তি। এরূপ ভাস্কর কার্য্য অতুলনীয় বলিলেই হয়। কেন সাহেব তাহার Picturesque India নামক পুস্তকে ইহার ভূয়সী প্রশংসা

করিয়াছেন। আমরা বিষ্ণু মন্দিরে বিষ্ণুমূর্ত্তি ব্যতীত, লক্ষ্মী মন্দিরে লক্ষ্মী মূর্ত্তি ও নৃসিংহ মন্দিরে নৃসিংহ মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। মন্দিরে হোম হইতেছে তাহার সদ্গন্ধ চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়াছে। সেরূপ হোমগন্ধ আমাদের দেশে কখনও নাসারন্ধ্র তৃপ্তি করে নাই। প্রস্তরময়ী নাট্যশালা দর্শন করিলে হতবুদ্ধি হইয়া থাকিতে হয়। আমি ইলোরার গুহা দর্শন করিয়াছি। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে এই সকল মন্দিরে ও ভাস্কর স্থপতি কার্য্যের চরম সীমার পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে বড় বড় পুষ্করিণী আছে। সাদৃশ্য ত্রিবিলোরের মত। অনেক তীর্থযাত্রী দর্শন করিলাম। এখানকার লোক কংগ্রেস কি তাহা জানে। পরিচয়ে আমাদিগকে বাঙ্গালার ডেলিগেট জানিয়া পরম সমাদর করিয়াছিল। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অনেক ডেলিগেট ও এই সমস্ত মন্দির দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। রেলওয়ে ষ্টেশনেও উষ্ণ জল পানের ব্যবস্থা দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "গিনি কীটের ভয়ে কি আপনারা এরূপ সর্ব্বদা উষ্ণ জল পান করেন?" (নিজাম রাজ্যে গিনি কীটের জন্য এইরূপ উষ্ণ জল পান আমি দেখিয়াছি।) ষ্টেশন মাষ্টার সহাস্যে বলিলেন "না তাহা নহে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দেশের সর্ব্বত্র এইরূপ উষ্ণ জল পান ব্যবস্থা।" আমি শুনিয়া অবাক্ হইলাম।

বাসায় ফিরিতে একটু রাত হইল। আমরা শুনিলাম নায়াড়ুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইয়াছে। যথা সময়ে দলবলে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। মাদ্রাজী ধরণের আহার। কলাপাতা সোজা করিয়া পাতা আর তাহাতে পোলাও কালিয়া প্রভৃতি আহারীয়। খাইব কি? "ধরা ভেসে যায় নয়ন জলে" ঝাল—ঝাল—ঝাল। যাহা মুখে দিই তাহাতেই—ফল, মূল, ছানা পর্য্যন্ত—জিহ্বায় যেন খাণ্ডব দাহন হইতেছে। ইহার উপর, রাজা রামপাল সিংহ, চারু মিত্র ও জানকী ঘোষাল মহাশয়ের মধ্যে হাঁসিতে কাঁদিতে বাজি হইল "পাতে কিছু রাখা হইবে না সব খাইতে হইবে, আর পাতে কিছু দিলে "না" বলা হইবে না।" উহাঁদের বাজি আর আমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি। এক ঘণ্টার পর যম যন্ত্রণা শেষ হইল। বরফের কুচিতেও সে অগ্নি থামে নাই। আহারান্তে সংগীত হইল ও যথারীতি আতর পান বিতরণের পর আমরা বিদায় লইয়া বাসায় আসিলাম।

পর দিন আবার মধ্যাহ্নে মান্দ্রাজ মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যান কৃষ্ণ স্বামীর বাটীতে আমাদের নিমন্ত্রণ হইল। সুখের বিষয় এই যে নিমন্ত্রণের সঙ্গে সংবাদ আসিল ঝালের ভয় নাই। গিয়া দেখি ব্রাহ্মণ মহোদয়েরা সে কথা কর্ণবিবরে স্থান দান করেন নাই। আজি কিন্তু এক নূতন দৃশ্য। ঘরের বাহিরে এক স্থানে ম্যান বাটন সাহেব (বৃটিস কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটরী) স-প্যাণ্টালুন আসনপীড়ি হইয়া কলাপাতায় বসিয়া গিয়াছেন। কাঁটা চামচ নাই শালপাতার ঠোংগায় একটু একটু সুরা চলিতেছে। আর সাহেবের নয়ন উৎস ভাসিয়াছে। কৃষ্ণ স্বামীর তিন পুত্র একজন ব্যারিষ্টার, একজন সিভিলিয়ান, একজন সদাগর। বড়ই সন্তোষের বিষয় প্রথম দুইটি আর ইংলণ্ডে নাই। কৃষ্ণস্বামী নিজে হিন্দু। তাহারাও কৃষ্ণ স্বামীর অ-দেশী কন্যা পিয়ানো বাজাইয়া সঙ্গীত করিলেন ও তৎপরে মান্দ্রাজী সঙ্গীত হইল। আমরা বিশ্রাম করিয়া বেলা ৪টার সময় মান্দ্রাজ পোতাশ্রয়ে আসিয়া বেবী জাহাজে আরোহণ করিলাম। অরুণগিরি, বঙ্গিয়া নায়াড় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে জেটী পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। নায়াড় বড় সহৃদয় ব্যক্তি। বিদায়ের সময় চক্ষে জলধারা পড়িতে লাগিল। আমাদের জন্য যত্ন করিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি ফল মূল দিয়াছিলেন।

জাহাজে বেহারীলাল গুপ্ত জজ (ইনি বিলাত হইতে আসিতে ছিলেন) মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বেবী জাহাজে অনেক বড় বড় সাহেব বিবি ছিলেন ও একদল আমেরিকার ভ্রমণকারী ছিলেন। কাপ্তেন হান সার্ডের অনুমতি অনুসারে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এক রাত্রি কংগ্রেস সম্বন্ধে জাহাজের উপর বক্তৃতা করেন। আমাদের সঙ্গে কুমারী মুলর ও তাঁহার পালক পুত্র বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষ আসিয়াছিলেন।

আমরা পরম সুখে নিরাপদে কলিকাতা পঁহুছিয়া কয়লাঘাটে অবতরণ করিলাম। ইতি মান্দ্রাজী-ডেলিগেটগণের তিরোভাব।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দুতীর্থ।

জয়পুর।

আমি পুষ্কর হইতে জয়পুরে আসি। জয়পুর ষ্টেশন হইতে জয়পুর সহর দুই মাইল হইবে। চারি দিকে উচ্চ ও প্রশস্ত প্রাচীর বেষ্টিত জয়পুর সহর অতি সুন্দর ভাবে অবস্থিত। দেশীয় রাজাদের রাজধানীর মধ্যে জয়পুর অতি সুন্দর সহর। হোলকারের, ইন্দোর ও গুইকুওারের বরদা ও গোলিয়ারের উজ্জয়িনী সহর অপেক্ষা জয়পুর অনেক উৎকৃষ্ট সহর। দুই ধারে ফুটপাথ ও বৃক্ষাদি দ্বারা সুশোভিত প্রশস্ত রাজপথ। এখানে রাস্তায় জলের কল আছে, রাত্রে গ্যাসালোকে সহর আলোকিত হয়। রাস্তার দুই ধারে বড় বড় সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে দেবালয়ের উচ্চ উচ্চ চূড়া মস্তক উন্নত করিয়া সহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। এখানকার দেখিবার প্রধান জিনিস রাজবাটী, রাজ-বাগান ও মিউজিয়ম। মিউজিয়মটী এমন সুন্দর ভাবে সাজান আছে যে দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

জয়পুর হিন্দুদিগের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ। এখানে রাজবাটীর মধ্যে গোবিন্দজী নামক একটী পাষাণময় বিগ্রহ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সময়ে সময়ে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। গোবিন্দজীর মন্দির রাজপ্রাসাদের মধ্যে অবস্থিত, সুতরাং যখন তখন ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে দর্শন করা যায় না। প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ও সন্ধ্যার সময় নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, সেই সময় যাত্রীগণ যাইয়া দর্শন করেন ও পূজাদি দিয়া থাকেন। বিগ্রহটীর প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি প্রায় দুই ফুট উচ্চ হইবে। স্থানীয় রাজ পুরোহিতেরা যাত্রীগণের প্রদত্ত টাকা, কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া খাতায় জমা করিয়া লইয়া থাকেন। শুনিলাম এই সমস্ত দ্রব্য দেবালয়ের খাতায় জমা থাকিয়া দেব সেবাতেই ব্যয় হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে যাত্রীগণের প্রদত্ত উপঢৌকনানুসারে তাঁহাদের আদরেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

জয়পুরের স্থানে স্থানে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর দেবালয় আছে। যাত্রীরা সে সমস্ত দেবালয়ের দেবতাদি দর্শন করেন ও প্রণামি আদি

দিয়া থাকেন। অন্যান্য তীর্থ স্থানের ন্যায় এখানে পাণ্ডাদের তেমন অত্যাচার নাই। ফলে যাত্রীগণের জন্য এখানকার বন্দোবস্ত অন্যান্য তীর্থস্থান হইতে ভাল।

অমৃতসর।

পরে আমি জয়পুর হইতে দিল্লী যাই। সেখানে জুমা মস্‌জিদ, কেল্লা ও তন্মধ্যে সাজাহান বাদসাহের দরবার গৃহ, মতিমসজিদ প্রভৃতি দেখি। বাদসাহের এই কীর্ত্তি কলাপ দেখিতে দেখিতে মনে হইতে লাগিল যে এক সময়ে সমস্ত ভারত যাঁহার ভয়ে শশঙ্কিত থাকিত, যাঁহার দরবারে ভারতের রাজা রাজড়া প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়া তটস্থ থাকিতেন; সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ব্যক্তি কালসহকারে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন এখন কেবল তাঁহার এই কীর্ত্তিগুলিন তাঁহার সাক্ষ্য দিতেছে মাত্র; আবার কালের গতিকে ইহাও থাকিবে না। ভাই পাঠক! আমরাও যে এখন আপনাপন অবস্থানুযায়ীক ধন মান সম্পদ লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছি, ইহাও থাকিবে না। দেখিতে দেখিতে কাল সাগরে সকলই বিলীন হইয়া যাইবে। আমাদের মধ্যে বুদ্ধিমান তিনিই, যিনি এই কাল-সাগরের পশ্চাতে একটু তলাইয়া সেই মহাকালকে ধরিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। একবার তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে কালকে অনায়াসে ফাঁকি দিতে পারা যায়।

পরে দিল্লী হইতে অমৃতসর আসি। অমৃতসর শিখ জাতীর প্রধান তীর্থস্থান। শিখ জাতিকে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী বলিলে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না সুতরাং অমৃতসরকে একটী হিন্দুতীর্থ বলাতে কোন দোষ নাই।

এখানে শিখদিগের ধর্ম্মালোচনার একটী বিস্তৃত ও প্রধান আড্ডা আছে, তাহাকে গুরু দরবার কহে। ইহা সহরের প্রায় মধ্যস্থলে চারি দিকে প্রাচীর ও ধর্ম্মশালা পরিবেষ্টিত একটী প্রকাণ্ড দীঘির মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত। এই দীঘির চারি পাশ বিস্তৃতরূপে শ্বেত প্রস্তর দ্বারায় বাঁধান এবং দীঘির মধ্যস্থলে সুবর্ণপাত মণ্ডিত ও তদুপরি নানাপ্রকার কারুকার্য্য খচিত একটি বৃহৎ শ্বেত প্রস্তরের মন্দির। এই মন্দিরের মধ্যে শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ গ্রন্থ-সাহেব অবস্থিত। এই দরবার ও এই মন্দির শিখদিগের ৪র্থ ধর্ম্মগুরু মহাত্মা রামদাসজী প্রতিষ্ঠা করেন।

শিখ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্মগুরু ১০ জন। তাহা এই—১ম, বাবা গুরুনানক। ২য়, নানকের শিষ্য অঙ্গদজী। ৩য়, অঙ্গদের শিষ্য অমর দাসজী। ৪র্থ, অমর দাসজীর শিষ্য ও জামাতা রামদাসজী, ইনিই অমৃতসরের বর্ত্তমান গুরু দরবারের প্রতিষ্ঠাতা। ৫ম, রামদাসের পুত্র অর্জ্জুন জী, ইনি বাবা নানকের ও অন্যান্য গুরুদিগের উক্তি ও রচনা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ সাহেব প্রস্তুত করেন। ৬ষ্ঠ, অর্জ্জুনের পুত্র হরগোবিন্দ জী, ইনিই শিখদিগের মধ্যে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধার্থে প্রথম তলবার ধারণ করেন। ৭ম, হরগোবিন্দজীর পুত্র হররায় জী। ৮ম, হররায় জীর পুত্র হর কিষণজী। ৯ম, তেগ বাহাদুর জী, ইনি ৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ জীর ভ্রাতা। ১০ম গুরু, তেগ বাহাদুরজীর পুত্র প্রসিদ্ধ গুরুগোবিন্দজী। ইনিই শিখ জাতিকে যোদ্ধাজাতিরূপে পরিগণিত করেন। ইঁহার পরে আর উপযুক্ত ব্যক্তি না থাকায় ইঁহার পর হইতেই গুরুপদ উঠিয়া গিয়াছে।

অমৃতসরের এই গুরু দরবারে সর্ব্বদাই একটা ধর্ম্মের হাওয়া বহিতেছে। প্রতিদিন রাত্রি ৩টা হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিন রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত ২২ ঘণ্টা কাল অনবরত এই মন্দির মধ্যে তান লয় সহকারে ধর্ম্ম সঙ্গীত হইতেছে। একদল গায়ক গান করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে আবার একদল গায়ক আসিয়া তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করিয়া গান করিতেছেন। এই সকল গায়কদিগের মধ্যে অন্ধের সংখ্যাই বেশী, এই অন্ধগণ সুন্দর সুন্দর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ ধর্ম্মসংগীত গাইয়া মন্দিরটীকে অপূর্ব্বভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। এই মন্দির মধ্যে যে গ্রন্থ সাহেব (শিখদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থ) আছে তাহার দুই পার্শ্বে দুই জন শিখ বসিয়া আছেন, তাঁহারা যাত্রীগণের প্রদত্ত কড়া প্রসাদ (মহনভোগ) গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের হস্তে ফুল দিতেছেন। এই সমস্ত মহনভোগ এই খানেই বিতরিত হইতেছে। অনবরত যাত্রীগণ আসিতেছেন ও অনবরত মহনভোগ সমূহ মন্দিরস্থ ব্যক্তিগণকে বিতরিত হইতেছে এবং এই মন্দির মধ্যেই তাহা সকল ভোজন করিতেছেন। আমি সেখানে যাইয়া বসিবা মাত্র আমাকে খানিকটা মহনভোগ দিয়া একজন শিখ বলিলেন যে, এখানে কেবল কড়া প্রসাদ ভোজন করিবার নিয়ম আছে, আর কিছু ভোজনের নিয়ম নাই। আমি এখানে বসিয়া বসিয়া ধর্ম্ম সঙ্গীত

শ্রবণ করিয়া আত্ম'র ও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের প্রদত্ত কড়া প্রসাদ খাইয়া উদরের তৃপ্তি সাধন করিতাম।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর গ্রন্থ সাহেবের নিকট আরতী হয়। মহাত্মা নানক সাহেবের সেই গান "গগনমে থালে ইত্যাদি" গীত সহস্র লোকে গাহিতে গাহিতে আমাদের দেশের দুর্গা প্রতিমার নিকট আরতীর ন্যায় পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া প্রায় এক ঘণ্টা সময়ব্যাপী আরতী করেন। পরে আরতী শেষ হইলে আবার পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্গীত চলিতে থাকে। এখানে শিখ ধর্ম্মাবলম্বী ২।৪ জন সাধুর সহিত আমার পরিচয় হয়, তাঁহাদিগকে "গগনমে থালে" এই সঙ্গীতের অর্থ ও এই প্রকার আরতীর কথা বলায় তাঁহারা কহিলেন যে কি করিবে? এই সমস্ত লোকেরাত তাহা বোঝে না। সেই অখিল নিরঞ্জনের আরতী জগত নিয়তই গগনরূপ মহাথালে চন্দ্র সূর্য্যরূপ প্রদীপ জ্বালিয়া করিতেছে সত্য বটে, কিন্তু যাহাদের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হয় নাই তাহারা তাহা কি প্রকারে বুঝিবে? ইহারা যাহা বোঝে তাহাই করিতেছে। তবে শিখদিগের মধ্যে এমন লোক আছেন, যাঁহারা বাস্তবিক গুরু নানকের ভাব বুঝিতে পারেন। কিন্তু জনসাধারণের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা হইলেও তাঁহারা বাহ্যিক ক্রিয়াতে যোগ দিয়া থাকেন।

কেবল মন্দির মধ্যেই যে এরূপ সঙ্গীতাদি হইতেছে তাহা নহে, সেই দিঘীর চারি পার্শ্বেই কোথাও সঙ্গীত, কোথাও বেদান্ত পাঠ, কোথাও গ্রন্থ-সাহেব পাঠ, কোথাও বা ধর্ম্মালোচনা ইত্যাদি হইতেছে। লোক সমস্ত দলে দলে এক এক স্থানে বসিয়া ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। বাস্তবিক আমি ভারতবর্ষের যতস্থান দেখিয়াছি এখানকার মত ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মভাব আর কোথাও দেখি নাই। বিশেষ এখানকার লোকের ভক্তি ও সেবার ভাব অতি চমৎকার! আমি মন্দির মধ্যে একস্থানে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া আমাকে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা রুটী খাওগে?" আমি বলিলাম "না"। রমণী আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া পুষ্করণীর চারি ধারে বেড়াইতেছি, এমন সময় একজন লোক কতকগুলি রুটী ও তরকারী আনিয়া বলিতেছেন, "রোটী খাওগে?" আমার ক্ষুধা হইয়াছিল, বলিলাম "হাঁ," অমনি কিছু রুটী ও তরকারী

আমার হাতে দিয়া চলিয়া গেলেন। আর এক স্থানে বেড়াইতেছি, সেখানে দেখিলাম একজন ব্যক্তি মুটের মাথায় করিয়া এক ধামা লুচি লইয়া বেড়াইতেছেন এবং "পুরি খাওগে ? পুরি খাওগে ?" বলিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ও যিনি খাইতে চান, তাঁহাকে দিতেছেন। একদিন রাত্রী ১০।১১ টার সময় আমি দুটী সাধুর সহিত ঐ দীঘির পাড়ে বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছি, এমন সময় একব্যক্তি ৩টী বড় বড় বাটীতে মাবা দুগ্ধ আনিয়া আমাদিগের হাতে হাতে দিয়া বলিলেন "পি লেও"। আমি দেখিয়া অবাক্। সাধুরা আমার ঐরূপ ভাব দেখিয়া বলিলেন "খাও, কি দেখছ ?" পরে তাঁহারাও খাইলেন আমিও খাইলাম। পরে ঐ ব্যক্তি পাত্রগুলি ধুইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

আবার একদল লোক দেখিলাম, তাঁহারা পাখা হস্তে করিয়া কেবল বাতাস করিয়া বেড়াইতেছেন। যেখানে লোক আছে সেখানে যাইয়া ২।৪ বার তাঁহাকে বাতাস করিয়া চলিয়া আবার অন্যান্য যাইতেছেন। পিপাসা পাইলে জলের অভাব নাই, পুকুরের চারি ধারে ১০।১৫টী স্থানে জলছত্র আছে, এক এক স্থানে এক এক ব্যক্তি বসিয়া অনবরত জল দিতেছেন। জল খাইবার জন্য কতকগুলি বাটী আছে, সেখানে যাইয়া জল চাহিলেই বা বাটী ধরিলেই সুন্দর ঠাণ্ডা জল তাঁহাকে দেন, জল খাইয়া বাটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিতে হয়, সেখানে বাটীটি রাখিলে তাহা গড়াইয়া যেখানে পরিষ্কার করে সেখানে যাইয়া পড়ে। এরূপ লোকের সেবার বন্দোবস্ত আর কোথাও দেখি নাই। এখানে বেদান্তাদি পাঠ ও ব্যাখ্যার দ্বারায় যেমন জ্ঞানের আলোচনা হইতেছে, তেমনি সঙ্গীত কীর্ত্তন ও ভাগবত ইত্যাদি পাঠের দ্বারায় ভক্তিরও আলোচনা হইতেছে এবং লোক সেবার জন্য উক্ত প্রকার বিবিধ আয়োজন করিয়া কর্ম্ম বা সেবারও চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রকাশ পাইতেছে। অধিক আর কি লিখিব, এখানে আসিলে শরীর, মনের ও আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় এবং জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সুন্দর আদর্শ স্থান দেখিয়া যথেষ্ট শিক্ষালাভ করা যায়।

ক্রমশঃ।

শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন।

পঞ্চানন্দ পাকড়াসির গাঁজার পুঁটুলি।

১। অশ্লীলতা নিবারণী সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪।

যাহা কিছু vulgar তাহা পরিত্যাজ্য। Vulgar fraction অঙ্কশাস্ত্র হইতে উঠাইয়া দেওয়া উচিত। Vulgar শব্দের gar আসিয়া পড়ে বলিয়া ভূবৃত্তান্তের Trafalgar এবং ইতিহাসের রাজা Edgar অবধি অপাট্য। কাজে এল্‌গার দিবে না এবং মুখে পগার ও উদ্গার আনিবে না। সরকারী ধনাগার উঠাইয়া দিয়া টঙ্ক ঘর করিতে হইবে। চিনি না হইলে চা খাওয়া এবং সেবকা ব্যতীত roast mutton খাওয়া চলে না, তাই sugar ও vinegar মুখে করিবে।

২। Public Works Departmentর বাড়ী ঘর প্রায় পোক্ত হয় না। তাহার কারণ এই, ইহাতে Superintendent, Supervisor, Overseer প্রভৃতি কর্ম্মচারী আছে। Super এবং over অর্থে উপরি ভাগ। Overseer অর্থে যে কেবল উপর দেখে; ভিতর দেখে না অর্থাৎ উপর চালাক। Supervisor এবং Superintendentএর উপর দিক্ মাত্র নজর কিম্বা মনোযোগ তাই বাড়ী ঘর কম মোজবুত্।

৩। January প্রভৃতি মাস বাচক ১২টি ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালা। January বাঙ্গালা মাঘ মাস। মাঘে বিষম শীত। ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন "বাঘের বিক্রম যেন মাঘের হিমানী" জানুতে বিষম শীত লাগে এবং জানু ধরিয়া শীত নিবারণ হয়। "জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ" মুকুন্দরাম। January হইতেছে জানু + অরি অথবা জানু + কড়ি। হাঁটুতেই [illegible]শীত লাগে। "শীত পায়" যথার্থ বোধক বাক্য। আর হাঁটু ধরিয়া [illegible]রণ হয়।

February বাঙ্গালা ফাল্গুন মাস। ফাল্গুন বসন্তকাল। [illegible] [illegible] ল একই। আর পওক পরিবর্ত্তনীয়, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে পাক ফাক্ হইয়া যায়। তাই February হইতেছে পীবর + অলি = পীবরালি। বসন্তে অলি[illegible]তে পীবর কি না স্থূল হয়।

March বাঙ্গালা চৈত্র মাস। চৈত্রে সূর্য্যরশ্মি প্রখর ও উজ্জ্বল হইতে থাকে। তাই March হইতেছে মরীচী কি না রশ্মি অথবা রশ্মিশালী মাস।

April বাঙ্গালা বৈশাখ। বৈশাখে লোকে স্নানাদি জল ক্রীড়া অথবা জললীলা করে। বর্ণাগমাদিক বিধানুসারে April হইতেছে অপ্ + লীলা। (লীলার স্থানে লীল) অপ্ শব্দে জল। April স্নানাদি জলক্রীড়া করিবার মাস।

May বাঙ্গালা জ্যৈষ্ঠ। জ্যৈষ্ঠে আম ও জাম হয়। Cupid মদনকে বলে। মদনের অন্য একনাম দীপক কি না উদ্দীপক। মোক্ষ মূলারের মতে বিপর্য্যয় প্রত্যয়ানুসারে Cupid দীপক হইতে পারে। May ও উল্টা করিয়া লিখিলে আম কিম্বা যাম হয়, অর্থাৎ আম বাগশালী মাস।

June বাঙ্গালা আষাঢ়। আষাঢ়ে শস্যাদি জন্মে। জনু ধাতুর অর্থ জন্ম। জনু আর June একই।

July বাঙ্গালা শ্রাবণ। শ্রাবণে দেশ জলময়। জলী অর্থে জল বিশিষ্ট। July এবং জলী একই।

August বাঙ্গালা ভাদ্র মাস। ভাদ্রে অগস্ত্য উদয় হয়। তাই August এবং অগস্ত্য একই।

September বাঙ্গালা আশ্বিন। আশ্বিনে আকাশ পরিষ্কৃত শুভ্র হইতে থাকে। তাই September হইতেছে শ্বেত + অম্বর = শ্বেতাম্বর। অম্বর আকাশ।

October বাঙ্গালা কার্ত্তিক। কার্ত্তিকে বেশী শিশির পড়ে এবং আকাশে প্রদীপাদি দেওয়া হইয়া থাকে। ব বর্ণের স্থানে উচ্চারিত হয়। October হইতেছে উর কি না শিশির অথবা অগ্নি + উত্তর। দেশজ উস অর্থ শিশির এবং অর্থে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যে মাসে বেশী শিশির অথবা উর অগ্নি এবং উত্তর উর্দ্ধ কি না যে মাসে উর্দ্ধে অগ্নি ও আলোকাদি প্রদত্ত হয়।

November বাঙ্গালায় অগ্রহায়ণ। এই মাসে আকাশ একেবারে নূতন রূপ ধারণ করে। তাই November হইতেছে নব + অম্বর = নবাম্বর।

December বাঙ্গালা পৌষ মাস। পৌষে ব্রাহ্মণদিগকে গরম কাপড় দেওয়া হইত। এখনও হয়। তাই December হইতেছে দ্বিজ + অম্বর দ্বিজাম্বর। অম্বর শব্দে কাপড়।

ক্রমশঃ।

শ্রীদীননাথ ধর।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় ভাগ। | চৈত্র, সন ১৩০১ সাল। | ১২শ সংখ্যা।

ব্রহ্মোপাসনা।

জগৎপাতা জগদীশ্বর মানবকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের অন্তরে এমন কতকগুলি স্বাভাবিক ভাবের বীজ নিহিত করিয়া দিয়াছেন যে মানব শত চেষ্টা করিলেও সেই সমস্ত ভাব নিজেদের মধ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারে না। পৃথিবীর জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে কোন না কোন আকারে সেই সমস্ত ভাব প্রস্ফুটিত হইবেই হইবে। ফলে সেই বীজ নিহিত ভাবগুলি বহির্জগতের সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সমস্ত স্বাভাবিক ভাবগুলির মধ্যে মানবের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সর্ব্ব প্রধান। আপনার অপেক্ষা আর একজন মহত্তর কেহ আছেন এবং তিনিই এই জগৎ ও আমাদের স্রষ্টা,——এই ভাব স্বাভাবিক ভাবে মানবের মধ্যে থাকায়, মানব কি জ্ঞানে কি অজ্ঞানে সকল অবস্থাতে সেই স্রষ্টা পুরুষের উপাসনা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের মধ্যে স্রষ্টা পুরুষের উপাসনার ভাব স্বাভাবিক ভাবে নিহিত থাকিলেও তাহাদের জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে স্রষ্টা পুরুষের উপাসনার ভাবও নানা প্রকার হইয়াছে। ক্রমোন্নতিশীল মানবাত্মাগণ নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে আপনাদের উপাস্য দেবতাকে লাভ করিবার জন্য সাধারণতঃ যে যে অবস্থার মধ্য দিয়া সেই উপাস্য দেবতার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন

কিছুই নহে। যাহা হউক এই মনোময় কোষও চিন্তা দ্বারায় ত্যাগ করিয়া চতুর্থ বিজ্ঞান ময় কোষে আসিতে হইবে। বুদ্ধির দ্বারা মীমাংসিত বিষয়কেই বিজ্ঞানময় কোষের কার্য্য বলা যায়। আমরা সচরাচর ইন্দ্রিয়যোগে বহির্জ্জগতের বিষয় সমূহ মনের দ্বারায় গ্রহণ করিয়া বুদ্ধি দ্বারায় তাহার একটা মীমাংসা করিয়া লই, ব্রহ্ম বিষয়েও এইরূপ অনেক মীমাংসা করিয়া থাকি কিন্তু তাহা ব্রহ্ম নহে। সুতরাং ধ্যান বা চিন্তা দ্বারায় এই প্রকার মীমাংসাকে ব্রহ্ম বা তদ্ স্বরূপ নহে বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম জ্ঞানের জন্য আরও তলাইয়া যাইতে হইবে। এইরূপ বিজ্ঞানময় কোষ অতিক্রম করিলে পঞ্চম অর্থাৎ শেষ কোষ আনন্দময় কোষে যাইতে হইবে। এই আনন্দময় কোষই আত্মরাজ্য। ব্রহ্মোপাসক চিন্তা দ্বারায় উক্ত চারি প্রকার কোষ ভেদ করিয়া এই আনন্দময় কোষে যাইলে তাঁহার আত্মস্বরূপ ধারণা হয়। ধারণা মানে ধরিবার শক্তি। উপাসকের এই ধারণা শক্তি বৃদ্ধি হইলে তখন নিজে কি ও নিজের স্বরূপ কি তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। সাধক যখন নিজ স্বরূপ ধারণা করেন তখন তাঁহার অন্তরে এক প্রকার আনন্দ উপলব্ধি হয় কিন্তু এ আনন্দ ব্রহ্মানন্দ নহে, ইহা আত্মানন্দ। এই স্থানে যাইলে মন শান্ত ও সমাহিত হয়। এই শান্ত ও সমাহিত অবস্থায় আত্মচিন্তা করিতে করিতে উপাসকের বহির্জ্জগতের সমস্ত জ্ঞান তিরোহিত হইয়া গভীর সমাধির অবস্থা হইয়া থাকে। এই সমাধির অবস্থা অতিক্রম করিতে পারিলেই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে। আত্মস্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে সাধক দেখিতে পান যে আমার নিজের যে সমস্ত স্বরূপ উপলব্ধি করিতেছি তাহা কোথাও হইতে আসিতেছে। আমার মধ্যে জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি যে সমস্ত মূল বিষয় প্রবাহিত হইতেছে তাহা কোথা হইতে কে প্রেরণ করিতেছেন? এইরূপ চিন্তা দ্বারায় সেই প্রবাহ সূত্র ধরিয়া ধরিয়া আরও অগ্রসর হইতে থাকেন সেই সমস্ত জ্ঞানাদির সূত্র ধরিয়া ধরিয়া যতই অগ্রসর হইতে থাকেন ততই তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় ও সেই পরিমাণেই তিনি প্রকৃত ব্রহ্মো পাসনা করিয়া থাকেন। এখানে নিজের জ্ঞানাদি প্রত্যক্ষ হওয়ায় সাধক তাহা অনায়াসে আয়ত্ত করিয়া সে সমস্ত ধরিতে পারেন। বলা বাহুল্য যে আত্মস্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা ধৃত করিতে না পারিলে প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা

করিবার অধিকার জন্মে না। ইহাই ব্রহ্মোপাসনার সোপান। এই সোপান ভিন্ন তাঁহার নিকট যাইবার আর অন্য রাস্তা নাই। সেই জন্যই মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বিবেক চূড়ামণি নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন ;

"বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্
কুর্ব্বন্তু কর্ম্মাণি ভজন্তু দেবতাঃ।
অত্মৈক্য বোধেন বিনাপি মুক্তির্ণ
সিধ্যতি ব্রহ্ম শতান্তরেঽপি ॥"

অর্থ—লোকে শাস্ত্রই বলুক, দেব পূজা করুক, কর্ম্ম করুক বা দেবতাদিগের ভজনাই করুক, আত্মার একত্ব বোধ ব্যতীত ব্রহ্মার শত বৎসরেও মুক্তি হয় না।

এখানে পাঠক হয় ত বলিতে পারেন যে উক্ত প্রকার উপসনায় না হয় ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপনা হইল কিন্তু আত্মার একত্ব বোধ হইল কোথায় ? ইহাতে আত্মার একত্ব বোধ হইল বৈ কি। তিনি জ্ঞানময়, আমার নিজস্বরূপের জ্ঞান সূত্র ধরিয়া সেই অনন্ত জ্ঞানের মধ্যে যাইয়া পড়িলে, সেই জ্ঞান আর এই (আমার নিজের) জ্ঞান একই জ্ঞান ; সেই শক্তি ও এই শক্তি একই শক্তি বোধ হয় সুতরাং এই স্থানেই তাঁহাতে আমাতে এক। কিন্তু ইহার আবার পৃথক ভাব আছে, তাঁহাতেও আমাতে জ্ঞানেতে শক্তিতে ইচ্ছাতে এইরূপে এক হইলেও আমার নিজের আত্মবোধরূপ সীমা দ্বারায় তাঁহার সহিত পৃথকত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মের সহিত আমার এই একত্ব ও দ্বিত্ব, এই দ্বৈতাদ্বৈতভাব যাঁহার উপলব্ধি হইয়াছে তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী হইয়াছেন। সাধকেরা এই স্থানে যাইযাই প্রভুত্য সম্বন্ধ নিরুপণ করিয়া পৃথিবীতে তাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থাতেই,——

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥"

মুণ্ডকোপনিষৎ,

অর্থ—সেই পরাবর অর্থাৎ ব্রহ্মকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ অবিদ্যা জন্য বিষয় বাসনা ভেদ হয়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয় এবং সাধকের কর্ম্ম সমূহও ক্ষয় হয়।

এক্ষণে পাঠকের মনে হয় ত এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে আমাদের দেশে দেব প্রতিমা পূজা করাকে ব্রহ্ম জ্ঞানের সোপান বলিয়া যাহা প্রচারিত হইতেছে তাহা কি সত্য নহে? না, তাহা সত্য নহে, উহা কল্পনা মাত্র। শাস্ত্রে উহার ভূরি ভূরি নিন্দা আছে এবং উহা কল্পনা বলিয়াও শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। উহা যদি ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের সোপান হইত তাহা হইলে উহাকে কল্পনা বলিয়া উল্লেখ করিতেন না। তবে কি উহা নিষ্ফল? প্রাচীন জ্ঞানীগণ তবে উহার সৃষ্টি করিলেন কেন? তাহার কারণ অবশ্য আছে। তাঁহারা দেখিলেন যে এই ব্রহ্ম জ্ঞান অজ্ঞানী মূর্খ ব্যক্তিগণ কোন প্রকারে বুঝিতে পারিবে না, অতএব তাহাদিগকে ব্রহ্মের স্বরূপ ও ভাবাদি বুঝাইবার জন্য মানচিত্রের সৃষ্টি করিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন, যেমন মহাদেব। ব্রহ্ম ত্রিকালজ্ঞ, মহাদেবের তিন চক্ষু কল্পনা করিলেন। ব্রহ্ম প্রকৃতি পুরুষ সংসৃষ্ট, শিব লিঙ্গকেও সেই ভাবে গঠন করিলেন ইত্যাদি। ইহাতে অজ্ঞানীদিগকে ব্রহ্ম কিরূপ তাহাই শিক্ষা দিবার জন্য এইরূপ ব্রহ্মভাব সমূহ কল্পনা করিয়া মানচিত্র (Art) রূপে সাধারণের নিকট ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিগণ তাহা না বুঝিয়া উহাকেই অর্থাৎ প্রতিমাদিকেই উপাস্য করিয়া লইয়াছেন, আবার উহাঁদের মধ্যে যাঁহারা একটু জ্ঞানী তাঁহারা প্রতিমাদিকে উপাস্য না করিয়া উহাদিগকে ব্রহ্ম জ্ঞানের সোপান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমার বিবেচনায় উক্ত উভয় শ্রেণীর লোকই ভ্রান্ত হইয়াছেন। কেননা প্রতিমা কখন ব্রহ্মও নহে ও ব্রহ্ম জ্ঞানের সোপানও নহে। যেমন আমেরিকা দেশের ভৌগলিক বিবরণ শিক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে আমেরিকার মানচিত্র দ্বারায় শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু বাস্তবিক সেই মানচিত্র আমেরিকা নহে, সেইরূপ ব্রহ্মের উক্তরূপ মানচিত্র প্রতিমাদি হইলেও বাস্তবিক তাহা ব্রহ্ম নহে। যেমন আমেরিকার মানচিত্র অবলম্বন করিয়া আমেরিকা যাওয়া যায় না, সেইরূপ ব্রহ্ম মানচিত্র-রূপ প্রতিমাদি জ্ঞানীদিগের ও ব্রহ্মোপাসক-দিগের উপাস্যও হইতে পারে না। তবে প্রতিমাদিকে জ্ঞান চক্ষে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে ব্রহ্মের কিছু কিছু ভাবের আভাস পাওয়া যায় মাত্র।

এক্ষণে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে প্রতিমা

পূজায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহাও উক্ত প্রকারের ব্যাখ্যা, উহা ব্রহ্ম জ্ঞানের সোপান মনে করিয়া তাঁহারা মহা ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর অবশ্য এমন দিন আনয়ন করিবেন যখন তাঁহারা যথার্থ সত্য বুঝিয়া উহা পরিত্যাগ করিবেন।

পরিশেষে নিবেদন, যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইলে নিজের চরিত্র বিশুদ্ধ করা চাই। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি সংযত করা চাই। রিপুদিগকে নিজ বশে আনিতে না পারিলে চিত্ত সংযম হয় না, আর চিত্ত সংযম না হইলে মানুষ ধ্যান বা চিন্তাও করিবার তেমন অধিকারী হয় না। শুনিয়াছি পাশ্চাত্য দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা কোন গুরুতর বিষয় চিন্তা করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ ও আহারাদি প্রভৃতি সকল বিষয়েই সংযত হইতে থাকেন। বাস্তবিক চিন্তাশীল মনুষ্যেরা বাহিরের সংস্রব হইতে যতদূর তফাৎ থাকিতে পারেন তাহার চেষ্টা করেন। সুতরাং ব্রহ্ম বিষয়ক চিন্তা করিতে গেলেও তাঁহাকে সেই প্রকার বা ততোধিক বাহিরের সংস্রব পরিত্যাগ করা আবশ্যক। বাহিরের সংস্রব যত পরিত্যাগ করিতে পারা যাইবে ততই চিত্ত শান্ত হইবে, ধ্যান ধারণা বৃদ্ধি হইবে। সেই জন্য উপনিষদ্‌কার ঋষি বলিয়াছেন—

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥"

অর্থ—দুশ্চরিত্র হইতে অবিরত, অশান্ত, অসমাহিত বা অশান্ত মানস ব্যক্তি জ্ঞান দ্বারাও ইঁহাকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় না।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল, অতএব পাঠকদিগের নিকট প্রণত হইয়া অদ্য বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন।

পেণ্ডুলমের রাগ।

পঞ্চাশ বৎসর চলিতে চলিতে ঘড়ী এক দিন প্রাতঃকালে গ্রীষ্মের সময় হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। ঘড়ীর কাঁটাদ্বয় বন্ধের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়ে স্থির হইয়া রহিল। দুই এক বার চলিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিল। চাকা সকল ভয়ে স্পন্দহীন হইয়া রহিল। আর আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। ডায়েল্ প্লেট কিছু রাগী লোক চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া, কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, এবং চাকা, পেণ্ডুলম ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর বিশেষ রাগ প্রকাশ করিল। কিন্তু তাহারা সকলে এক স্বরে বলিয়া উঠিল আমরা নির্দ্দোষী, পেণ্ডুলম চুপ করিয়া রহিল, দুই এক বার মাত্র অসন্তুষ্ট ভাবে গাত্র নাড়া দিয়া বলিতে লাগিল:—

"আমি স্বীকার করিতেছি যে আমিই ঘড়ী বন্ধ হইবার এক মাত্র কারণ। ঠিক কথা বলিতে কি" আমি ৫০ বৎসর হইতে টিক টিক করিয়া নড়িতেছি। আর আমি চলিতে পারি না। আমি বিশ্রাম চাই।"

Dial Plate ডায়েল প্লেট শুনিয়া অবাক হইল এবং রাগ করিয়া বলিল—"পেণ্ডুলম! তুমি কি জন্য কুঁড়ে হইয়াছ, আগে ত বেশ পরিশ্রমী ছিলে; বেশ চলিতে। তোমার কুঁড়েমী দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি।" পেণ্ডুলম্ (Pendulum) শুনিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিল এবং কহিল—"কুঁড়ে বলা বড় সহজ কথা—কিন্তু বোধ করি তোমার মত কুঁড়ে আর কেহ জগতে নাই, তোমার কোন কাজ নাই, কেবল কাঁটা দুটীকে গায়ে করিয়া যাবজ্জীবন চুপ করিয়া বসিয়া থাক। ঘরের ভিতর যে সকল ভাল ভাল বস্তু থাকে তাহা আনন্দে দেখ এবং সমীরণ ও আলোক সেবা করিয়া থাক। কিন্তু আমার মতন যদ্যপি যাবজ্জীবন অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া শরীর ক্রমাগত নাড়িতে হইত তাহা হইলে বোধ করি আমায় "কুঁড়ে" বলিতে না। ডায়েল (Dial) কহিল—"কেন? তুমি যে ঘরে থাক, তাহাতে ত জানালা আছে; তন্মধ্য দিয়া তুমি সকল বস্তু দেখিতে পাও।" পেণ্ডুলম কহিল "জানালা আছে সত্য কিন্তু তাহা দিয়া উঁকি মারিবার

আমার এক মুহূর্ত্তের অবকাশ নাই, বলিতে কি আমার জীবন বড়ই কষ্টকর, দিন রাত বার মাস ত্রিশ দিন আর এ প্রকার টিক টিক করিয়া চলিতে পারি না ; ভাবিয়া দেখ দেখি ২৪ ঘণ্টায় আমাকে কতবার টিক টিক করিতে হয়, বল দেখি কত বার ?

"ডায়েল" বড় হিসাবী লোক নহেন এই জন্য ২৪ ঘণ্টায় পেণ্ডুলম কতবার টিক টিক করে ইহার হিসাব ভাবিতেছেন এমন সময় মিনিট কাটা (বড় হিসাবে পাকা) শীঘ্র বলিয়া উঠিল "ছিয়াশি হাজার চারি শত বার"। পেণ্ডুলম কহিল ঠিক বলিয়াছ একবার তোমরা সকলে মনে কর দেখি, ২৪ ঘণ্টায় এতবার টিক টিক করিতে হইবে ইহা ভাবিতে গেলে মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে কি না ? তার পর যখন ভাবি কত মাস, কত বর্ষ ধরিয়া এ প্রকার টিক টিক করিতে হইবে তখন আমার প্রাণ উড়িয়া যায় আর চলিতে ইচ্ছা করে না, এই কারণে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি চলিতে বিরত হইয়াছি।"

Dial ডায়েল মনে মনে জানেন যে নিজে বড় পরিশ্রমী নহেন, এই জন্য পেণ্ডুলমের বাক্যে বড় একটা গোলমাল না করিয়া ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন—ভাই পেণ্ডুলম, তুমি এত কাল চলিয়া আসিতেছ হঠাৎ এরূপ চিন্তা কেন তোমার মনে উদয় হইল, আমি মানি তুমি বড় পরিশ্রমী এবং তোমার অন্তরে কর্ত্তব্য জ্ঞান বড় প্রবল, আর দেখ আমরা সকলেই পরিশ্রমী ও আপন কর্ত্তব্য কার্য্য এ পর্য্যন্ত করিয়া আসিয়াছি। এখন একটা সামান্য চিন্তা তোমার মনে উদয় হওয়াতে একবারে কার্য্য বন্ধ করা উচিত নহে। নিরন্তর চলিতে হইবে বলিয়া কেন ভয় পাইতেছ, তুমি বার কতক চলিয়া দেখ দেখি তোমার কোন কষ্ট হয় কি না ?" পেণ্ডুলম ডায়েলের খাতিরে ১০।১২ বার টিক টিক করিয়া উঠিল, তখন ডায়েল বলিল "বল দেখি তোমার ইহাতে কোন ক্লেশ হইল কি না ?"

পেণ্ডুলম কহিল "না কোন কষ্ট হয় নাই বটে, কিন্তু ১০।১২ বার চলিবার ত আমার কোন আপত্তি নাই, কোটী কোটী বার আমাকে চলিতে হইবে ইহাই আমার ভাবনা।" ডায়েল কহিল "আচ্ছা বেশ, তুমি কোটী কোটী বার চলিতে হইবে ইহাই ভাব, কিন্তু এক মুহূর্ত্তে এক বারের

অধিক ত তোমায় চলিতে হয় না ? প্রত্যেক বার চলিবার জন্য তোমাকে একটী করিয়া মুহূর্ত্ত দেওয়া হইয়াছে, তবে তোমার ভাবনা কি ?”

পেণ্ডুলম এই কথার সার গ্রহণে সক্ষম হইল এবং এই সময়ে ঘড়ীর অপর অপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল এককালে পেণ্ডুলমকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলাতে কর্ত্তব্যজ্ঞানী পেণ্ডুলম এতক্ষণ স্থির ভাবে নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকা অন্যায় হইয়াছে বোধ করিতে লাগিল এবং বাটীর লোক জনের সময় নিরূপণের বিশেষ অসুবিধা হইবে বিবেচনায় এত শীঘ্র চলিতে লাগিল যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘড়ী অর্দ্ধ ঘণ্টা ফাষ্ট হইয়া উঠিল।

শ্রীরামগোপাল ঘোষ।

হিমাচল।

৪। বন-বিভাগ ও বন-বিদ্যালয়।

কলিকাতার চতুর দোকানদারেরা পাড়াগেঁয়ে লোক চিনিতে পারে—বিস্ময়চকিত চক্ষু দেখিয়া; বন্য ও গৃহ পালিত পশু পরস্পর পরস্পরকে চিনিয়া লয়—গাত্রগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া; কিন্তু জঙ্গলের লোক দেখিবামাত্রই জনসাধারণে কি প্রকারে চিনিয়া লয়, এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। জঙ্গলের পরিচ্ছদের বিলক্ষণ বিশেষত্ব আছে, কারণ সেই গোরচনা রঙ্গের সিপাহী কাটের সাজ অন্য কোনও পদস্থ ভদ্রলোক স্পর্শও করেন না। আমার জনৈক জঙ্গলী বন্ধু পাড়াগাঁয়ের এক রজককে তাঁহার জঙ্গলী পোষাক কাচিতে দিয়াছিলেন। রজকপুঙ্গব ভাঁটি চড়াইয়াও সেই গোরোচনার রং উঠাইতে পারিল না, অবশেষে বাবুর কাছে আসিয়া করযোড়ে নিবেদন করিল—“কর্ত্তা, ময়লা উঠাইতে চেষ্টার কসুর করি নাই, কাপড় প্রায় ছিড়িয়া গিয়াছে, তবু যে ভাব সেই ভাবই আছে, এখন আপনার যেরূপ বিচার হয়।” বাবু দেখিলেন পোষাকের তন্তু সমূহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে পুনরায় ব্যবহারের অযোগ্য। এহেন পরিচ্ছদ দেখিয়া জঙ্গলী লোক চেনা অবশ্য খুবই সহজ। কিন্তু দেখিয়াছি পোষাক পরা না থাকিলেও লোকে ধরিয়া ফেলে। যাই ধরা—অমনি অজস্র প্রশ্ন

গাছপালা ত কাঠুরেরা কাটিয়া আনে, তজ্জন্য আবার মোটা বেতনের কর্ম্মচারী কেন? গাছের উপরে টোং বান্ধিয়া থাকিতে হয় কি না,—জঙ্গলের জন্য আবার একটা স্কুল কেন—জঙ্গলে আবার লেখা পড়ার দরকার কি—ইত্যাকারের বহু প্রশ্নে পরিচয় জিজ্ঞাসু পাণ্ডাউপদ্রুত ভাল মানুষ তীর্থ যাত্রীর ন্যায় জঙ্গলী ভায়া সবিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন। তাঁহার এই কষ্টের লঘূকরণ উদ্দেশে তাঁহার হইয়া ঐরূপ কতকগুলা প্রশ্নের উত্তর দিতে এই প্রবন্ধ লিখিলাম। আর বনেও যে একটা জীবিকার উপায় আছে চাকরীগতপ্রাণ স্বদেশীদিগকে তাহা দেখাইয়া দেওয়া অন্যতর উদ্দেশ্য।

একটা কথা। বনজঙ্গলের সহিত বঙ্গভাষার অহিনকুল সম্ভাব, কারণ বঙ্গের যে যে অংশে বঙ্গভাষা কথিত হয়, তথায় বনপদবাচ্য কোনও পদার্থ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই জন্য বন শব্দের প্রায়ই অপ-ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটী জেলায় বন বলিলে দুর্ব্বাঘাস বুঝায়, অপর কয়েকটী জেলায় বনের অর্থ শষ্যঘাস। বলা বাহুল্য, এ সকল বনের বিষয়ে কোন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। অল্পাধিক মাত্রায় তরুলতাদিসমাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ ভূভাগ বুঝাইবার নিমিত্তই এই প্রবন্ধে বন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

অতি পূর্ব্বকালে ভারতের সর্ব্বত্রই নিবিড় বন ছিল। আদিম অধি-বাসীরা জঙ্গল কাটিয়া বা পুড়াইয়া জমি প্রস্তুত করিয়া লইত। এক জমাতে কয়েক বৎসর শস্যোৎপাদন করার পর, যখন উহার উর্ব্বরতা হ্রাস হইয়াছে বুঝা যাইত, তখন ঐরূপে অন্য স্থানে নূতন জমি প্রস্তুত করিয়া লইত। সেকালে লোক ছিল অল্প, আর জঙ্গল ছিল অসীম, কাজেই ঐরূপ কার্য্যে যে কাহারও অনিষ্ট হইতে পারে সে ধারণা লোকের মনে কদাপি স্থান পাইত না। পার্ব্বত্য প্রদেশের অসভ্য আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে অদ্যাপি উক্তরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। আর্য্যদিগের ভারতাগমনের পর উর্ব্বর সমতল ভূখণ্ড সমূহে লোক সংখ্যা শনৈঃ শনৈঃ বাড়িতে লাগিল—জঙ্গলও ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। রাক্ষস ও জঙ্গলের সঙ্গে আর্য্যদিগের যুগপৎ সমর চলিতে লাগিল—অবশেষে উভয়ই কষ্টগম্য পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইল। আমাদের কবিকঙ্কণের কালুবীর বন কাটিয়া রাজ্য স্থাপন

করিয়াছিলেন—এই ঔপন্যাসিক কথা ইতিহাস মূলক। কাল্পনীব কেন ?— [illegible] ঐরূপ কাল্পনিক হইয়াছিল। একা লোকবৃদ্ধিই যে দায়ী তাহাও নয়। [illegible] সমাজে বিলাসিতা প্রবেশ করিতে লাগিল, ভূমিশয্যার স্থানে পালঙ্ক, গিরিগুহার স্থানে অট্টালিকা, পদব্রজের স্থানে শকটযান স্কন্ধাগ্র [illegible]র স্থানে [illegible] প্রভৃতি দারুনির্ম্মিত বহু পদার্থের আবিষ্কার ও প্রচলন আরম্ভ হইল। ইহাতেও বৃক্ষকুলের বিলক্ষণ বিনাশ হইতে লাগিল। কৃষিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিসহায় গবাদি গৃহপালিত পশুর ও সংখ্যাবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, ইহারাও যত পারিল গাছপালা উদরসাৎ করিল। ইহাতে কিন্তু ক্ষতিবোধ কাহারও হইত না—কারণ তখন ও পৃথিবী, বনবহুলা ছিলেন। ক্রমে নৃপতিদিগের চটক ভাঙ্গিল। একেবারে বন না থাকিলে শিকারের উপায় কি হইবে ? তখন হইতে স্থলবিশেষের জঙ্গল সাফ করা বন্ধ হইল। তথাপি সম্পূর্ণ রক্ষা সম্ভব ছিল না, কারণ ভগবান্ সর্ব্বভুকের কৃপা প্রতি বৎসর এক এক বার না হইত এমন জঙ্গল তখন প্রায় ছিল না।

বহুকাল এই ভাবেই চলিল। আর্য্যরাজগণের পর মুসলমানের আবির্ভাব হইল, তথাপি কিন্তু জঙ্গলের ভাগ্য ফিরিল না, রাজপ্রাসাদ সন্নিহিত মৃগয়োপযোগী স্বল্পমাত্র বন ব্যতীত সকলই একই ভাবে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। মুসলমানের পর ইংরাজের অভ্যুদয় হইল তথাপি বহুকাল পর্য্যন্ত বনের প্রতি কাহারও সুনজর পড়িল না, বরং বন কাটিবার পক্ষে প্ররোচনার অভাব ছিল না। ১৮৩৮ সালে পতিত জমি বিলিকরণ সম্বন্ধে যে রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল তাহাতে এইরূপ নিয়ম ছিল যে জমিতে ছোট ঘাস থাকিলে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত, বড় ঘাস থাকিলে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত আর বন (অর্থাৎ গাছ পালা) থাকিলে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত, ইজারদার রাজস্বে রেহাই পাইবে। অর্থাৎ বনটা ছিল উৎকট উপসর্গ বিশেষ।

উহার মধ্যে যেগুলা ভাল জঙ্গল ছিল, প্রতি বৎসর ইজারা দেওয়া হইত। লোকে যাহা ইচ্ছা কাটিয়া লইয়া যাইত, কতক লইয়া যাইত, কতক বা জঙ্গলে পড়িয়া পচিয়া যাইত; ক্ষেতের বেড়া দিতে শাল সেগুণের চারা কাটিয়া লইত যতটুকু লম্বার প্রয়োজন তদতিরিক্ত কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া যাইত, মনোমত একখানি তক্তার জন্য প্রকাণ্ড

একটি গাছ কাটিয়া পছন্দ না হইলে ফেলিয়া রাখিয়া যাইত। অপ-চয়ের একশেষ। এমন সময়ে আবার নূতন নূতন রেলের রাস্তা প্রস্তুত হইতে লাগিল—অসংখ্য স্লীপারের প্রয়োজন। বুভুক্ষু ঠিকাদারগণের অগণিত কুঠার ধারী সেনা নিঃসহায় বনস্পতিবর্গ বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অনতিবিলম্বেই নিকটবর্ত্তী সমস্ত বন বিভাগই প্রায় তরুশূন্য হইয়া পড়িল, ক্রমে স্লীপার মেলা দুষ্কর হইয়া উঠিল। এমন যে হইতে পারে সে ধারণা ইতিপূর্ব্বে কাহারও ছিল না, সুতরাং রাজপুরুষেরা কথঞ্চিৎ অপ্রতিভ ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত দারোগা জমাদার প্রভৃতি পদবীধারী নিম্নকর্ম্মচারীও দুই একজন করিয়া নিযুক্ত হইতে লাগিল। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ আশানুরূপ হইল না, কারণ তদর্থে যে পরিমাণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তাহার নিতান্ত অসদ্ভাব ছিল। এই কারণে সাধারণ রাজস্ব বিভাগের বন সম্বন্ধীয় কার্য্যাবলী স্বতন্ত্র কর্ম্মচারিবর্গের হস্তে ন্যস্ত করিবার প্রস্তাবনা চলিতে লাগিল। অচিরে Forest Department অর্থাৎ বনবিভাগের সৃষ্টি হইল। তৎকালে সাহেবদের মধ্যেও বন জঙ্গলের বিদ্যায় পারদর্শী লোক পাওয়া যাইত না। উচ্চ কর্ম্মচারিরূপে কাহাকে নিযুক্ত করা যায় এই সমস্যা উপস্থিত হইলে, পুলিশ পল্টন জরীপ প্রভৃতি নানা বিভাগ হইতে কদাচিৎ উদ্ভিদ বিদ্যাভিজ্ঞ কিন্তু প্রায়শঃ শিকারপ্রিয় দেখিয়া লোক বাছিয়া লওয়া হইল, আর সকলের উপরে বন বিদ্যায় পারদর্শী Dietrich Brandis নামক একজন জর্ম্মানকে Inspector General of Forests রূপে নিযুক্ত করা হইল।

এত দেশ থাকিতে জর্ম্মাণী হইতে কেন লোক আনা হইল প্রশ্ন হইতে পারে। ইউরোপের মধ্যে জ্ঞান গরিমায় জর্ম্মণী সকলের শীর্ষ স্থানীয়, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। তা ছাড়া গত তিন শত বৎসর হইতে জর্ম্মণীতে বন সম্পত্তি বিজ্ঞান সম্মতভাবে সুপরিচালিত হইয়া আসিতেছে। বনবিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তথায় অনেকানেক কলেজ আছে, বনবিদ্যা তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বিভাগরূপে সমাদৃত। বনের সকল কাজ এমনই সুচারুরূপে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত যে জুলুম জবরদস্তীর নাম মাত্র নাই, বনকর্ম্মচারীরা সকলেরই প্রীতিভাজন। শতবর্ষ পূর্ব্ব হইতে

জর্ম্মাণীর পদানুসরণ করিয়া ফ্রান্স তত্রত্য পার্ব্বত্য প্রদেশের বন সমূহকে বৈজ্ঞানিক পরিচালনাধীন করিয়াছেন এবং নান্সি নামক নগরে একটী বনবিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া স্বদেশীয়দিগকে তথায় শিক্ষা দিতেছেন। ইউরোপে আর কুত্রাপি বনবিদ্যার আদর হয় নাই। সুসভ্য আমেরিকা এই সবে মাত্র দাঁত হারাইয়া দাঁতের মর্ম্ম বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে, সহস্র বৎসরের সুসঞ্চিত প্রকৃতির রত্ন ভাণ্ডার হুতাসনে আহুতি দিয়া এই সবে মাত্র আঙ্গুল কামড়াইতেছে। এখনও যাহা আছে, তাহা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভবনীয় হইয়াছে। ইংলণ্ডে এ বিদ্যার চর্চ্চা কিছু মাত্র ছিল না, তথায় বনপদবাচ্য এক মাত্র উইণ্ডসর ফরেষ্ট আছে, তাহাকে মৃগয়ার প্রমোদবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

স্বদেশে উপযুক্ত লোক নাই, ফরাসীর সহিত সৌহার্দ্দ্য চির প্রসিদ্ধ, কাজেই অগত্যা, এক জন জর্ম্মাণকে বনবিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে বরণ করিতে হইল। তীক্ষ্ণধী ব্রাণ্ডিস্ সাহেবের সুবন্দোবস্ত গুণে সর্ব্বত্র আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শনৈঃ শনৈঃ নূতন নূতন জঙ্গল সুরক্ষণাধীন হইতে লাগিল, কার্য্য সৌকার্য্যার্থে একটি নূতন আইন (Forest Act) বিধিবদ্ধ হইল। ক্রমে শিকারপ্রিয়তা ও "নির্জ্জলা" উদ্ভিদবিদ্যার অপর্য্যাপ্ততা অনুভূত হইতে লাগিল এবং ভারতের ব্যয়ে ইউরোপে বনবিদ্যা শিখাইয়া সাহেব সন্তানদিগকে এখানে এক বিভাগীয় উচ্চ কর্ম্মে নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা হইল। এবার কিন্তু ফরাসীকে কোলে টানিতে হইল। ছাত্র দিগকে জর্ম্মাণীতে পাঠাইলে চলিতে পারিত—কিন্তু ঠিক সেই সময়ে জর্ম্মাণীর সহিত ইংলণ্ডের একটু মন কষাকষি ছিল, অধিকন্তু জর্ম্মাণ ভাষা বড়ই কটমট, তদপেক্ষা ফরাসী ভাষা অনেক সহজ। ইংলণ্ডের সাধারণ বিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যেমন হিন্দুস্থানী ভাষা সকলেই সর্ব্বত্র অল্পাধিক পরিমাণে বুঝিতে পারে, ইউরোপে ফরাসী ভাষাও তদ্রূপ। আর ভদ্রসমাজে মধ্যে মধ্যে Continentএ যাওয়াটা একটা প্রথা পড়িয়া গিয়াছে; কাজেই ফরাসী ভাষা শিক্ষার খুবই প্রয়োজনীয়তা ও আদর। যাহা হউক স্থির হইয়া গেল নান্সির কলেজে ইংরাজ ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ভারতে চাকরী করিতে আসিবেন ১৫।১৬ বৎসর যাবৎ এই রূপ চলিল; পরে তদানীন্তন ভারত সচীব লর্ড

আবর্গাইলের পরামর্শে, ভারতার্থপোষিত কুপার্সহিল কলেজে বনবিদ্যা অধ্যাপনার নিমিত্ত স্বতন্ত্র শ্রেণী খোলা হইল, তদবধি কুপার্স হিল ফোয়ারা হইতে দুইটী স্বতন্ত্র ধারা প্রবাহিত হইয়া পূর্ত্ত ও বন দুইটী বিভাগকে যুগপৎ প্লাবিত করিতেছে। ভারতের গাছ গাছড়া ইউরোপে নাই, ইউরোপে শিক্ষা না দিয়া ভারতে দিলে ভাল হয় ইত্যাদি অনেক বাজে কথা সে সময় উঠিয়াছিল, কিন্তু বলা বাহুল্য ভারতে সিবিল সার্ব্বিসের পরীক্ষা গৃহীত হওয়ায় যে ঘোরতম আপত্তি ঐ সকল কথারও কতকটা সেইরূপ আপত্তি হওয়ায় কার্য্যকালে টিকিল না।

উপরিতন কর্ম্মচারীদের পক্ষেই উক্তরূপ ব্যবস্থা হইল। কিন্তু শুদ্ধ উপরের কর্ম্মচারী দ্বারা কাজ চলে না। বিচার, পুলিস, পূর্ত্ত প্রভৃতি প্রায় সকল বিভাগের বেশীর ভাগ কাজ অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়, ইহারাই শাসনযন্ত্রের মেরুদণ্ড সদৃশ সুতরাং ইহাদিগকেও শিক্ষা দেওয়া সমীচিন বিবেচিত হইতে লাগিল। কিন্তু কি উপায়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে সহজে সুস্থির হইল না। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত রুড়কী কলেজে বনবিভাগের বৃত্তিধারী ছাত্র প্রেরিত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ সুফল পাওয়া গেল না, বৃত্তিভোগী হইলেও তাদৃশ ছাত্র স্বভাবতঃ সহাধ্যায়ীদিগের ন্যায় পূর্ত্তবিভাগের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালনে বিরত থাকিতে পারিল না, আর যাহারা জন্মে কখনও জঙ্গল দেখে নাই তাহাদের পক্ষে বনবাস সহজেই নিতান্ত কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। এই সকল নানা কারণে ভারতে একটী স্বতন্ত্র বনবিদ্যালয় স্থাপনের কল্পনা চলিতে লাগিল, এবং কুপার্সহিলের কুক্ষি-পূরণারম্ভের পূর্ব্বেই ১৮৭৮ সালে হিমালয়ের পাদমূলে ডেরাডুন সহরে বনবিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

সমগ্র ভারতের মধ্যে ডেরাডুন কেন মনোনীত হইল প্রশ্ন হইতে পারে। বলা বাহুল্য বন না দেখাইলে বনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যায় না, আর পূর্ব্বে বলিয়াছি যা কিছু বন আছে অধিকাংশই পার্ব্বত্য প্রদেশে, ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, কোন না কোন পার্ব্বত্য প্রদেশে স্কুল স্থাপিত হওয়া উচিত। ভারতবর্ষে প্রধানতঃ পাঁচটী পর্ব্বতশ্রেণী আছে,—হিমাচল, বিন্ধ্যগিরি, আরাবলী শ্রেণী, ঘাট পর্ব্বতদ্বয়। প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম এই যে পর্ব্বতের উচ্চতানুসারে উদ্ভিজ্জের তারতম্য হয়, সুতরাং যে পর্ব্বত যত উচ্চ

তাহার উদ্ভিজ্জ ভাণ্ডার ততই সমৃদ্ধিশালী ও বৈচিত্র্যময়। এ পক্ষে গিরিরাজের সহিত আর কাহারও তুলনা হইতে পারে না। সুতরাং হিমালয় সান্নিধ্যেই স্কুল স্থাপিত হওয়া উচিত।

কিন্তু দার্জ্জিলিং নাইনিতাল প্রভৃতি আরও অনেক ভাল ভাল স্থান ছিল না কি? থাকিলে কি হয়, তৎস্থানের বন হইতে তৎকালে তেমন আয় হইত না, সুতরাং কাজ কর্ম্মও অনেক কম ছিল, এ সকল স্থানের নিম্ন প্রদেশ অতি অস্বাস্থ্যকর আর ডেরাডুন জেলার বামে ও দক্ষিণে নদীকুলললাম গঙ্গা ও যমুনা থাকায় কাষ্ঠাদি সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে আর্য্যাবর্ত্তের প্রসিদ্ধ জনপদ সমূহে উপনীত করিবার যেরূপ সুবিধা আছে, হিমালয়স্থ অন্য কোন স্থানে সেরূপ নাই। অত্যুচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে সমতল প্রদেশ পর্য্যন্ত নদী সাহায্যে কি প্রণালীতে বনজ পণ্য আনীত হইতে পারে, তদ্বিষয়িণী অভিজ্ঞতা বনবিদ্যার অন্তর্ভূত, এই অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুষ্ঠু উপায় ডেরাডুন জেলায় ভূয়িষ্টরূপে বিদ্যমান। আরও অনেকানেক হেতু দর্শান যাইতে পারে, কিন্তু সংক্ষেপতঃ ইহাই যথেষ্ট।

বিদ্যালয় হইল বটে, কিন্তু ছাত্র মেলা তখন দুর্ঘট ছিল। এজন্য তদানীন্তন অধ্যক্ষ মধ্যে মধ্যে নিকটবর্ত্তী জেলা স্কুলে "রিক্রুট" করিতে স্বয়ং যাইতেন বা আড়কাটী পাঠাইতেন। কয়েক বৎসর এই ভাবে চলিল। ক্রমে লোক বুঝিতে পারিল স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে মোটা বেতনের চাকরী জুটিতে পারে, সুতরাং ক্রমে ছাত্র সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। এখন হইতে কিঞ্চিৎ কষণের প্রয়োজন হইল। পূর্ব্ব হইতে একটু ভাল রকম লেখা পড়া জানা না থাকিলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয় পক্ষে বিশেষ অসুবিধা, এজন্য ১৮৮৮ সাল হইতে প্রবেশার্থীর নিমিত্ত একটী প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যবস্থা হইল। তদবধি প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী হইতে মে পর্য্যন্ত যে কোনও সময়ে ভারতের নানাস্থানে প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হয়, বিষয় ইংরাজি সাহিত্য ও গণিত। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটী পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। সর্ব্ব প্রথমে প্রত্যেক ছাত্রই বৃত্তিধারী ছিল। ক্রমে নিয়ম হইল কেহ ইচ্ছা করিলে নিজের ব্যয়েও লেখাপড়া শিখিতে পারিবে। এই সময় হইতে ফিরিঙ্গী ছাত্রের সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া আসিতেছে ইহার প্রধান হেতু সম্ভবতঃ এই যে ব্যবসায়বুদ্ধি অর্থাৎ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের

আশায় ঘরের টাকা বাহির করিবার সাহস—ভারতবাসীর নাই বলিলেই হয়। যে কারণেই হউক স্বতঃপ্রবৃত্ত দেশীয় ছাত্র কদাচিৎ দুই একটী দৃষ্ট হয়, কিন্তু ফিরিঙ্গী ছাত্রেরা অধিকাংশই স্বতঃপ্রবৃত্ত।

ক্রমে আরও একটা কষণ চড়িয়াছে। বৃত্তিধারী হইলেও কোন কোনও ছাত্র বিদ্যালয় পরিত্যাগান্তে জঙ্গলে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই বেগতিক বুঝিলে পলায়নপর হইত। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি বাঙ্গালী ছাত্রেরাই এ দোষে অধিক দোষী। সুচতুর গবর্ণমেণ্ট চিরকালই এইরূপ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিতে থাকিবেন, তাহা কখনই সম্ভবপর নয়। কাজেই নিয়ম হইল, যাহারা বৃত্তি লইয়া অধ্যয়ন করিবে, অন্ততঃ ৫ বৎসর পর্য্যন্ত জঙ্গলে চাকরী করিবে তাহাদিগকে এই মর্ম্মে জামিন সহ একটা এগ্রিমেণ্ট দিতে হইবে। ও দিকে চাকরীর বাজার এখন শুধু গরম নয়—অগ্নিমূর্ত্তি, সুতরাঃ চা-বাগানের কুলিদিগের ন্যায় 'গিরিমণ্টে' সহি করিয়াও প্রতি বৎসর দলে দলে ছাত্র আসিতেছে।

এক্ষণে অধ্যাপন প্রণালী সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। নূতন ছাত্রেরা জুলাই মাসের প্রথম তারিখে ভর্ত্তি হয়। তদবধি অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত চারিমাস ডেহরাতে অবস্থান করিতে হয়। এই সময়ে সপ্তাহে পাঁচদিন করিয়া প্রত্যহ ৬ ঘণ্টা অধ্যাপকগণ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে 'লেকচার' দেন কিন্তু এ 'লেকচার' শুধু শুনিলে চলে না, সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া যাইতে হয়, ৬ ঘণ্টা কাল ব্যাপী বিরাট শ্রুতলিখন। ছাপার পাঠ্য পুস্তক না থাকাই এই কষ্টের প্রধান কারণ। নবেম্বরের প্রথম হইতে পর বৎসরের মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত সাত মাস ডেরাডুনের সন্নিকটস্থ শিবালয়িক ও হিমালয় পর্ব্বতের নানাবিধ জঙ্গলে অবস্থান করিয়া নানাবিষয়িণী ব্যবহারিকী শিক্ষালাভ করিতে হয়। করাত কুঠার কোদালী প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার 'হাতে কলমে' শিখিতে হয়, অর্থাৎ রাস্তা খোঁড়া, নালী কাটা, চারালাগান, গাছ কাটা, কাট ফাঁড়া, বাঁশ টানা প্রভৃতি জঙ্গলের সকল রকম কাজই নিজে করিয়া শিখিতে হয় সঙ্গে সঙ্গে জরীপ, পূর্ত্ত, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ভূবিদ্যা প্রভৃতিরও যথাসম্ভব ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ হয়। তৎপরেই জুন মাসে গ্রীষ্মের ছুটী; প্রথম বৎসর সমাপ্ত। দ্বিতীয় বৎসরেও সেইরূপ চাতুর্ম্মাস্য শ্রুতলিখন সত্তেজে

চলিয়া থাকে। পরবর্ত্তী দুই মাস জঙ্গলের কোনও একস্থানে অবস্থান করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ অঙ্গের কাজ কর্ম্ম করিতে হয়, অর্থাৎ জঙ্গলের বিশ্লেষণ, বৃদ্ধি নির্ণয়, আয় ব্যয় স্থিতির সামঞ্জস্য নির্ণয় প্রভৃতি কতকটা মুন্সীয়ানা ধরণের কাজ হাতে কলমে করিয়া শিখিতে হয়। পরে বড়দিন ও ইংরাজী নববর্ষ পর্ব্বের পর মাস থানেক ধরিয়া দেশ ভ্রমণ। এই সময়ে পঞ্জাব, আজমীর ও কোন কোন বৎসর জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি রাজ্যের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বন সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করা হয়। তৎপরে ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ দুই মাস পরীক্ষা।

দুই মাস পরীক্ষা? হাঁ পরীক্ষাটা কিছু বিচিত্র বটে। প্রথম এক মাস জরীবের পরীক্ষা হয়। প্রত্যেক ছাত্র স্বতন্ত্রভাবে একবর্গ মাইল স্থানের জরীব ও নক্‌সা প্রস্তুত করে, খানিকটা লেবেলও * করিতে হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম ১৫ দিন লিখিত পরীক্ষা গৃহীত হয়। অবশিষ্ট ১৫ দিন মৌখিক পরীক্ষা। শুধু ইহাই যথেষ্ট নয়। এ ছাড়া প্রতি মাসেই অধীত বিষয়ের পরীক্ষা হইয়া থাকে। এই সকল পরীক্ষার নম্বর শেষ পরীক্ষার চতুর্থাংশরূপে পরিগণিত হয়। সুতরাং একটি দিনও আলস্য করিবার যো নাই।

নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ অধ্যাপিত হয়—

১। Forestry বা বনবিদ্যা—এটা একটা মিশ্র শাস্ত্র;—যেমন এঞ্জিনিয়ারের পক্ষে এঞ্জিনীয়ারীং, ডাক্তারের পক্ষে Practice of medicine, এখানকার বিদ্যার মধ্যে ফরেষ্ট্রী সেইরূপ;

২। Botany বা উদ্ভিদ বিদ্যা।

৩। এঞ্জিনিয়ারিং প্রায়শঃ বনসম্বন্ধীয়।

৪। জরীবের ও নক্সার কার্য্য।

৫। প্রাকৃত বিজ্ঞান।

৬। রসায়ন।

৭। ভূবিদ্যা।

৮। খনিজবিদ্যা।

* ভূপৃষ্ঠের আপেক্ষিক উচ্চ নীচতা নির্ণায়ক প্রক্রিয়া

৯। প্রাকৃতিক ভূগোল।

১০। প্রাণীতত্ত্ব (বিশেষতঃ কীটতত্ত্ব।)

১১। গণিত (কতকটা এল, এ, পরীক্ষার মত।)

১২। আইন—বনবিষয়ক, দেওয়ানি ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি এবং পিনালকোডের আভাস।

১৩। হিসাব ও আফিসের কার্য্যপ্রণালী।

স্কুলের দুইটী বিভাগ আছে, ইংরাজি ও হিন্দুস্থানী। শেষোক্ত বিভাগের ছাত্রেরা হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু ভাষায় শিক্ষালাভ করে, এই বিভাগের ছাত্রদিগকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয় না। এলাহাবাদ বা লাহোর কেন্দ্রের ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর পাশ করিলেই প্রবেশাধিকারী হওয়া যায়।

যে এক বৎসর ৯ মাস কাল স্কুলে থাকিতে হয় তাহাতে প্রত্যেক ছাত্রের প্রায় ৬০০৲ টাকা খরচ হইয়া থাকে। একটু হাতটান করিয়া চলিতে পারিলে ৫০০৲ টাকায়ও কুলাইতে পারে। সরকারী বৃত্তিধারী ছাত্রেরা খরচ সঙ্কুলানের উপযোগী বৃত্তি পাইয়া থাকে—স্বতঃ-প্রবৃত্ত ছাত্রেরা কিছুই পায় না। বলা আবশ্যক পড়িবার জন্য স্কুলের বেতন দিতে হয় না, এখানকার বিদ্যাটা সরকার বাহাদুর বিনামূল্যে বিতরণ করেন।

চাকরীবাকরীর আশা ভরসারও আভাস দিয়াছি। যাঁহারা বিলাতে পাশ করিয়া আসেন তাঁহাদের পদ ও বেতনাদির কথা সবিস্তারে বলা নিষ্প্রয়োজন। মোটামুটি বলিতে পারা যায় ৩৫০৲ টাকা হইতে ২৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত তাঁহাদের দৌড়। ডেরাডুনের ছাত্রদের জন্য নিম্নলিখিত পদগুলির সৃষ্টি হইয়াছেঃ—

ফরেষ্টর বেতন	১৫৲ হইতে ৪০৲ টাকা।
ফরেষ্ট রেঞ্জার	৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা।
এক্সট্রা এসিষ্টাণ্ট কনসারবেটার	২০০৲ হইতে ৩৫০৲ টাকা।
এক্সট্রা ডেপুটী কনসারবেটার	৪৫০৲ হইতে ৬০০৲ টাকা।

হিন্দুস্থানী বিভাগের ছাত্রেরা ফরেষ্টার ভাবে কার্য্যারম্ভ করিয়া রেঞ্জার পর্য্যন্ত হইতে পারে। আর ইংরাজি বিভাগের ছাত্রেরা রেঞ্জার হইতে

ক্রমশঃ একষ্ট্রা ডেপুটী কনসারবেটার হইতে পারে। উহাদের মধ্যে যাহাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন—অদৃষ্টই বলিলাম—তাহারা একেবারে ২০০ দুই শত টাকা পদেও নিযুক্ত হইতে পারে। পক্ষান্তরে যাহারা নিতান্ত অভাগা তাহাদিগকে কিছুকাল পর্য্যন্ত ফরেষ্টারের পদেও থাকি হয়। কিন্তু সাধারণতঃ পঞ্চাশ টাকার বেঞ্জার রূপেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই নিয়ম। বারবরদারি বাবদে প্রায় সকলেই একটা ভাতা পাইয়া থাকেন, সেটা মোটামুটি হিসাবে প্রায় বেতনের এক তৃতীয়াংশ।

কিরূপ স্থানে কি ভাবে থাকিতে হয় তাহাও বলা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে সাধারণ রীতি এই যে যাঁহার যত অধিক বেতন, তিনি প্রায়ই তত ভাল স্থানে থাকিতে পান। ইহারা প্রায়ই এক একটা জেলা বা উপ-বিভাগের ভার পান, সুতরাং সহরে থাকিতে হয়। তথাপি বার মাস সহরে বসিয়া থাকিলে কাজ চলে না, আফিস ও বাসা সহরে থাকে মাত্র, মাসের মধ্যে অন্ততঃ ২০ দিন মফঃস্বলে জঙ্গল পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে হয়। এ গেল ভাগ্যবানের কথা। পক্ষান্তরে যাহারা নিতান্ত ভাগ্য হীন, তাহাদিগকে ১২ মাস ৩০ দিন জঙ্গলেই থাকিতে হয়, এবং কুলি মজুর লইয়া জঙ্গলের কাজ করাইতে হয়। জঙ্গল হইলেও সকলেরই থাকিবার জন্য চলন সই গোছের বাড়ী ঘর স্থানে স্থানে প্রস্তুত আছে। উহার মধ্যে একটু ভাল জায়গা দেখিয়া আড্ডা গাড়া হইয়া থাকে। কোন কোনও স্থানে বাজার ঘাট ডাক ঘর প্রভৃতি সকলই থাকে, আবার কোথাও বা ৪০।৫০ মাইল হইতে ডাকের পত্রাদি ও খাদ্য সামগ্রী আনাইতে হয়। আনাইবার খরচ প্রায়ই সরকার হইতে দিবার রীতি আছে।

যাহারা আটপীঠে লোক, তাহারা উহারই মধ্যে বেশ সুবিধা করিয়া লইতে পারে। জাল রাখিয়া নদী হইতে মাছ ধরিয়া আনে, বাগিচা করিয়া তরকারীপাতি উৎপন্ন করে, বন্দুক রাখিয়া বনের হরিণ বধ করে; আর দুধ ঘীর অভাব জঙ্গলে প্রায়ই হয় না, কারণ মহিষের বাথান প্রায় সর্ব্বত্রই থাকে। এইরূপ প্রাকৃতিক জীবনে এক অতি মধুর কবিত্ব ভাব নিহিত আছে। যাঁহারা সেটুকু অনুভব করিতে পারেন, প্রকৃতির অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য দর্শনে যাঁহাদের মনঃপ্রাণ এক দিনের তরেও বিমুগ্ধ হয়, তাঁহারা

আবার জঙ্গল ছাড়িয়া লোকালয়ে আসিয়া তিষ্ঠিতে পারেন না, লোক কোলাহলে প্রাণ কেমন হাঁপাইয়া উঠে, সহরের পূতিগন্ধময় ঘন বায়ু তাঁহাদের পক্ষে অতি কষ্টকর প্রতীয়মান হয়।*

শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল।

পঞ্চানন্দ পাকড়াসির গাঁজার পুটুলি।

(১)

হেডক্লার্ক বাবু! আপনাদের নূতন হাকিমটি কি প্রকারের লোক? উত্তর "কৃষ্ট"। কথাটা জিজ্ঞাসকের বোধগম্য না হওয়ায়, বাবু বলিলেনঃ—"আমি কৃষ্ণ (কাল বাঙ্গালী) বলি নাই, কৃষ্ট বলিয়াছি। হাকিম তিন প্রকার। যাঁহারা খুব ভাল তাঁহারা উৎকৃষ্ট এবং যাঁহারা খুব খারাপ তাঁহারা অপকৃষ্ট। যাঁহারা উত্তমও নন অধমও নন অর্থাৎ মাঝারি, তাঁহারা কৃষ্ট।

(২)

নাৎজামাই স্বীয় দাদাশ্বশুরকে স্বীয় পত্রে লিখিলেন "My sweet-half (আপনার নাৎনী) ভাল আছে।" বৃদ্ধ দাদাশ্বশুর প্রত্যুত্তরে লিখিলেনঃ—My sour-half (তোমার দিদীশাশুড়ী) ভাল আছে।

(৩)

নকর্ত্তা কয়েক বার বাজার থেকে আম কিনে দিলেন। সব আমই টক্। নগিন্নী নকর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, তিনি আম চেকে নেন নাই। নগিন্নী বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আমি না খেয়ে কোন জিনিস্ কিনি না।" কয়েক দিন পরে একটি বৃদ্ধা বাড়ীতে ঝাঁটা বেচিতে আসিলে, নগিন্নীকে মিষ্ট সম্বোধন পূর্ব্বক নকর্ত্তা বলিলেন "খেয়ে নিও, যেন আমার মত ঠকো না।"

*"বনবিদ্যালয় সম্বন্ধে এতদধিক কথা জানিতে হইলে Director, Imperial Forest School, Dehra Dun এই ঠিকানায় পত্র লিখিয়া ছাপান নিয়মাবলী প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

(৪)

Honorable Pherozeshah Mehta সম্বন্ধে দেশীরা বলিতেছেন, Mehta ভারতের পরম মিতা। বিদেশী ওরফে বদ্বেষীরা বলিতেছেন, কৌনসলে Mehta যাহা বলিয়াছেন তা গুষ্টির মাথা। নব মোক্ষমূলার কিন্তু বলিতেছেনঃ—Mehta Parsee। Mehta আর মহাত্মা একই। আর Parsee হইতেছে Latin *perse* অর্থাৎ বাস্তবিক মহৎ কি না মহান্ ব্যক্তি।

(৫)

কোন একটি উৎসবের ব্যয় জন্য উকিল ঈশান বাবু বিংশতি মুদ্রা চাঁদা দেন। অনেক উকিল কিছু দেন নাই। "আপনারা অনেকেই কিছু দিলেন না, ঈশান বাবু কিন্তু বিশ টাকা দিয়াছেন।" এই কথার উত্তরে জনৈক ওষ্ঠ কর্ত্তিত (ঠোঁট কাটা) উকিল বলিলেন "ঈশান বাবু হলাহলধারী শিব। সাপে বেড়া। তিনি বিষ দিবেন কোন্ আশ্চর্য্য।"

(৬)

স্বামী নির্ঘাত ইংরাজী নবিস, স্ত্রী বেজায় বাঙ্গালাজ্ঞ। দু জনেরই বিষম গোঁ। স্ত্রী পিত্রালয়ে আছেন, স্বামী পত্র সমাপ্ত করিয়া শিরোনামা লিখিলেনঃ—

শ্রীমতী অধরমণি মল্লিকা
শ্রীচরণেষু

মন্তব্য। মল্লিকা, মল্লিকের স্ত্রীলিঙ্গ আর মল্লিকা ফুল।

স্বামীর দুই জন বন্ধু স্বামীর বৈঠকখানায় উপস্থিত ছিলেন। একজন বলিলেন "স্ত্রীকে শ্রীচরণেষু ?" দ্বিতীয় বন্ধু বলিলেন "ভায়ার তিনির অষ্ট প্রহর শ্রীচরণে shoe। ঠিক্ লেখা হইয়াছে।"

(৭)

শ্রীনিবাস ঘোষ ভারী heridity মত প্রিয়। কাদম্বিনী দাসীর সধবা মেয়ের ৩৫শ বৎসরেও সন্তানাদি হইল না। তাহার বাঁঝা হইবার কারণ কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনিবাস না বুঝে সুজে হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন "বোধ হয় ওর মাও বন্ধ্যা।"

(৮)

পঞ্চানন্দ পাকড়াসী ট্রাম গাড়ীতে চড়া, হরকরা হাঁক্‌ছে "ব্যঙ্গভাষী ব্যঙ্গভাষী !" আর একজন আরোহী জিজ্ঞাসা করিল "পাকড়াসী মহাশয়" ও কি ?" পাকড়াসী কহিলেন কেন ? "বঙ্গবাসী, কাগজ। জিজ্ঞাসক বলিলেন "ও বলিতেছে ব্যঙ্গভাষী। "পাকড়াসী বলিলেন "বঙ্গবাসীই ব্যঙ্গভাষী।"

(৯)

জগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র বিলাত ফেরতা। বিলাত হইতে বাড়ী আসিয়া দেখিলেন বাড়ীর বাগানের কোনে একটা বুড়ো শজনা গাছ। কাটারি হস্তে শজনা গাছ কাটিতে আসিলে তৎসন্নিহিত দেবাংশ দেবদারু তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেনঃ—

বাপু ! শ্রীবিষ্ণু ! সাহেব এগাছটি কেটো না। আপনকার বুড় মা বাপের মত গাছটি বাড়ীর এক কোণে পড়ে আছে। তাদের মত গাছটার কেউ খোঁজ খবর নেয় না। আপনার বুড়ো মা বাপকে কেউ নাওয়ায় না ও খাওয়ায় না। তাহারা আপনারা বেঁচে থাকে। সেইরূপ এই শজনা গাছে সার জল দিতে হয় না। আপনি গজায়। মা যেমন মাই দিয়ে আপনার পোষণ করিয়াছেন এই বুড় গাছেরও কাজ তদ্রূপ। মাঘ ফাল্গুন চৈত্র তিন মাস ইনি আপনার বাড়ীর তরকারীর জোগাড় করিয়া দেন। আর সজনা শাক ছিল বলিয়া আপনার পিতা মাতা ইনকম্ ট্যাক্স পর্য্যন্ত দিয়া আপনাকে বিলাত (লাথ্ বিবর্জ্জিত) অর্থাৎ দীনতার লাথি ভক্ষণ বর্জ্জিত করিবার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইতে সক্ষম হন। গরীব বাঙ্গালী শজনা তেঁতুলের কৃপায় অদ্যাবধি সর্ব্ব প্রকার ট্যাক্স আদায় করিতে পারিতেছে। শজনার কচি কচি পাতা মোচার সঙ্গে মিলিত হলে আপনার চাচার বিকল্পে বাবুর্চ্চির স্যাণ্ডেডকে হারাতে পারে। শজনার বীচ জরঘ্ন। মাড়োরি Malarious জরে বাঙ্গালা জীর্ণ। বাপু ! (বেয়াদবি মাপ করিবে) সাহেব ! আপনি এ শজনা গাছ কাটিবেন না। আপনার পৈতা আছে কি না জানি না। না থাকাই ভাল। কেন না গলায় দড়ি বলে কেহ আপনাকে গালি দিতে পারিবে না। কিন্তু শজনা আটায় আপনার পিতার পৈতা দিব্য সাফ্ হয়। সাবান দরকার

করে না। সজনার ছালে একরূপ কবিরাজী তেল প্রস্তুত হয়। ইহার ফুল শুকাইয়া রাখিলে উচ্ছে বড়ি দিয়ে সুন্দর তরকারী হয়। হয় ত আপনি বলিবেন খাড়া বড়ি লোককে খাড়া খাড়া যমের বাড়ী পাঠায়। আপনার মতে তা হতে পারে। কিন্তু ইহা সুন্দর লাগে। আর গাছ কত বড় দেখুন। ইহার পাতায় কত গরীব না পোষ যায়। সাহেব এ গাছটি কাটবেন না।

আমি দেবতা, আমার ভাষা দেববাণী সংস্কৃত। সংস্কৃত কিন্তু আপনার পক্ষে মাতৃবৎ পরদারেষু। সাধু ভাষাও আপনার পক্ষে তদ্রূপ। আপনি তৈজস পত্র অর্থে তেজপাতা, মনসিজ অর্থে মনসা পূজা এবং মরাল অর্থে বিড়াল বুঝিয়া থাকেন। এই কারণে আমি বাধ্য হইয়া উক্তরূপ ভাষায় আপনাকে উপদেশ দিয়াছি।”

বিলাত ফেরতা সাহেব দেবদারুর কথা শুনিয়া ছিলেন কি না, আমরা অবগত নহি। তবে শুনিয়াছি ডাম্ ডোম্ করায় হঠাৎ একটা মোটা ডাল পড়ে সাহেবের হাত ভেঙ্গে যায়।

শ্রীদীননাথ ধর।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আরতি।

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়াছে—রজনীর ছায়া জগতে সমাকীর্ণ। বিশ্বপতি আজ কাশীর পবিত্র মন্দিরে অধিষ্ঠিত। ভক্তমণ্ডলী সমন্তাৎ সমবেত। মন্দিরের অভ্যন্তরে স্তাবকগণ সমুপবিষ্ট। স্তাবক হস্তে পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া মন্দির সমালোকিত করিল।

এ কি? পবিত্র শান্তিকুণ্ড হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া—ও কে আবির্ভূত হইলেন? স্তাবকগণ উল্লাসভরে গাহিলেন—

শম্ভু শম্ভু শম্ভু
শিব শিব শম্ভু

তন্মুহূর্ত্তে স্তোত্রধ্বনিতে মন্দির পরিপূর্ণ হইল। তালে তালে ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। চন্দনলিপ্ত হইয়া শম্ভু কি অনুপম শোভা ধারণ করিলেন। রাশি রাশি কুসুমমালা ও বিল্বপত্রে শোভিত হইয়া বিশ্বেশ্বর স্তাবক সমীপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। এক এক বার চন্দনকুসুম বিল্বদলের অন্তরালে অদৃশ্য

হইলেন আবার ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া নয়নের আনন্দ বিধান করিতে লাগিলেন।

সহসা দর্শকমণ্ডলী ভেদ করিয়া এক জটাজূটধারী সৌম্যমূর্ত্তি তপস্বী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় বিশ্বেশ্বরের দিকে তাকাইয়া আনন্দোল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মুখমণ্ডলে চন্দ্রের প্রফুল্লতা, নয়ন-যুগলে অমৃতনদী বহিয়া যাইতেছে। মন্দিরের তিন পার্শ্ব হইতে ভক্তের নৃত্য আরম্ভ হইতে লাগিল।

কৈলাস শিখরে তাণ্ডব নৃত্যের বর্ণনা শুনিয়াছি। সন্ধ্যারাগ প্রদীপ্ত পর্ব্বতশিখরে ঐ প্রত্যুঙ্গ তরুবরের প্রকামচ্ছায়াতলে কি অনুপম অভিনয়ের আয়োজন হইতেছে। সন্নিহিত প্রদেশে প্রবাহিনীর মৃদুগম্ভীর প্রপাতের শব্দ শ্রুত হইতেছে। তৎসহ সম্মিলিত হইয়া অদূরে কিন্নরকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত সুধাবর্ষণ করিতেছে। সেই সঙ্গীতের সহিত বিহগনিচয়ের মধুর কাকলীরব মিশ্রিত হইয়া ধরাতলে অমৃতস্রোত বহিয়া যাইতেছে। সহসা পর্ব্বতে ওষধি জ্বলিয়া উঠিল—সহসা গজচর্ম্মপরিহিত বিভূতিপরিলিপ্ত শুভ্রকান্তি জটাধারী চারুচন্দ্রাবতংস দেবাদিদেব অবতীর্ণ হইয়া তাণ্ডব নৃত্যে প্রবৃত্ত হইলেন। শিরোদেশে কৌমুদী হাসিতেছে, স্কন্ধভাগে অহি ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ত্রিনয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। গজচর্ম্ম হইতে শোণিতবিন্দু নিঃসৃত হইয়া ভূতলে পড়িতেছে। ক্ষণে ক্ষণে সেই অম্বর স্খলিত হইতেছে। অবিরাম নৃত্য।

ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিছে
তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে।
রুণু রুণু রুণু রুণু নূপুর বাজিছে
তালে তালে মত্ত হয়ে প্রমথ নাচিছে।
শন্ শন্ শন্ শন্ সমীর বহিছে
লতা পাতা হেলে দুলে কৌতুক করিছে
হেসে হেসে সুখে ভেসে তারাদল যত
শশাঙ্কশিখর শোভা দেখে অবিরত
কুরঙ্গ কুরঙ্গী সনে মিলিয়া উল্লাসে
ময়ূর ময়ূরী লয়ে নাচিছে বিলাসে।

তাণ্ডব উল্লাসে মত্ত জগৎ সংসার
স্নুখের হিল্লোলে ভাসে বিশ্ব চরাচর।

কাশীধামে আজ সেই তাণ্ডব নৃত্যের অপূর্ব্ব বিকাশ। শম্ভু শম্ভু রবে মন্দির পরিপূর্ণ হইল। পঞ্চপ্রদীপের আরতির সহিত গম্ভীর স্তোত্রধ্বনির সমাবেশে অপূর্ব্ব শোভা বিকশিত হইল। চামর হস্তে দুই জন স্তাবক নৃত্য করিতেছেন। সেই নৃত্যকে শাসিত করিয়া ঘণ্টা মৃদুমধুররবে বাজিতেছে। ঘণ্টারব ও স্তোত্রধ্বনিকে পরাস্ত করিয়া কোথা হইতে অতি মধুর সুকোমল কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছে। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! মন্দিরের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া এক যোগিনী অশ্রুপরিপ্লুতনয়নে ভক্তিস্রোতে ভাসমানা হইয়া শম্ভু শম্ভু রবে অমৃত বর্ষণ করিতেছেন। দর্শকমণ্ডলী সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতের কি মধুর উচ্ছ্বাস। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া হৃদয়তটে ঘাত প্রতিঘাত হইতেছে। পাষাণ দ্রবীভূত হইল। মরুভূমি ফলফুলে সুশোভিত হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে হিংসা দ্বেষ পাপপ্রলোভন কোথায় ভাসিয়া গেল। হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ছিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে সপ্তস্বরের মাধুর্য্য বিকাশ করিয়া বাজিয়া উঠিল। চরাচর বিশ্বে থাকিল শুদ্ধ সঙ্গীত। অপর সমুদয় বিলুপ্ত হইয়া গেল। বিশ্বেশ্বরের মন্দির নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হইল। কোথায় স্তাবকগণ কোথায় বা দর্শকমণ্ডলী। অনন্ত শূন্যপথে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নালোকে সঙ্গীতের মোহন মূর্চ্ছনা বিশ্বেশ্বরের নামামৃত বর্ষণ করিতেছে। সেই সুধাসঙ্গীত ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই।

সমালোচক বিশ্বেশ্বরের আরতির সমালোচনা করিতে আসিয়াছিলেন, ঐ মন্দিরের একপার্শ্বে আত্মহারা ও বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় সঙ্গীতের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। নাস্তিক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিদ্রূপভাবে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান ছিলেন হঠাৎ তাঁহার শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল, হঠাৎ তিনি বসিয়া পড়িলেন—অকস্মাৎ তাহার মুখ হইতে শম্ভু শম্ভু শব্দ উদ্গত হইল—তিনিও সেই সঙ্গীতস্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেলেন।

ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপপুরুষ রিপুর প্রবল উত্তেজনায় ও সৌন্দর্য্যের লালসায় প্রমত্ত হইয়া পবিত্র মন্দিরে আসিয়াও উদ্ভ্রান্ত চিত্তে প্রলোভনের পথে

বিচরণ করিতেছিল, অকস্মাৎ শুভ মুহূর্ত্তে বিশ্বেশ্বরের পবিত্র নাম তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল আর অমনি ভাবান্তর উপস্থিত হইল। বিলাসের শরীর মন্দিরে লুণ্ঠিত। নয়নযুগলে প্রেমাশ্রু বহিয়া যাইতেছে। চিত্ত সে দেহপিঞ্জর ভেদ করিয়া অনন্ত শূন্যপথে উল্লাসভাবে সেই সঙ্গীতসুধা পান করিতেছে।

এ বিশ্ব সংসার আজ দেহমুক্ত আত্মার আবাসভূমি। পরমাত্মাকে পরিবৃত করিয়া জীবাত্মা আজ আনন্দে নৃত্য করিতেছে। বিশ্বেশ্বরের আরতি—জীবাত্মা ভিন্ন সে আরতি আর কে করিবে? নয়নের সাধ্য নাই সে মাধুর্য্য অনুধাবন করে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা নাই যে তাহার অন্তর্নিবিষ্ট হয়। অন্তরাত্মা ভিন্ন সে মাধুর্য্যবোধ সম্ভবপর নহে। ভক্তি-মন্দাকিনীর পবিত্র সলিলে সুস্নাত হইয়া যখন আত্মা পবিশুদ্ধ হয়, তখন এই বিশ্ব প্রপঞ্চের অন্তরালে বিশ্বেশ্বরের মোহনমূর্ত্তি অবলোকনে মুগ্ধ হইয়া যায়। চরাচর বিশ্বে তদীয় আরতির সুমহান আয়োজন দেখিয়া চিত্ত ভাবরসে নিমগ্ন হয়। দিবা রজনী অবিরাম সেই আরতি চলিতেছে। ঐ যে বিকসিত কুসুম সমীরসংযোগে সঞ্চালিত হইতেছে, ঐ যে বসন্তের কোকিল জগতে অমৃত বর্ষণ করিতেছে, তরুরাজি শাখাসঞ্চালনে আনন্দ-বিকাশ করিতেছে, স্রোতস্বিনী মৃদু মধুর কলনাদে বহিয়া যাইতেছে—আর এই রজনীর সমাগমে—ঠিক্ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে এই আরতির সময়ে—ঐ যে অগণিত দীপপুঞ্জ আকাশতলে প্রকাশমান হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিতেছে, ইহা বিশ্বেশ্বরের আরতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অনন্ত-সৃষ্ট-রাজ্য অবিরত মহেশের স্তব করিতেছে। তাহারই প্রতিবিম্ব কাশীর পবিত্র মন্দিরে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই আরতিতত্ত্ব যিনি বুঝিয়াছেন তিনি ভক্তিতত্ত্বের মর্ম্মানুধাবন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। সখা ও সাথী। ১ম ভাগ। ফাল্গুন ১৩০১। ১১শ সংখ্যা। বঙ্গদেশে সখা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সখার সহিত সাথীর মিলনে সেই খ্যাতি বাড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আমরা ফাল্গুন মাসের সংখ্যা পড়িয়া পরিতুষ্ট হইলাম। বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী এরূপ পত্রিকা আর নাই। ইহাতে যে সকল চিত্র প্রকাশিত হয়, তাহা অতি মনোরম। আমরা এ পত্রিকার বহুল প্রচার প্রত্যাশা করি।

২। জ্যোৎস্নাহার। এই মাসিক পত্রখানি বর্ত্তমান সনের মাঘ মাস হইতে চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য স্থানীয় ১৲ টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০। সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে দেশে মাসিক পত্র যতই প্রচারিত হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। ইহাতে সম্পাদকের কিম্বা লেখকগণের নাম প্রকাশিত নাই। আমাদের মতে অন্ততঃ লেখকগণের নাম প্রকাশিত হওয়া উচিত। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতির প্রত্যাশা করি।

৩। ধরণী। মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। সাঁওতাল পরগণা মলুটী রাজবাটী হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ টাকা।

এই পত্রিকাখানি পড়িয়া আমরা প্রীতিলাভ করিলাম। ধনীর আশ্রয়ে বিদ্যার গৌরব বড়ই মধুর। আমাদের দেশে অর্থাভাব বশতঃ অনেক পত্রিকা অকালে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই পত্রিকাখানির সে ভাবনা নাই। তথাপি সাধারণের নিকট উৎসাহ না পাইলে কোন পত্রিকাই স্থায়ী হইতে পারে না। আশা করি ধরণীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক।